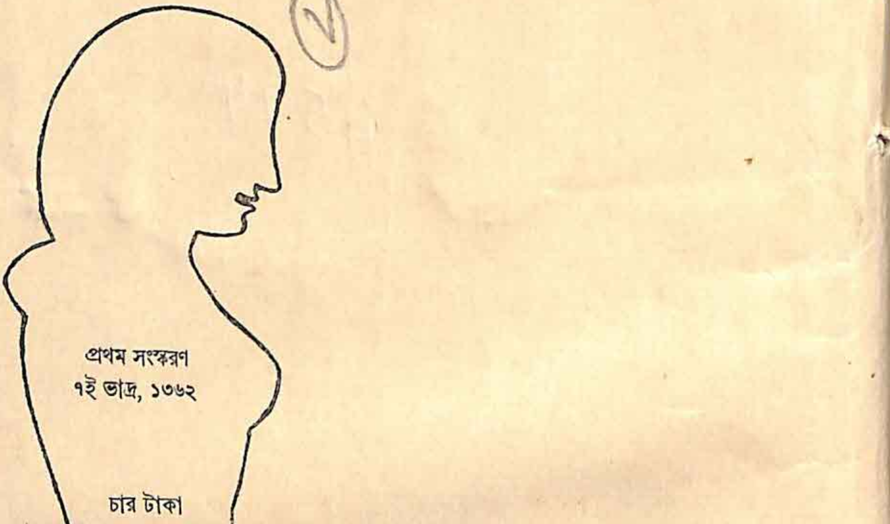
স্ব-নির্বাচিত গল্প

আশাপূর্ণা দেবীর

স্ব-নির্বাচিত গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম সংস্করণ
৭ই ভাদ্র, ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

কৈফিয়ৎ

'শ্রেষ্ঠ গল্পের' গল্প নির্বাচন বরং সহজ, ওটা নির্ভর করে পাঠকের স্বীকৃতির উপর। 'স্ব-নির্বাচিত'র নির্বাচন ব্যাপারটা সহজ নয়। এখানে পাঠকের স্বীকৃতি দিয়ে কাজ মেটে না; দায়িত্ব থাকে লেখকের নিজের।

আবার একটা ভয়ও আছে, ভয়টা হচ্ছে: সেই নির্বাচিত গল্পগুলির প্রকৃতি থেকেই না কি লেখকের মনের গতি প্রকৃতি ধরা পড়ে!

ভয়টা তুচ্ছ নয়। কারণ মনের গতি-গতিক যে সব সময় একই থাকে তাও তো নয়? লেখক মাত্রেই কখনো মমতাশীল, কখনো নির্মম, কখনো আশাবাদী, কখনো নৈরাশ্যবাদী।

মানুষের মধ্যে কত দুর্বলতা, কত অনাচার! সে দুর্বলতা দেখে কখনো বা মমতা জাগে, কখনো আসে বিতৃষ্ণা। সে অনাচার কখনো বেদনার সৃষ্টি করে, কখনো সৃষ্টি করে বিরক্তি। কখনো বা এমনও মনে হয়— মানুষের কাছে আশা করবার নেই, বিশ্বাস করবার নেই! পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে!

আবার এরই মাঝখানে দৈবাতের ঘটনায় মনে, যদি এর ব্যতিক্রমটা চোখে পড়ে, ফিরে আসে আশা, ফিরে আসে বিশ্বাস।

অনেক সময় এমনি ক্ষণকালীন অনুভূতি থেকেই তো ছোটগল্পের সৃষ্টি। কাজেই একই গল্পকারের বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন সুর থাকা অসম্ভব ও নয়, অন্যায় ও নয়। অথচ যে গল্পটি রচনা হিসাবে লেখকের কাছে সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে, তার সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা লেখকের থাকবেই। সে গল্পের প্রকৃতি যাই হোক।

হয়তো সেই ভিত্তিতেই বর্তমান গ্রন্থের নির্বাচন। তবু নিজের কাছেও প্রশ্ন রয়ে গেছে — অনেক গল্পের মধ্যে এই গুলিই বা নির্বাচন করলাম কেন? এর উত্তর আবার যদি পাঠকের কাছে সেই 'কেন'র কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তা হলে তো বিপদ।

কৈফিয়তের মধ্যে এই — বোধহয়, এতে এমন গল্প গুলিই রাখা হয়েছে, যার মধ্যে বোঝাবার চেষ্টা আছে — মানুষের যতটুকু আমরা দেখি, হয়তো সেইটাই তার সব নয়। যা দেখিনা সেটাও অনেকখানি।

হয়তো সে নিজেও জানেনা সেই অলক্ষিত অনেকখানিটা হচ্ছে — জীবন তার জীবন-জিজ্ঞাসায় নিরুত্তর এক দ্বন্দ্ব।

কোথায় যেন রয়েছে বিরাট একটা ফাঁকি, সহজে ধরা পড়েনা, অথচ — ফাঁকির

গ্লানিটা টের পাওয়া যায়। সে গ্লানি জীবনে আনে তিক্তস্বাদ।

তাই — যে অসহিষ্ণুতা, যে বিদ্রোহ, যে বৈরাগ্যকে 'সহসা' বলে মনে হয়, সেটা সহসা নয়। আবার — সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধন, তার অনেকটাই হয়তো অভ্যাসের অনুশাসন মাত্র।

যাকে 'স্নেহ' বলি, 'প্রেম' বলি, 'ভালবাসা' বলি, যাকে জীবনের বনেদ বলে মনে করি, সে বস্তু হয়তো মুহূর্তেই শূন্যের অঙ্কে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

এটা শুনতে হয়তো নৈরাশ্যবাদের মত, তবু আমার দিক থেকে বলতে পারি নৈরাশ্যবাদ নয়, বরং প্রতিবাদ। মানুষের কাছে আশা ফুরোয়না বলেই, সেই বিরাট ফাঁকির বিরুদ্ধে ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ।

এই সংকলনে আমার পূর্বে প্রকাশিত কোনো গল্পগ্রন্থের গল্প রাখিনি। কারণ — এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা গল্প থেকেই যখন নাম-অর্থ বজায় রেখে সংকলন সম্ভব হলো, তখন গ্রন্থিত গুলি থেকে নেওয়ার আর প্রয়োজন বিবেচনা করলাম না।

— আশাপূর্ণা দেবী

গুণবতী

পেয়ারার জেলিটা এনামেলের গামলা থেকে কাঠের চামচ দিয়ে তুলে তুলে কাচের জারের মধ্যে ভরবার সময়, নিবেদিতার মুখে যে প্রসন্ন পরিতৃপ্তির আভা ফুটে ওঠে, সেটুকু দেখবার মতো।

অবশ্য এ থেকে একথা মনে করবার হেতু নেই, নিবেদিতা পেয়ারার জেলির ভীষণ ভক্ত! নিবেদিতার দিকে তেমন করে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, থালাভর্তি বড়ি রোদে দেবার সময়, ভাঁড়ারের শিশিবোতলগুলি ঝেড়ে মুছে চকচকে করবার সময়, কি ধবধবে ওয়াড়গুলি বালিশে পরাবার সময়, নিবেদিতার মুখে লেগে থাকে এমনি পরিতৃপ্ত প্রসন্নতা।

আবার সেই মুখই বিরক্তিকুঞ্চিত হয়ে উঠতে মুহূর্ত দেরী লাগে না, যদি চোখে পড়ে যায়, স্বামী অথবা পুত্তুর কেউ, জুতো জোড়াটা খুলে যেখানে রাখবার সেখানে না রেখে ইঞ্চি কয়েক তফাতে রেখেছেন, অথবা চাকর ছোঁড়াটা কুটনোর খোসাগুলো বাড়ীর বাইরে ফেলে না এসে উঠোনেই ফেলেছে।

পরিপাটি আর পরিচ্ছন্নতা, নিবেদিতার জীবনের একমাত্র সাধনা।

ছোট্ট সংসার। আর এই সংসারটি গড়ে তোলবার সমস্ত কৃতিত্বই নিবেদিতার।

এর প্রত্যেকটি তুচ্ছতম জিনিসেও নিবেদিতার হাতের স্পর্শ।

বছর পনেরো বয়সে নিবেদিতার যখন বিয়ে হয়েছিলো, স্বামী সত্যশরণ তখন নাবালক বললেই চলে। বিধবা মায়ের অঞ্চলনিধি, মামার বাড়ীতে মানুষ।

'মায়ের কষ্ট কমাবো' এই সাধু সংকল্পটুকু ছাড়া তখন আর বেশী কিছু বস্তুর সঞ্চার হয়নি তাঁর মনে। কুড়ি বছর বয়সে বি-এ পাশ করেই ঢুকে পড়েছিলেন এক সওদাগরী অফিসে এবং সেই সামান্য উপার্জনের ভরসাতেই বিয়ে করতে দ্বিধা করেননি, মায়ের সাধ মেটাতে।

অবিশ্যি নিবেদিতাই বা এমন কি 'অসামান্য' ঘরের মেয়ে? কেরানী বাপের ঘরে নেহাত হেলাফেলায় জীবন কেটেছে ছেলেবেলায়। বছর আষ্টেক বয়েস থেকে ছোট ছোট দু'তিনটি ভাই বোনের প্রায় সবটুকু দায়িত্বই তার ঘাড়ে চাপানো হয়েছিলো, মায়ের সময় অভাবের অজুহাতে।

'অজুহাত' বলাটা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়, কিন্তু মূল-অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্য মন্তব্য করবে। যাক সে কথা, সে জীবন নিবেদিতা ভুলে গিয়েছেন।

মামাশ্বশুর বাড়ীতে বছর তিনচার ধরে যে পরগাছা জীবন যাপন করতে হয়েছে, সে জীবনও ভুলেছেন। এখন নিবেদিতার নিজের সংসার! নিজের রচনা!

শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর থেকে সত্যশরণকে অবিরত একরকম উত্যক্ত করে করেই বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি সেই বহুপরিবারের বেড়াজাল থেকে।

ভীরু সত্যশরণ প্রথমে দিশেহারা হয়েছিলেন, নিবেদিতার এই দুঃসাহসে। নিশ্চিত ভেবে রেখেছিলেন, আবার লজ্জার মাথা খেয়ে ফিরে আসতে হবে মামার বাড়ীর জটিল সংসার চক্রের মধ্যে।

কারণ নিজে আলাদা একটা সংসার করা সম্ভব, এ ধারণাই তাঁর ছিলো না। ভেবেছিলেন, "আচ্ছা বেশ! জব্দ হোক কিছু।"

কিন্তু তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। যেমন তেমন করে শুধু 'সংসারই' করেন নি, সে সংসারকে ছবির মতো করে সাজিয়েছেন। ফিটফাট ছিমছাম পরিপাটি সুন্দর।

অথচ, নিজের জেদে আলাদা হয়ে এসেছেন, এই অপরাধবোধের দায়িত্বে স্বামীকে কখনো এতোটুকু ঝক্কির ভার দেননি। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে সত্যশরণ টেরও পাননি কখনো, খোঁজও নেননি। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন নিবেদিতার হাতে।

অবিশ্যি জীবনকে বেশী জটিল করেও তোলেননি তাঁরা।

ছোট্ট সংসার, চাহিদা পরিমিত।

একটি মেয়ে, তাকে বিয়ে দিয়েছেন বছর চারপাঁচ আগে। কৃতী জামাই, দূরে থাকে, কদাচিৎ আসে। তাতে দুঃখ নেই নিবেদিতার, মেয়ে সুখে আছে এই ভালো।

এই বিয়েটাও তো নিবেদিতারই অশেষ চেষ্টার পুরস্কার!

সত্যশরণের সাধ্য ছিলো এমন একটি জামাই যোগাড় করবার?

আর একটি সন্তান, ছেলে গৌতম।

তার জন্যে যথাসময়ে যথোপযুক্ত খাওয়া-পরার যোগান দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। নিজের ধারে কেটে যাচ্ছে সে। টকাটক করে এগিয়ে এগিয়ে সাধারণ ছেলেদের চাইতে বেশ কিছু কম বয়সেই এম-এ পড়ছে এখন। তাকে গড়বার জন্যে নিবেদিতাকে আর কিছু করতে হবে না।

এতোদিনে যেন যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়েছে নিবেদিতার।

জীবনে এসেছে একটা স্তিমিত শান্তি।

এখন শুধু মসৃণ পথটায় চাকাটাকে গড়িয়ে দেওয়া। অথচ নিবেদিতা আজও যেন ফুরিয়ে যাননি। তাই অটুট স্বাস্থ্য আর অক্লান্ত মন নিয়ে তিনি দৈনন্দিন কাজগুলোই করে তুলছেন অফুরন্ত।

ফর্সা বিছানা আরো ফর্সা করছেন, ঝাড়া ঘর আবার ঝাড়ছেন। স্বামী, পুত্র আর ভৃত্য এই তিনটি প্রাণীকে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে অহরহ টিকটিক করছেন।

বড়ি দিচ্ছেন, আচার করছেন, নতুন নতুন খাবার শিখছেন বই কাগজ রেডিও থেকে!

সত্যশরণ যার নাম দিয়েছেন 'বাতিক'।

কি একটা কাজে বাড়ীর ভিতরে এসে সত্যশরণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেসে বললেন—আবার কি হচ্ছে আজ? নতুন কি বাতিক?

—নতুন নয় পুরনো—নিবেদিতা হাসলেন—কি চমৎকার সোনার মতো রঙ্টা হয়েছে দেখো?...পেয়ারাগুলো ভালো ছিলো।

বরাবরই এইরকম 'স্বর্ণবর্ণের' জেলি বানিয়ে থাকেন নিবেদিতা, তবু প্রত্যেকবারই যেন নিজের কৃতিত্বে মুগ্ধ হন, পুলকিত হন। সববিষয়েই এই রকম। প্রায় প্রত্যেক হপ্তাতেই সত্যশরণকে শুনতে হয়, বিছানাটা কী ফর্সা হয়েছে দেখেছো? তোমার ধোপার চেয়ে ভালো।

সত্যশরণ যদি অজ্ঞতাবশতঃ ছোকরা চাকরটার প্রশংসা করে বসেন

এরজন্যে, হেসে গড়িয়ে পড়েন নিবেদিতা। বলেন—ওই আনন্দেই থাকো। ফট্‌কের বাবার সাধ্যি আছে, একটাও ওয়াড় এরকম ফর্সা করবার। শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী, বুঝলে ?

সত্যশরণ বলেন—বামনী-ধোপানী একটু উঁচু দরের হবে বৈকি।

প্রায় এই এক ধরনেরই কথা। একই ধরনের হাস্য পরিহাস।

আলাপে আলোচনায় বৈচিত্র্যের স্বাদ আনবার যোগ্যতা, সাধাসিধে মানুষ সত্যশরণের নেই।

নিবেদিতার ছিলো কি না, সে সন্ধান করছে কে? আত্মীয়-স্বজন যারা আছে, সবই ওই 'এক গোয়ালের'।

গৌতমের স্কুল-কলেজ নিয়ে একটু কথাবার্তা কইতে ইচ্ছে করে নিবেদিতার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, সারাদিন সে কি করলো, কার সঙ্গে মিশলো এই সব।

বিচারকের ভঙ্গীতে নয়, সুহৃদের ভঙ্গীতে।

কিন্তু বড়ো গম্ভীর ছেলে গৌতম। ওর সঙ্গে গল্প বেশী এগোয় না।

তাই মনের কাজ যতো ফুরোচ্ছে নিবেদিতার, হাতের কাজ ততো বাড়ছে।…কে জানে, মনটা ফুরিয়ে যায়নি বলেই হয়তো, এই তার প্রকাশ।

সত্যশরণ নিবেদিতার কথায় আর এক দফা হাসলেন। বললেন—নিজের সোনার বর্ণ কালি করে এতো সোনালি-সোনালি জেলি করে আর কি হবে? এতো খাবে কে?

—কি যে বলো! এটুকু আর ফুরোতে ক' দিন? বোতলে মনে হয় অনেক বুঝি। গেলোবারে তো আরো বেশী করেছিলাম।

দাম্পত্য আলাপের সীমানা প্রায় এই পর্যন্ত।

হয়তো ঠিক এইভাবেই বাকী জীবনটা কেটে যেতো নিবেদিতার। হয়তো নতুনের মধ্যে, চল্লিশ পার হতেই গুরুমন্ত্র নিয়ে, কিছু কিছু পুজো-আর্চা করে বয়েসের আর আচরণের সমতা রাখতেন! ভারসাম্য ঠিক রাখতেন ইহকাল আর পরকালের।…

…হয়তো আরো কিছুদিন পরে—ছেলের বিয়ে দিয়ে, বৌকে সুশিক্ষা দেবার মহৎ প্রেরণায় আর একটু খিটখিটে হতেন, আর আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যেতেন, যদি না—

হ্যাঁ, যদি না এবারে পূজোর সময় পুরী বেড়াতে আসতেন নিবেদিতা।

বেড়াতে আসাটাও অবশ্য নিবেদিতার চেষ্টার ফল।

সত্যশরণ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র অসুবিধের ফিরিস্তি তুলে তুলে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, হলো না।

নিবেদিতা উত্তর করলেন—আজন্মকাল তো সুবিধে সুব্যবস্থাই করে এলাম, দেখি না অসুবিধে অব্যবস্থার স্বাদটা কি!...একটা প্রধান সুবিধে তো পাচ্ছো, বাড়ীর। সব সময় পাবে?

গৌতম গম্ভীর ছেলে, প্রস্তাবটা যতোক্ষণ না তার কাছ অবধি এলো, কথা কয়নি। এখন বললে—আমার পড়ার ক্ষতি হবে। ভেবে রেখেছি—এই ছুটিটায়—

নিবেদিতা বললেন—ওখানেই বা তোকে পড়তে মানা করছে কে? বইপত্তর নিয়ে চল?

—সে কি করে হবে? আমি, আর—অন্য একটা ছেলে একজন প্রফেসরের বাড়ী গিয়ে তাঁর সাহায্য নেবো ঠিক হয়েছে—

নিবেদিতা ঈষৎ আহত হয়ে বললেন—এতো সব ঠিক করে ফেলেছিস, কই কিছু বলিসনি তো?

গৌতম অল্প হেসে বললে—এতে আর বলবার কি আছে? মাইনে তো লাগবে না!

নিবেদিতা স্বামীর কাছে এসে বললেন—তবে ও থাক। পুরুষ মানুষ, ছেলে মানুষ, জীবনে কতো সুযোগ আসবে। আমি যাবোই।

'আমি' অর্থে 'আমরা'।

সত্যশরণ ছেলের আপত্তি শুনে আশা করেছিলেন, যাওয়া স্থগিত হবার এই একটা মোক্ষম কারণ পাওয়া গেছে।

অবাক্ হয়ে গেলেন নিবেদিতার সংকল্পে।

বললেন—ও থাকবে? খাবে কি?

—ফট্‌কে থাকবে, যা পারবে করবে, দু'জনে খাবে! চারজনেই যাওয়া হবে ভেবে রেখেছিলাম, তা যখন হলো না, করা যাবে কি? ফট্‌কে ছোঁড়ার কপালে নেই।

সত্যশরণ হতাশ হয়ে নিজেকে নিয়তির হাতেই সঁপে দিলেন।

ক'দিন পরে বেশ একটি প্রকাণ্ড লটবহর আর তার সঙ্গে স্বামীটিকে নিয়ে পুরী এলেন নিবেদিতা।

যদিও স্বামীকে আগে ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন, অসুবিধে অব্যবস্থার স্বাদ পরীক্ষা করতেই যাচ্ছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল 'ব্যবস্থা' আর 'সুবিধে'র সামনে 'অ' বসাবার কোনো অবসরই রাখেননি নিবেদিতা। নিজের বাতিকেই রাখেন নি।

অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকবে, এ সহ্যশক্তি নিবেদিতার প্রকৃতিতেই নেই। বিশেষ করে সত্যশরণের ব্যাপারে।

তবু এখানে এসে হঠাৎ যেন বদলে গেলেন নিবেদিতা।

যেন বয়সের একটা মোটা অংশ হারিয়ে ফেললেন।

নিবেদিতা সময়ের জ্ঞান ভুলে ঝিনুক সংগ্রহ করবেন, বালির গাদায় পা ডুবিয়ে চলৎশক্তিহীনের ভূমিকায় হেসে কুটি কুটি হবেন, একটু নির্জনতার সুযোগ পেলেই ছুটোছুটি খেলবেন।

সত্যশরণ বলেন—এখানে এসে খুকি হয়ে গেলে যে!

সত্যিই বটে।

শুধু বয়েস বলেই নয়, গম্ভীর স্বভাব ছেলে গৌতম বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে নিবেদিতার নিজের স্বভারের ওপর যে একটা গাম্ভীর্যের 'কোটিং' পড়ে আসছিলো, সেটা যেন এখানের এই উদ্দাম সাগুরে হাওয়ায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে।

সত্যশরণ ঠিক যেন নাগাল পান না।

একটু যেন বিপর্যস্ত হন।

'ক্ষেত্তরের' কাঁসা ভালো বলে, বাসন কেনবার জন্যে যে বেশ একটি মোটা অঙ্কের টাকা আলাদা করে এনেছিলেন নিবেদিতা, তার সদ্ব্যবহার করবার 'চাড়' কই?···দোকান বাজারের দিকেও তো যেতে চান না। বেড়ানো মানেই এই সমুদ্রতীর। এই 'বালির বৃন্দাবন' কি এতোও ভালো লাগে নিবেদিতার?

সন্ধ্যে হয়ে আসছিলো, তবু নিবেদিতা ঝিনুক কুড়োতেই ব্যস্ত।

সত্যশরণের হাতে একটা থলি, আর নিবেদিতা ছোট-বড়ো মাঝারি নানা আকারের ঝিনুক নির্বিচারে সংগ্রহ করছেন আর থলি বোঝাই করছেন।

সত্যশরণ এক সময় একটু অধৈর্য হয়ে বললেন—আচ্ছা, পাগলের মতো কেবল তো কুড়িয়েই যাচ্ছো, এতো ঝিনুক কি হবে?

—কি হবে?...হেসে উঠলেন নিবেদিতা, বললেন—হবে আবার কি? যাবার দিনে আবার সমুদ্রের জিনিস সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে যাবো।

সত্যশরণ তো দিশেহারা। বললেন—এই এতোদিন ধরে এতো কষ্ট করে কুড়োলে, ফেলে দেবে?

—কুড়োলাম বলে ওই বস্তাভর্তি ঝিনুক বয়ে নিয়ে যাবো নাকি কলকাতায়?

—তাহলে এতো বোঝাই করলে কেন?

—কেন?...নিবেদিতা হাতের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন—কলকাতা ছেড়ে পুরীতেই বা এলাম কেন?

...আর হবে না, অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না! চলো—

হঠাৎ পিছন থেকে একটি গম্ভীর অথচ সকৌতুক কণ্ঠ ব'লে ওঠে—বিনা অনুমতিতে কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না! সমুদ্রতটকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যাবেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন নাকি?

দু'জনেই চমকে তাকান।

সৌম্যকান্তি মাঝারি বয়সের একটি ভদ্রলোক।

মাথায় কিছু পরিমাণ টাক, চোখে কালো সেলের চশমা। গায়ে ঢিলে হাতা সাদা পাতলা পাঞ্জাবি। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে যেন বিশেষ একটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে, সব কিছুর ওপর।

ফিরে দাঁড়িয়ে তিনজনের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হয়। এবং নবাগত ভদ্রলোকই আবার কথা বলেন—দিন চারেক হলো এসেছি, আর দু'বেলাই চোখে পড়ছে আপনার অদম্য অধ্যবসায়। সরকারী দপ্তরে খোঁজ নিয়ে রেখেছেন, ঝিনুকের ওপর ট্যাক্স আছে কি-না?

এবারে সত্যশরণই নিবেদিতার হয়ে উত্তর দেন—তার দরকার নেই। উনি স্থির করে রেখেছেন, যাবার দিনে সমুদ্রের সম্পত্তি সমুদ্রেই ফেরত দিয়ে যাবেন।

শুনে ভদ্রলোক যেন একটু সচকিত হলেন।

কণ্ঠে ফুটলো তার আভাস। বললেন—তাই নাকি? কিন্তু কেন বলুন তো?

এবারে সোজাসুজি নিবেদিতাই উত্তর দিলেন। বললেন—মন্দ কি? খুশিটা রইলো, দায়টা রইলো না।

ভদ্রলোক বললেন—তা বেশ। আপনার পরিকল্পনাটি নতুন, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলে।

সত্যশরণ বললেন—বেশ তো, চলুন না আমাদের বাসায়? দু'দণ্ড বসে বসে ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা যা কিছু সব হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—কোথায় আপনার বাসা?

—এই তো, একটুখানি।

—বালিভাঙা 'একটুখানি'?

সত্যশরণও হাসেন—তা যা বলেছেন! বালির রাস্তা বেজায় জোচ্চোর। আধমাইল দূর থেকে মনে হয়—ওই যে, ওই তো সামনেই।···আপনি কোথায়?

ভদ্রলোক একটা বিখ্যাত হোটেলের নাম উল্লেখ করলেন।

—আরে! ও তো আমাদের বাসার কাছেই! দেখেন নি, 'তীর্থকুটির'? তবে আর কি, চলুন এগোনো যাক।···গরীবের কুঁড়েয় একবার পায়ের ধুলো দিয়ে তারপর স্বস্থানে যাবেন।···আমরা মশাই কলকাতার লোক, যেখানেই যাই দু'দিনে হাঁপিয়ে উঠি।

—সমুদ্রের ধারে এসে আপনি হাঁপিয়ে উঠছেন? বলেন কি? বিজ্ঞানকে যে উড়িয়ে দিতে চান দেখছি।···

চমৎকার হেসে ওঠেন ভদ্রলোক।

হাসিটি সত্যিই ভারী সুন্দর খোলামেলা।

নিবেদিতা স্বামীর এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে মনে মনে অস্বস্তিবোধ না করে পারেন না।···রাস্তায় দেখা হয়েছে, বাঙালী বাঙালীর সঙ্গে দুটো কথা কয়েছো, মিটে গেলো ল্যাঠা!···তাকে আবার ডেকেডুকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া কেন?

স্বামীকে উদ্দেশ করে বলতেন যান—'তুমি তো বেশ লোক? উনি

হয়তো এই মাত্র বেরিয়েছেন, হয়তো বেড়ানো শেষ হয়নি, ধরে নিয়ে যাচ্ছো মানে?'···কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন—কি জানি, তাঁর অনিচ্ছে ভাবটা যদি ধরা পড়ে যায়। বরং উল্টো কথাই বলেন! বলেন—ওঁর কথা বাদ দিন। উনি ফী হাত বিজ্ঞানকে অজ্ঞান করে ছাড়েন। কিন্তু হাঁপিয়ে না উঠলেও 'বন্ধুলাভ' যোগটাকে নষ্ট হতে দেবো কেন?

এই কথাটা বলেই বরং সন্তুষ্ট হন নিবেদিতা। বেশ ঝরঝরে কথাগুলো বলা গেলো।

ভদ্রলোক বলেন—সেটা উভয় পক্ষে।···কিন্তু এটাতো আপনার নীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

নিবেদিতা অবাক্ হন তাঁর আবার কি নীতি।

অন্ধকার হয়ে গেছে মুখের ভাব দেখা যাচ্ছে না আর, তবু ভদ্রলোক বোধকরি ভাবটা অনুমান করে বলেন—খুশির খেসারতে দায় পোহানো তো আপনার নীতি নয়?

—ওঃ তাই। তা দায়টা কিসের? বন্ধুর জন্যে তো ট্যাক্স লাগে না।

—কিন্তু চা লাগে। দেখবেন শেষে খাল কেটে কুমীর আনলেন।

বেশ লাগে সত্যশরণের এই সব সরস কথাবার্তা।

নিজে তিনি মোটেই আলাপপটু নন, কিন্তু হাস্য-পরিহাস আলাপ-সালাপ ভালোবাসেন খুব। আর মুগ্ধ হন নিবেদিতার অকুণ্ঠ পটুতায়।

এটা আজ বলে নয়, বরাবরের ব্যবস্থা।

বাড়ীতে অতিথি-কুটুম্ব, জামাই-বেহাই, মেয়ে-পুরুষ যেই আসুক অভ্যর্থনার দায় নিবেদিতার। নিজের কাজ কামাই করে তাঁদের মান রক্ষা করতে হবে বসে-বসে নিবেদিতাকেই।

সত্যশরণ অপটু। গৌতম অনিচ্ছুক।

সত্যি পারেনও নিবেদিতা, যার সঙ্গে যেমন।

ভদ্রলোক সেদিন এলেন বটে, তবে বসলেন না।

আগামী দিনের জন্যে চায়ের নেমন্তন্ন পাতিয়ে বিদায় নিলেন। বললেন—বাড়ী তো চিনে নিলাম, আর ঠেকায় কে!

বিদ্যুতালোকে স্পষ্ট করে আর একবার দেখা গেলো মানুষটাকে। মাঝারি

বয়েস, হয়তো নিবেদিতার চাইতে দু'এক বছরের বড়ো, হয়তো বা তাও নয়, কান্তিতে সৌম্যভাব আছে, তার জন্যে দেখায় কিছু বেশী।

কিন্তু প্রকৃতি ভারী সরল।

গম্ভীর গলা, কিন্তু ভাষায় সরস কৌতুকের হীরকধার।

পথে আসতে আসতে পরিচয় জানাজানি হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক এক বে-সরকারী কলেজের প্রফেসর, বিয়ে-টিয়ে করেননি, শখের মধ্যে বছরে দুটো বড়ো ছুটিতে কাছে-পিঠে একটু বেড়াতে আসা, নেশার মধ্যে অধ্যয়ন। যে বই ভালো লাগে দশবার পড়েন, যে দেশ ভালো লাগে পাঁচবার যান।

পুরীতেই এসেছেন এই নিয়ে বার চারেক।

শুনে নিবেদিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছেন—কেন বলুন তো? ভারতবর্ষের আর সব দেশরা কি অপরাধ করলো?

প্রফেসর হেসেছিলেন—বছরে দুটো করে দেশ দেখলেই কি ভারতবর্ষের সব দেশ ফুরিয়ে উঠতে পারবো?

—তবু মোটামুটি ভালো ভালো জায়গাগুলো তো দেখা হয়ে যাবে?

—তখন আবার মনে হবে, 'কি আর হলো, পৃথিবীতে কতো কতো ভালো ভালো জায়গা অদেখা রয়ে গেলো!'

সত্যশরণ বোধকরি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবার বাসনায়, প্রফেসরের এ কথার পিঠে বলে উঠেছিলেন—তার চাইতে মশাই ও আশার গোড়ায় ছাই দেওয়াই ভালো কি বলেন?

এঁদের বাসা থেকে নেমে হোটেলের দিকে যাবার পথে আবার কিছুটা এগিয়ে দিতে এলেন এঁরা, পরদিনের জন্যে পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

প্রফেসর বললেন—আপনারা তো মাত্র দু'জনই আছেন দেখছি। আমি আবার 'তৃতীয় ব্যক্তি' হয়ে কারুর অভিশাপ কুড়োবো না তো?

বলে হাসিমুখে তাকালেন নিবেদিতার দিকে।

নিবেদিতা কিছু বলবার আগেই সত্যশরণ বোধ করি 'কর্তার' দায়িত্ববোধে তাড়াতাড়ি বললেন—না না, সে কি? সে আপনি কিছু মনে করবেন না। উনি লোক খুব ভালো!

—তাই নাকি? আপনি তো তাহলে ভাগ্যবান!

প্রফেসরের অবাধ হাস্যে মুখরিত হয়ে উঠলো নির্জন বেলাভূমি।

নিবেদিতা ভাবলেন—রোসো, বাড়ী ফিরে দেখাচ্ছি মজা।

যেখানে সেখানে বোকার মতো এক একটা কথা না বললেই নয়?

'বাসায় ফিরেই' বলবার আর দেরী সইলো না নিবেদিতার, পথেই তর্জন শুরু করলেন—তোমার ও কি একটা কিম্ভুত কথা বলা হলো?

—কেন? কেন? কোন্‌টা গো?

—'"উনি খুব লোক ভালো'—স্বামীর নকল করে বলে ওঠেন নিবেদিতা—কী চমৎকার! ভদ্রলোক কি রকম হাসলেন?

সতাশরণ মাথা চুলকে বললেন—বাঃ! হাসির কি আছে? ভালোকে ভালো বলবো না?

—না বলবে না! কোনো কথার যদি ছিরি-ছাঁদ থাকে তোমার। হুট্‌ করে ওকে ডেকে আনবারই বা কি দরকার ছিলো? বেশ আছি দু'জনে; আবার ও এসে এসে উৎপাত করুক?

সত্যশরণ অসহায়ভাবে বলেন—আহা বুঝছো না, ভদ্দরলোক নিজে যেচে আলাপ করলেন,—আমাদের দিক থেকে একটু আগ্রহ দেখানো উচিত নয় কি?

—সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার উচিত বোধের জ্ঞানটা হঠাৎ খুলে গেলো দেখছি যে? ওসব বালাই তো ছিলো না কখনো।

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা—তা তোমাকে তো তখন বিশেষ অসন্তুষ্ট মনে হলো না বাবু? এখন এতো রেগে যাচ্ছো কেন?

—সাধে বলি, তোমার বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে। তুমি যাকে ভদ্রতা করে 'আসুন মশাই' করছো, আমি যদি তাকে একটু খাতির না দেখাই, ভাববে কি লোকটা?…ওকি হচ্ছে?

গা থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে সেটাকে বারান্দায় টাঙানো দড়িতে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন সত্যশরণ। পুরীর বিশ্রামহীন ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না কিছুতেই। ব্যর্থ হয়ে লণ্ডভণ্ড জামাটা নিবেদিতার হাতে ফেলে দিয়ে বলেন—অসম্ভব! হবে না। পুরীর আর সব ভালো, এই দিনরাত্তির ঝড়টা অসহ্য বাবা!

নিবেদিতা সেই দড়িতেই সুকৌশলে জামাটা ছড়িয়ে দিয়ে গলার হারে আটকানো সেফটিপিনের গোছা থেকে গোটা দুই লাগিয়ে আটকে এসে বলেন—আমার তো এই জন্যেই এত ভালো লাগে। ঝড় ঝড় !...সারাদিন সারারাত ঝড় বইছে, যেমন সমুদ্র তেমনি বাতাস, বিরামহীন বিশ্রামহীন !

—এখানে এসে কবি হয়ে গেলে দেখছি—ব'লে হাত মুখ ধুতে যান সত্যশরণ।...সত্যি বলতে, নিবেদিতার এই নতুন রূপ তেমন যেন ভালো লাগে না সত্যশরণের। একটু যেন অস্বস্তিকর, হয়তো বা একটু ভীতিকরও। ঝড় ভালো লাগে, শুনলেই যেন গা ছমছম করে।...আসল কথা—'জগতে শুধু প্রিয়া আর আমি'—এমন নিঃসঙ্গ অবস্থা জন্মে কখনো আসেনি সত্যশরণের। ঠিক ম্যানেজ করতে পারছেন না।

রাগ হয় গৌতমের ওপর।

এলেই পারতো ছেলেটা। ফটিকটাও আসতে পেতো তাহলে। সংসারটা সংসারের মতো লাগতো!...একেবারে নিছক একলা! একটি যদি বা সদালাপী লোক জুটলো, দুটো কথা কয়ে বাঁচা যাবে, তাও নিবেদিতার পছন্দ নয় আশ্চর্য !

শুধু স্ত্রীর সঙ্গে গল্প !

কতোক্ষণ করা যায় ?

ভদ্রলোকের নাম যতীশ্বর মুখার্জি।

বাড়ীতে মা আছেন, আছেন দুই দাদা-বৌদি। নিজে বিয়ে করেননি। হালকা জীবন, আছেন ভালো। বই-টই নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন বটে, তবু মজলিসীও বলা যায়। এককথায়, যে কোনো ধরনের লোকের সঙ্গেই জমিয়ে নিতে পারেন।

বুদ্ধিমান লোক।

এঁদের সঙ্গে এই সামান্য আলাপেই অবস্থাটা অনুমান করে নেন। মনে মনে ভাবেন গিন্নিটি তো বেশ চৌকস, আহা বেচারা কর্তা! বোকা-সোকা ভালোমানুষ! যেতে হবে কাল।

* * * * *

ঝড় ঝড় !

না ঠিক ঝড় বলা চলে না, ঝোড়ো হাওয়া ! মুঠো মুঠো বালি উড়ছে… ভিজে ভিজে নোনা বালি।…জমা হচ্ছে—চুলে, কাপড়ে, ঘরের কোণে কোণে।…দড়িতে ঝোলানো সত্যশরণের জামাটা তোলা হয়নি। ওটা যেন শূন্যে মাথা কুটে কুটে মরছে।…

বারান্দাটা থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, দেখা যায় ছাতে উঠলে। এখান থেকে শুধু গর্জন ! অন্তহীন শ্রান্তিহীন !

রাতটা বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের, আকাশে শুধু তারা।

সন্ধ্যে থেকে পড়ে থাকা ইজিচেয়ারটাতে এসে বসলেন নিবেদিতা।…কে জানে কতো রাত…ছুটো ? আড়াইটে ?

বেশ লাগছে এভাবে চুপচাপ একা পড়ে থাকতে।

অভ্যস্ত জীবন থেকে আকাশ পাতাল পার্থক্য !

নিজেকে যেন কলকাতার সেই পরিচিত নিবেদিতা বলে মনেই হয় না।…

বসে থাকতে থাকতে গা শিরশির করছে, শীত ধরে গেলো প্রায়, তবু যেন উঠে যাবার তাড়া নেই। শুধু আঁচলটা একটু ভালো করে টেনে গায়ে ঢাকা দিলেন।

কে জানে কেন কিছুতেই ঘুম আসছে না।

নিজেরই আশ্চর্য লাগছে নিবেদিতার।

কলকাতার বাড়ীতে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতেন মাঝরাত্রে উঠে খোলা আকাশের নিচে জেগে জেগে চুপচাপ বসে আছেন নিবেদিতা ?

ওখানে সমুদ্র নেই, বাতাস তো আছে ?

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কা খেতে খেতে যে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রহীন নীরবতার দেশে ! এক একটা বৈশাখী সন্ধ্যায়, কি আশ্বিনের রাতে সেই বাতাস তো সমুদ্রের গর্জনই বয়ে নিয়ে আসে।…সমুদ্রের মতোই উন্মাদ বেদনায় মাথা কুটতে থাকে সারারাত সারাদিন। ঝেড়ো হাওয়ার সেই পাগলামি তো বহুবার দেখেছেন নিবেদিতা।

কই নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি তো।

এমন করে হারিয়ে ফেলেননি তো নিজেকে !

তেমন-তেমন এলোমেলো দিনে তিনি ছেলেমেয়েকে কাসি হবার ভয়

দেখিয়ে শাসিয়েছেন, হাত-গলা-ঢাকা মোটাসোটা জামা পরতে বাধ্য করিয়েছেন।…

দিনে রাত্রে সাধ্যপক্ষে ঘরের জানলা দরজা খুলে রাখতে দেননি, পাছে ধুলো এসে ঘর নোঙরা হয়। ধুলো-ভীতির এই অদ্ভুত বাতিকে কতোদিন ঝগড়াই হয়ে গেছে সত্যশরণের সঙ্গে।

অথচ এখানে সর্বত্র ভিজে ভিজে নোনা বালি।

নিবেদিতার যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু নিবেদিতা কে ?

বহুদিন আগে যে ছোট একটা ফ্রক-পরা মেয়ে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ভাইবোনের কান্না সামলাতে, মাঝে মাঝে নিজেই কেঁদে ফেলতো, সেই কি ?

নাকি বহু পরিবারের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া অবগুণ্ঠনবতী যে বধূটি অবিরত পরের মন জুগিয়ে দিন কাটাতো আর অহরহ ভবিষ্যতের রঙিন ছবি আঁকতো, তারই নাম নিবেদিতা ?

আর এই যে, আপন পরিমণ্ডলে দীপ্ত উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির সচেতন মহিমময়ী নিবেদিতা ? অনেকের ভয় অনেকের সম্ভ্রম আর অনেকের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বিরাজ করছেন !

নিবেদিতা যাকে যথার্থ 'নিবেদিতা' বলে মেনে এসেছেন এতোদিন, তিনি ছাড়াও আর কোথাও আর কেউ আছে নাকি, 'নিবেদিতা' যার নাম ?

সে কি ছিলো ?

সে কি নতুন জন্ম নিলো ?

তার চেহারাটা আবার কি রকম ?

মানুষ নাকি বার বার জন্মায়, বার বার মরে। দেহান্তের নীতি মেনে মেনে তার এই জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল রচিত।

কিন্তু দেহান্ত না হয়েও একই দেহে কি বার বার মৃত্যু ঘটেনা মানুষের ? বার বার নবজন্মলাভ হয় না ?

প্রতি মুহূর্তেই তো মরছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তেই ফের জন্মাচ্ছে নতুন মূর্তি নিয়ে। সেই অনেকগুলো জন্মমৃত্যুর সমষ্টিতে গড়া মানুষকে কি করে তবে 'এক' বলা যায় ?…কি করে সবসময় চিনতে পারা যাবে তাকে ?

* * *

—এ কি তুমি কখন উঠে এসে, এই ঝোড়ো হাওয়ার মুখে বসে আছো?

ডেক্‌চেয়ারটার পাশে সত্যশরণ এসে দাঁড়ালেন।

শিথিল ভঙ্গী ত্যাগ করে নিবেদিতা উঠে বসলেন।

বললেন—এই তো একটু আগে। তুমি অমনি এসে হাজির হয়েছো? কি ভাবলে, তোমাকে ফেলে কোথাও উধাও হয়েছি?

—হ্যাঁ ভাবলাম তাই! সেই ভয়েই তো ছুটে বেরোলাম খুঁজতে। চলো চলো, খুব হাওয়া খাওয়া হয়েছে—

—যাওনা তুমি, যাচ্ছি। না কি বসবে একটু?

—রক্ষে করো, ঘরেই যা কাণ্ড হচ্ছে। আলনা থেকে কাপড়গুলো সমস্ত ঘরের মেঝেয় জমা হয়েছে, আর তোমার ওই টেবিল-ঢাকার কোণটা ক্রমাগত একভাবে উড়ে উড়ে পায়ায় ধাক্কা খাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে কে যেন চটি প'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।...অনেকক্ষণ জেগেছি আমি।...তোমারই হাওয়া খেতে খেতে সময়ের জ্ঞান নেই!

নিবেদিতা উঠলেন।

বললেন—শোওগে তুমি, আমি চেয়ারটা আর তোমার জামাটা তুলে রেখে যাচ্ছি।

—আরে, জামাটা এখনো রয়েছে? কি আশ্চর্য! পিনের খোঁচা লেগে ছিঁড়লো না তো?

—ছিঁড়ে থাকে তো আপদ গেছে। ওটা তো তোমার সেই কাঁধবড়ো পাঞ্জাবিটা?

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ফিরে এসেছেন নিবেদিতা। অভ্যস্ত পটুতায় একসেকেণ্ডে চেয়ারটা তুলে, জামাটা খুলে নামিয়ে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

সত্যশরণ বললেন—এখানে এসে তুমি যেন কি রকম বদলে গেছো।

নিবেদিতা হাসলেন—বদলানোই তো উচিত, চেঞ্জ মানে কি তাহলে? এতো টাকা খরচ করে আসার উদ্দেশ্য কি তবে?

সকালবেলা চায়ের সঙ্গে অনুপানের আয়োজনটা একটু বেশী করা হলো, নিমন্ত্রিত অতিথির খাতিরে।

যত্ন করে করে এটা ওটা তৈরি করলেন নিবেদিতা।

একসময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললেন—তোমার অতিথি আর এসেছে! কাল ভদ্রতার খাতিরে বললো 'আসবো আসবো'! আমার শুধু শুধু কর্মভোগ!

—বাঃ সে কি, অতো করে বলা হলো! উনি নিজেও তো—এমন কিছু বেলা হয়নি এখনো, আসবেন ঠিক।

—রাত্রে দেখা, বাড়ী বুঝতে পারবেন তো? আমার তো এখানে রাস্তাটাস্তা কেমন গুলিয়ে যায়।

—তোমার কথা বাদ দাও। শুনলে তো, ভদ্রলোক চারবার এসেছেন।... কি কি করলে?

—হাতী ঘোড়া অনেক কিছু। তোমার যেমন! সমাজ সংসার ছেড়ে দু'দিন গায়ে হাওয়া লাগাতে এলাম, এখানেও যতো সব ঝামেলা জোটাচ্ছো।

সত্যশরণ একটু আহত হন।

নিবেদিতা যে সত্যিই বিরক্ত হবেন এটা তিনি মোটেই আশঙ্কা করেননি। লোককে খাওয়াতে টাওয়াতে তো খুবই ভালবাসেন নিবেদিতা।

একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সহসা দেখলেন একটা অনুপম উজ্জ্বল আভায় যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে নিবেদিতার বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখ, দুই হাত কপালে তুলে কলকণ্ঠে কাকে সম্বর্ধনা করছেন—এই যে আসুন! এতোক্ষণ ভীষণ নিন্দে করছিলাম আপনার!

নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলেন সত্যশরণ।

ওঃ তাই! এতোক্ষণ ঠাট্টা করছিলেন নিবেদিতা!

সত্যি ভারী সুন্দর লোক যতীশ্বর।

খাওয়া নিয়ে এমন একটা আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়, এ জানা ছিলো না নিবেদিতার!

জীবনে অনেক রান্না রেঁধেছেন, অনেক শৌখিন খাবার তৈরি করে করে লোক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন, ভালো রান্নার খ্যাতি যে নিবেদিতার না আছে তা নয়, মামাতো দ্যাওর আর ননদাইরা তো কতো হৈ-চৈ করে আমোদ করে

খেয়ে যায় তাঁর বাড়ীতে, কিন্তু কই, এমন মার্জিত সভ্য সরস প্রশংসা কে কবে করেছে ?

জানে কে ?

ওরা সবাই যেন কেমন স্থূল !

যতীশ্বর বলেন—এসেছেন তো চেঞ্জে, এতো সব যোগাড়-যন্তর করলেন কি করে বলুন তো ?

নিবেদিতা লজ্জিত মুখে বলেন—কি আবার এতো যোগাড়-যন্তর দেখলেন আপনি ?

—'কি' যে, তা কি আমিই জানি ছাই ? এসবে অনেক কিছু লাগে তাই জানি। তাহলে একটা 'ঘরের কথা' বলি আপনাকে ! আমি বরাবর একা-একাই বেরোই, একবার মেজদার শখ হলো, সপরিবারে আমার সঙ্গ নেবেন। ...বেশ চলো ! বেশী কোথাও নয় হাতের গোড়ায় ঘাটশিলায়। আমার এক ছাত্রের বাড়ী আছে, মালি গোছের লোকও পাওয়া যাবে একটা, খুব আনন্দ ! ...গোছগাছের ধুম দেখে কে ! এই স্টোভ আসছে, এই ইকমিক-কুকার আসছে, একগাদা বাসনই কিনে ফেললেন মেজদা, কাচের এ্যালুমিনিয়ামের এনামেলের ! হরেক রকম শিশি বোতল কৌটো !...শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম—মেজদা, করছো কি বল তো ? সারা কলকাতাটা তুলে নিয়ে যেতে চাও নাকি ?

মেজদা বললেন—তুই বুঝিস না, মেয়েরা মোটে অগোছ-অবিলি দেখতে পারে না। তোর মেজবৌদির ফর্দ ! একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সব সুশৃঙ্খল চাই।

ভাবলাম তা বটে ! মেয়েদের ব্যাপার 'বুঝি' এ দাবী করতে পারি না। আর 'একটু এদিক-ওদিক' হলে যে, কী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে তাও জানি না। যাক খুব সুশৃঙ্খলে কাটানো যাবে এই আনন্দেই আছি।...প্রথম রাত থেকেই শুরু হলো শৃঙ্খলার নমুনা !...

আশ্বিনের শেষ, কলকাতায় গরম, বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে কিছু কিছু, বিশেষ রাত্রে। ছেলে দুটোকে শুইয়ে মেজদা বললেন—এদের গায়ে একটা করে চাদর-টাদর ঢাকা দিয়ে দাও, ঠাণ্ডা আছে।

মেজবৌদি অবাক্ হয়ে বললেন—গায়ে দেবার চাদর ? সে কোথায় পাবো ? বাড়তি চাদর তো কিছু আনিনি !…মেজদা বললেন—বেশ করেছো ! নিজের শাড়ী ডজন তিনেক এনেছো তো ?…বলাই বাহুল্য ভদ্রমহিলা ক্ষেপে উঠলেন—

নিবেদিতা বলেন—শাড়ীর খোঁটা দিলে কোন্ ভদ্রমহিলাই বা না ক্ষেপেন ?

—হুঁ, তিনি তখন শুরু করলেন—সিমলে পাহাড়ে আসছিনা—কি করে জানবো যে লেপকম্বলসুদ্ধ্ আনা উচিত ছিলো ! আমি তো তবু বুদ্ধি করে ওদের ছোট সোয়েটারগুলো এনেছি, ভাবলাম ভোরে বেড়াতে যাবে ! এতো ভেবে, এতো গুছিয়ে আনলাম !

আমার সঙ্গে চাদর-টাদর থাকেই দু'একটা বেশী, সে মোহাড়াটা কোনো রকমে মিটলো !…পরদিন ভোরে আবার ! কর্তাগিন্নীতে উচ্চ প্রেমালাপ চলছে দেখে খোঁজ নিলাম, কী ব্যাপার ! না, সাবান টুথপেস্ট আর্সি চিরুনি আর মেজদার শেভিং সেট্‌টা আসেনি !

—যাঃ, এ আপনি বানাচ্ছেন ! এসব আবার ভোলে নাকি মানুষ ? —নিবেদিতা বলেন।

—কি মুশকিল ! বানাবো কেন ! মেজবৌদিই কি জানেন না এসব ভুলতে নেই ? পাছে কিছু ভুল হয়ে যায় বলে, ছোট যে এ্যাটাচি কেস্‌টায় 'ছিষ্টি' গুছিয়ে নিয়েছিলেন, সেইটাই খালি ভুলে গেছেন।

যাক সে ঝোঁকটাও কাটলো ! মেজদা বললেন—এক কাজ করো, দুটো স্টোভই জ্বালা যাক, আমি চা-টা করে নিচ্ছি, তুমি দু'চারখানা লুচি আলুভাজা করে ফেলো, খেয়ে দেয়ে বেড়াতে বেরোনো হোক।…এসে তখন তাড়াতাড়ি করে সেরে নেওয়া যাবে।…কিচ্ছু না, মাংস আর ভাত, কি বলিস যতী ?

বললাম—'এনাফ্' !…পাশের ঘর থেকে স্টোভ জ্বালার শোঁ শোঁ শব্দ পাচ্ছি, দুটো স্টোভ একসঙ্গে, প্রায় এই সমুদ্রগর্জনের কাছাকাছি, হঠাৎ সে গর্জন ছাপিয়ে, সেই—'দাম্পত্য প্রেমালাপ !'…

শুনলাম 'লুচি হবে না ? চাকি বেলুন আসেনি ?'

খিদে পেলে মেজদার জ্ঞান থাকে না, বিষম চটেছেন তখন, চীৎকার করছেন —দশদিন ধরে কি ঘোড়ার ডিম গোছালে তবে ? আমার পকেট তো ফর্সা হয়ে গেলো 'হ্যানো চাই' 'ত্যানো চাই'এর জ্বালায়। বিদেশে এসে রান্না খাওয়া করতে হ'লে একটা চাকি বেলুন চাই এ জ্ঞান নেই ?

মহা মুশকিল! এ জিনিস তো আমার স্যুটকেস হাতড়ে মিলবে না!... অগত্যা ছেলেদের জন্যে আনা দু'টিন বিস্কুটের একটিন তক্ষুণি সদ্ব্যবহার করা গেলো পাঁচজনে মিলে।...ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে।...নাটক আরো জমে উঠলো দুপুরবেলা! বেড়িয়ে ফিরে ছেলে দুটো হৈ-চৈ লাগিয়েছে খিদে বলে, মেজদার অবস্থাও তদ্রূপ।...ফেরবার সময় আমাদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আলু পেঁয়াজ আর মাংস নিয়ে এসেছেন কোঁচার কাপড়ে করে...কথা হলো আগামী কাল থেকে বাজার করবার জন্যে একটি থলি নিয়ে বেড়াতে বেরোনো হবে।

মেজদা মহোৎসাহে লেগে গেলেন রান্নায়।

...বৌদি দুটো বঁটি এনেছেন দেখে মহা প্রশংসা।

নিবেদিতা হেসে বললেন—আপনি এতো মজা করে বলতে পারেন! বঁটি আবার দুটো কেন? দু'জনে কুটনো কুটবেন?

—আহা তা কেন! একটায় ফল কাটা হবে!...কিছুক্ষণ পরেই 'আবার, আবার সেই কামান গর্জন'! তখন আবার ভরা দুপুর! রাত্রের ঠাণ্ডার লেশও নেই। আর পারলাম না, উঠে গিয়ে বললাম—মেজদা, করছো কি? খিদে বাড়াবার এ এক নতুন পদ্ধতি নাকি? কতো চেঁচাচ্ছো?

মেজদা বললেন—চেঁচাবো না? তুই বলিস কি? সমস্ত নিজে ঠিকঠাক করে মাংসটা চাপিয়ে যেই গরম মসলা চেয়েছি, তোর বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়লো! বলে কিনা—'গরম মসলা! গরম মসলা আবার কে আনতে গেছে!'...শোন, শোন তুই!...

মেজাজ ঠাণ্ডা করতে হেসে বললাম—গরম মসলা না দিলে মাংস রাঁধা চলবে না, এরকম কোনো আইন আছে? রেঁধেই দেখো না!...

'তেমন রান্না আমি রাঁধি না। ইচ্ছে হয় ও রাঁধুক!' বলে মেজদা গিয়ে শুয়ে পড়লেন!

—উঃ, সেই রোদ্দুরে গরম মসলার জন্যে যা ছুটোছুটি!

—বলেন কি? আপনি ছুটলেন?

—বাঃ, তাছাড়া উপায়! গাঁইয়া দেশ, পাওয়াই যায় না সহজে। মালি ব্যাটা সেই ইস্তক সমানে আমাকে 'গরম মসলা বাবু' বলে ডাকতো!

সত্যশরণ মহানন্দে মিটিমিটি হাসছিলেন এতোক্ষণ, এইবার মহোৎসাহে

বলে ওঠেন—আর ইনি? এঁর ব্যবস্থা যদি দেখেন! আপনি মাঝরাত্রে এসে বাঘের দুধ চেয়ে দেখবেন, ঠকাতে পারবেন না।

—থামো তো তুমি—ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন নিবেদিতা—কথার একটু মাত্রা রেখো!

সত্যশরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হয়েও জোর বজায় রাখতে বলেন—বাঃ, মিছে বলেছি কিছু? ট্রেন থেকে নেমে মাথা ধরার সময় কি হলো? ···ব্যাপার কি জানেন মশাই, আমার একটা বিশ্রী ধাত, একটু ওদিক ওদিক হয়েছে কি 'আধকপালে' ধরে বসে আছে, সময় অসময় নেই, হলেই হলো। আমার মা বলতেন রক্ত-চন্দন, বরাবর তাই লাগাই, সেরেও যায়। তাজ্জব বনে গেলাম মশাই, সেদিন দেখি ইনি বাসায় নেমেই রক্তচন্দন ঘষে এনে হাজির।···তখনো ট্রেনের কাপড় বদলানো হয়নি!

···চকচকে দাঁতে আলোর মতো হেসে ওঠেন যতীশ্বর! —যতো শুনছি ততোই আপনার সৌভাগ্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হচ্ছি, সত্যশরণবাবু!

—ছেলেটার আক্কেল দেখছো? সেই একখানা চিঠি ঠেকিয়েই বাস্, বাবুর কর্তব্য সারা হয়ে গেছে!

নিবেদিতা হাতের বইখানা মুড়ে চমকে তাকালেন—চিঠি? কই? কে দিলে?

সত্যশরণ হো হো করে হেসে ওঠেন—তুমি যে সেই 'কাদের সাপ'এর মতো করলে! চিঠি 'দিলে' আবার কে! দিলে না বলেই তো রাগ করছি। বলছি গৌতমবাবুর আক্কেলের কথা!···হয়েছে আর কি, খাওয়া দাওয়ার তো খুব কষ্ট হচ্ছে? তাতেই রাগ অভিমান হয়েছে বাবুর।

নিবেদিতা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে যান। সত্যশরণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছেলের আক্কেলের নিন্দে করতেও পারেন না, পারেন না ছেলের পক্ষ অবলম্বন করতে।

স্বামীর মনস্তত্ত্ব তিনি বুঝতে পারছেন, ছেলের জন্যে মন কেমন করছে। কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ভেবে তাঁর নিজের যা কষ্ট হচ্ছে, সেইটাই, 'রাগ অভিমানের' নামে ছেলের দিকেই চাপাতে চাইছেন।

আশ্চর্য! এ মন-কেমনটা নিবেদিতার না হয়ে, হলো সত্যশরণের!···

কই, নিবেদিতার এই ক'দিন ক'বার তেমন স্পষ্ট করে মনে পড়েছে গৌতমের কথা? ক'বার মনে পড়েছে কলকাতার কথা?···আনাড়ি ফটিক কি রাঁধছে না রাঁধছে, ঘর সংসার কতো অপরিষ্কার করছে, এসব ভেবে তেমন অস্থির হয়েছেন কোনোদিন?···

প্রথমটা অবশ্য ছেলের ওপর তাঁর নিজের অভিমানটাই ছিল প্রবল। জন্মে কক্ষনো কোথাও যাওয়া হয় না, এবারে সত্যশরণের এক বন্ধুর দৌলতে এই বাড়ীটা পাওয়া গেলো বলেই না অতো সাধ হয়েছিলো নিবেদিতার, স্বামী-পুত্র নিয়ে কাটিয়ে যাবেন কিছুদিন। সেই সাধে বাদ সাধলো ছেলে।

কিন্তু তাই বলে তিনি মা হয়ে সেই অভিমানটাকে বড়ো করে রেখে দেবেন? ছেলের জন্যে মন কেমন করবে না? তাকে কষ্ট অসুবিধের মধ্যে ফেলে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে থাকবেন?

নিবেদিতার প্রকৃতি তো এরকম হবার কথা নয়।

নিবেদিতাকে মৌন দেখে সত্যশরণ ফের বলেন—ক'দিন হলো এসেছি আমরা?

সে কথা মনে আছে নিবেদিতার।

দেখেছেন সেদিন, কী দ্রুতগতিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে! যেন কোথা দিয়ে···কোন স্বপ্নের ঘোরে।

—এসেছি আজ এই তেইশ দিন!

—এতোদিন ফট্‌কের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে পড়ার বাসনা ঘুচে গেছে বাছাধনের, কি বলো?

ছেলের কথাই একটু কইতে চান সত্যশরণ। 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতির' মতো।

—তা ভেবো না! সে ছেলে নয় তোমার! ভাঙবে তো মচকাবে না!

অন্য আর একটা জগৎ থেকে এ জগতে নেমে আসেন নিবেদিতা!

সত্যশরণ বললেন—এক কাজ করলে হয় না? ওকে বিশেষ 'ইয়ে' করে একটা চিঠি লিখে দিই, চলে আসুক! ছুটির শেষ ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে—

নিবেদিতা সহসা কঠিন সুরে রায় দিয়ে দেন—না, আমাদেরই ফেরার চেষ্টা হোক। আর থাকবার দরকার কি?

থতমত খেয়ে যান সত্যশরণ, বুঝতে পারেননা এ কাঠিন্য কার ওপর।

স্বামীর ওপর? ছেলের ওপর? কিন্তু কেন? ছেলের ওপর যা রাগ অভিমান হয়েছিলো, তার চিহ্ন তো কই এখানে এসে বোঝাই যায়নি। 'দরকার কি', এ কথার অর্থ আছে?

আসবারই বা কি দরকার পড়েছিলো তবে?

চেষ্টাচরিত্র করে পুজোর ছুটির সঙ্গে আরো একমাস ছুটি নেবার দরকার কি ছিলো?

কিন্তু ভয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না।

আজকাল যেন মাঝে মাঝে নিবেদিতাকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

কিন্তু নিবেদিতা নিজেই কি বুঝতে পারবেন, এ কাঠিন্য তাঁর, নিজেরই ওপর। হঠাৎ কোথায় যেন নিজের একটা ত্রুটি ধরা পড়ে গেছে, এ তারই গ্লানি।

এসে পর্যন্ত তিনিই বা কি এমন অস্থির হয়ে চিঠি লিখেছেন গৌতমকে? প্রবাসী কন্যাকে তো দেনইনি একখানাও।

সত্যশরণের সঙ্গে যতীশ্বরের পরিচয় হবার পর থেকে একটা অলিখিত আইন হয়ে গিয়েছিলো, বেড়াতে বেরোবার সময় যতীশ্বর প্রথমে ওঁদের বাড়ী এসে হাজির হবেন, এসে চা খাবেন, অতঃপর তিনজনে একসঙ্গে বেরোনো হবে।

অথচ এটা এমন কিছু ন্যায্য আইন নয়।

যতীশ্বরও যদি সস্ত্রীক হতেন, দৃশ্যটা শোভন হতো। কিন্তু একটি দম্পতি-যুগলের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বেখাপ্পা নয় কি? যতীশ্বর দু'এক-দিনের পরই এ ব্যবস্থাকে এড়াতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, পেরে ওঠেন নি। পারেন নি ওদেরই আগ্রহাতিশয্যে।

এতো আগ্রহ দেখান সত্যশরণ!

কারণটা এই—সংসারী সামাজিক মানুষ সত্যশরণ, পরিচিত পরিবেশ, অফিসের অভ্যস্ত কাজ, সহকর্মীদের সাহচর্য—সবকিছু ছেড়ে এসে, উদয়াস্ত কেবলমাত্র স্ত্রীর সান্নিধ্যে যেন হাঁফিয়ে উঠছিলেন। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গল্প আলোচনার যা সব পরিচিত বিষয়বস্তু ছিলো, এখানে তার অনেক কিছুই নেই। যাও বা আছে, নিবেদিতার যেন তাতে মনের যোগ নেই।...

এমন ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আশীর্বাদের মতো।

হ্যাঁ, সত্যশরণ যতীশ্বরকে আশ্রয় ধরেছেন।

তাঁর আকিঞ্চন এড়ানো শক্ত।

আর নিবেদিতা?

সেই তো এক অদ্ভুত রহস্য!

নিবেদিতা যেন একটা অভাবিত সংশয়ের রূপ ধরে যতীশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যতীশ্বরের মঙ্গলাভেচ্ছায় সত্যশরণ যে আগ্রহ প্রকাশ করেন, নিবেদিতা তো তার শতাংশের একাংশও করেন না। বরং অনেক সময় স্বামীর কথার প্রতিবাদই করেন। যতীশ্বরের সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন তুলে, স্বামীকে নিবৃত্ত করবারই প্রয়াস পান। কিন্তু? সেইটাই কি সব?

যতীশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার চোখে মুখে যে আলো জ্বলে ওঠে, সে কি লক্ষ্যের বাইরে থাকবার মতো? সত্যশরণের মতো 'উদোমাদা' লোকের চোখে যদিও বা না ঠেকে, যতীশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সীমানা থেকে কি করে আত্মগোপন করবে সে জিনিস?

মুখের প্রতিবাদের সঙ্গে চোখের অনুনয়ের ভাষার যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যতীশ্বর অবাক্ হন, অবিশ্বাস করেন, নিজের ধারণাকে সম্পূর্ণ 'ভুল' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। যতীশ্বরের প্রতি নিবেদিতার অসতর্ক মুগ্ধদৃষ্টি সত্যকে ধরা পড়িয়ে দেয়।

অভাবিত সংশয় নিশ্চিত মীমাংসার মূর্তি ধরে বিপন্ন করে তুলতে চায় যতীশ্বরকে।

কিন্তু—একি সম্ভব?

একি সম্ভব?

কী অস্বস্তিকর চিন্তা!

ভাবতে ইচ্ছে করে, অথচ ভাবলে লজ্জা করে। নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা করে। মনে হয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেলো নাকি, তা নইলে মনে এমন সন্দেহেরও উদয় হয়? এমন একটা অসম্ভব অবাস্তব সন্দেহ!

বরং ওদের সঙ্গে যখন ঘোরাফেরা করেন, গল্প করেন, তর্ক করেন, তখন চিন্তাটা এমন পেয়ে বসে না। সন্দেহটা হাস্যকর মনে হয়।

কিন্তু ফিরে এলে ?

একা হলে ?

তখন—তখন আর নিবেদিতার বয়সের মর্যাদা ভালো করে মনে পড়ে না। মনে পড়ে না গৃহিণী নিবেদিতাকে।...মনে পড়ে না—এই সেদিন সত্যশরণের সঙ্গে কথায় কথায় বয়সের হিসেবে প্রমাণ হয়ে গেছে, নিবেদিতার চাইতে যতীশ্বর নাকি মাস কয়েকের ছোট।

মনে হয় নিবেদিতাই যেন একটি ছোট মেয়ে মাত্র !

দীর্ঘ অবিবাহিত জীবনে এমন বিপন্ন অবস্থায় কখনো পড়েননি যতীশ্বর ! এমন বিব্রত বোধ করেননি কোনো দিন।

ভাবেন এড়াতে চেষ্টা করবেন, হয় কই ?

দু'বেলা কে যেন লক্ষ আকর্ষণে ওই একটি দিকে টানতে থাকে। না গিয়ে উপায় থাকে না। প্রত্যেক দিন মনে করেন 'আচ্ছা আজই শেষ, তারপর কোনো অজুহাত দেখিয়ে'—কিন্তু পরদিনই হয়তো—না গেলেই চলে না ! হয়তো—সেদিন নতুন কোনো একটা জায়গায় যাবার হিড়িক ওঠে। সে দায়িত্ব যেন যতীশ্বরেরই।

সত্যশরণ তো চির নাবালক। যতীশ্বরের সঙ্গে আলাপ না হলে, নেহাত ওই 'জগন্নাথ' ছাড়া 'দ্রষ্টব্য' বলতে আর কিছু দেখা হয়ে উঠতো নাকি ওঁদের ? অজানা জায়গায় যাবার কথা উঠলেই যে সত্যশরণের ভাবনার আর শেষ থাকে না।

অথচ ভারী তো জায়গা পুরী !

দ্রষ্টব্য বলতে যা কিছু সবই তো হাতের কাছে ছড়ানো আছে।...দুর্গমও নয়, দুঃসাধ্যও নয় !...

পুরীতে যা সত্যি 'দেখবার জিনিস' সে তো যে কোনো একটা জায়গায় বালির গাদায় বসে পড়লেই দেখা যায়। তার জন্যে ছুটোছুটি করবার নেই, হাঁফাহাঁফি করবার নেই, টিকিট কাটতে হয় না, প্রণামী দিতে হয় না !... সেই বিরাট মহান দেবতার, সময়ের একটু এদিক ওদিকে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবার ভয় নেই, 'ভোগ' নেই, 'শয়ান' নেই। আছে শুধু, অনন্তকালের নিত্য আরতি !

তবু তাঁকে ফেলে দেখতে যেতে হয়—'সিদ্ধ বকুল', 'গৌরাঙ্গের ছেঁড়া কাঁথা!'

না দেখলে লোকে বলবে কি?

গালে হাত দিয়ে 'হাঁ' হয়ে যাবে যে!

* * * * *

সে সব 'ছেঁড়া কাঁথা' মঠ মন্দির ইত্যাদির ব্যাপার প্রায় সবই মিটেছে। এখন নিবেদিতার বায়না এতোদূর এসে কোণারক না দেখে গেলে জীবনই মিথ্যে।

শুনে সত্যশরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে!

কোণারকের পথে যে, ঝোপে-ঝাপে বাঘ আর খোপে-খাপে ডাকাত লুকিয়ে থাকে এবং স্থবিধে পেলেই 'ঝুপ' করে ঘাড়ে এসে পড়ে, এ খবর রাখেন না নিবেদিতা?

পুরী এসেছো, বেশ করেছো! জগন্নাথ দেখো, সমুদ্রস্নান করো, দু'খানা কট্‌কী শাড়ী হলো, দু'পাঁচখানা 'ক্ষেত্তরকাঁসা'র বাসন কেনো, এখানে ওখানে বেড়াও, আবার কি!

ফিরে ফিরতি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধো, বাস্!

তা নয়, একি দুঃসাহসিক সাধ?

এসব শুনে নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন—সেকাল থেকে একাল অবধি যতো লোক 'কোণারক' নামক বিজন অরণ্যের পথে যাত্রা করেছে, তাদের সকলেরই সে যাত্রা, বাঘের দাঁতে কিংবা ডাকাতের হাতে 'মহাযাত্রা'য় পরিণত হয়েছে কিনা।

কর্তা-গিন্নীর এই তর্কের মাঝখানে এসে উদয় হলেন যতীশ্বর। হৈ-হৈ করে উঠলেন সত্যশরণ—এই যে ভায়া, এসে গেছো! বলি, তুমি তো কালকে —পথের মাঝখানে পটকাটি ফেলে দিয়ে দিব্যি কেটে পড়লে? এদিকে সে পটকা ফেটে আমার যে জীবন সংশয়!

সরস বাক্‌পটু যতীশ্বরের সঙ্গে বেশ একটু রসালো করে কথা কইবার ইচ্ছেয়, চেষ্টাচরিত্র করে এরকম ঠাট্টা-তামাসা করতে শিখেছেন সত্যশরণ আজকাল।

যতীশ্বর সচকিতে একবার দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেন।—কারণ কোণারকের কথা তিনিই তুলে গেছেন কাল।

যাই হোক সত্যশরণের কথায় তিনি সহাস্যে বলেন—কেন, কি হলো ?

—হলো আর কি, সেই কোণারক ! কাল থেকে মাথায় ঘুরছে ! ঘুম নেই রাত্তিরে ! মাঝরাত্তিরে উঠে দেখি ঠায় জানলায় বসে !

নিবেদিতা অপ্রতিভ বিরক্তিতে বলেন—হ্যাঁ, মাঝরাতে জানলায় বসেছিলাম কোণারকের চিন্তায় ! এমন বাজে বাজে কথা বলো !

—আচ্ছা তবে, খামোকা ঘুম হচ্ছিলো না কেন ?

—হচ্ছিলো না--হচ্ছিলো না ! তোমার মতো কুম্ভকর্ণ তো সকলে নয় যে, বালিশে মাথা ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে।

যতীশ্বর হেসে বলেন,—তা যেতে বাধাটাই বা কি ? ওখানে হোটেলের বহু লোক যাচ্ছে। প্রায় রোজই তো একটা-না-একটা দল তৈরি হচ্ছে !

—যে যায় যাকগে ভায়া, আমার ওসব তেমন সুবিধে মনে হয় না। নাহক্ সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা ! আরে বাবা পৃথিবীতে দেখবার জিনিস কতো রয়েছে, ক'টা দেখছি ?

যতীশ্বর মৃদুহাস্যে বলেন—আমারও অবশ্য আপনার সঙ্গে মতের খুব বেশী তফাত নেই, তবে—

তবে ? আমার ঘরে হুজুগটি তুলে দিয়ে মজা দেখবার তালেই মত বদলাচ্ছিলে, কেমন ? নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসতে থাকেন সত্যশরণ !

নিবেদিতা যতীশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলেন—খুব তো বলছেন এখন ! সেদিন যে বললেন—দু'বার গেছেন কোণারকে ?

—এই, দলে পড়ে আর কি !

—ইস্ তবে যে বলছিলেন—অদ্ভুত ভালো লাগে আপনার ?

—বলে ফেলেছিলাম বুঝি ? সে এমন কিছু নয় !...আসল কথা কি জানেন—

সত্যশরণ বললেন—ওঃ এবার তোমরা 'আসল কথায়' নামছো ? তাহলে তো আগে চায়ের ব্যবস্থাটা করতে হয় গো ! গলা ভিজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করাই ভালো !...তর্ক শুরু হলে তো ঘণ্টা কেটে যাবে ! তোমার তো তর্ক পেলে আর—

নিবেদিতা বললেন—বেশ, আজ আমি চুপ !

যতীশ্বর সহসা একবার নিবেদিতার মুখের দিকে তাকান। তারপর মৃদু হেসে শান্ত গলায় বলেন—সেটা সহ্য হবে না!···সমুদ্র যদি হঠাৎ আশ্বাস দেয় 'আচ্ছা চুপ করছি—' সইবে আপনার?

নিবেদিতার মুখটা এক সেকেণ্ডের জন্যে কেমন বিবর্ণ দেখায়, মনে হয় উত্তর যোগাবে না, পরক্ষণেই কিন্তু হেসে উত্তর দেন—ওঃ তার মানে—ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে, আমার কথা—সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে তুলনীয়। কেমন?

—সেটা উনিই ভালো বলবেন—'গর্জনে'র স্বাদটা যিনি বিলক্ষণ পান!··· বলে যতীশ্বর সকৌতুকে সত্যশরণের দিকে তাকান!

সত্যশরণ পিঠের গেঞ্জিটা উল্টে তুলে, পিঠটা দেওয়ালে ঘষে চুলকোতে চুলকোতে বলেন—ওসব কথার উত্তুর কি আর আমার কাছে আছে রে ভায়া? তুমি হলে প্রফেসর মানুষ, লেক্‌চার করা পেশা, আর ইনি তো—স্রেফ নাটক-নভেল পড়া বিদ্যের জোরেই তোমাকেও হার-মানান।···আমি বেচারা তোমাদের অর্ধেক কথার মর্মই বুঝতে পারি না। কি যে হেঁয়ালির ভাষা এখনকার!

নিবেদিতা হঠাৎ কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—ওই শুনুন প্রফেসর মশাই, দেখুন! এই এক তিনকেলে বুড়োর হাতে পড়ে জীবনটাই মাটি হলো আমার।

সত্যশরণ প্রীতহাস্যে বলেন—আর নিজে যেন একবোরে একালিনী। কোন কালে জন্মেছ?

—'সেকেলে' 'একেলে' নির্ণয় করতে কি আর শুধু সাল-তারিখ দেখলেই হয়? ওর আলাদা হিসেব আছে বুঝলে?···কি বলেন প্রফেসর মশাই?

সত্যশরণ হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—ওই দেখো ভায়া, আবার হেঁয়ালি!··· কিন্তু সত্যি তুমিই বা এতো কথা কবে শিখলে, তাও তো ভেবে পাই নে। সমুদ্দুরের খোলা হাওয়ায় মাথাটা যেন আরো বেশী খুলে গেছে তোমার।··· মাঝে মাঝে মনে হয় দশবছর বয়েস কমে গেলো নাকি!

বাইরের লোকের সামনে কোন্ কথা কতটুকু চালানো যায়, আর কোথায় সীমারেখা টানতে হয় সে জ্ঞান বেচারা সত্যশরণের নেহাতই কম।

নিবেদিতা ঈষৎ বিরক্তভাবে বলেন—হয়েছে, থামো। আর কথা খুঁজে পেলে না।···আসল কথায় আসুন দিকি প্রফেসর মশাই।···কোণারকে যাওয়ার

কি হবে? এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যেতে রাজী না হন, আমরাই যাই চলুন। বাঘে খায়, আমাদেরই খাবে।…'বাসে'র ব্যবস্থাটা কি? মাথাপিছু কতো করে ভাড়া?

বহু বাক্ বিনিময়ের শেষে যাওয়ার ব্যবস্থাই পাকা হয়।

সত্যশরণও অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজী হন।

যদিও নিবেদিতা খুব জোর তলবে বলেন—কেন, তোমার যাবার দরকারটা কি? কেউ তো সাধছে না! না যাবে, নিজেই ঠকবে। আর যদি আমরা বাঘের পেটে যাই, তখন প্রমাণ হবে জিতেছো তুমিই।

সত্যশরণ গম্ভীর ভাবে বলেন—অলক্ষণের কথা নিয়ে বারবার ঠাট্টা করতে নেই।…বেশ ভায়া, ও একটা হেস্তনেস্ত করেই ফেলো। আজ পর্যন্ত তো দেখলাম না কখনো, যেটি ধরবেন, সেটি না করে ছাড়বেন।…আচ্ছা, তোমরা কথাটা সম্পূর্ণ পাকা করে ফেলো, আমি একটু ঘুরে আসছি।

নিবেদিতা বলে ওঠেন—কোথায় আবার এখন ঘুরতে যাবে?

—না না, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছিনা কোথাও। একটু দোকানে যাবো।

দোকানে? যতীশ্বর বলেন—বেশ তো রাত হয়ে গেছে এখন আবার—কোন্ দোকানে? চলুন আমিও উঠি।

—আরে না না, কোথায় রাত? বোসো না। আমি এই এলাম বলে। যাবো আর আসবো।

—ব্যাপারটা কি?

—এই এখানে এক ব্যাটা উড়ের পানের দোকান আছে, বেড়ে পান সাজে। গোটাকতক নিয়ে এসে জমিয়ে বসি।

হঠাৎ যতীশ্বর বলেন—বৌদির চাইতে ভালো পান সাজে আপনার উড়ে?

'বৌদি' শব্দটা এই প্রথম ব্যবহার করেন যতীশ্বর! সত্যশরণের কানে শব্দটা নতুন ঠেকে কিনা কে জানে, তিনি আপন তালেই চটিটা পায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে বলেন—বলা উচিত নয়, উনি চটে যাবেন। তবে—এ আর এক ধরনের বেশ মজার স্বাদ! কি যে 'গুণ্ডি মুণ্ডি' দেয় ব্যাটারা!

সত্যশরণ চলে যেতেই নিবেদিতা দ্রুত ভঙ্গীতে বলে ওঠেন—হঠাৎ নতুন সম্বোধন কেন?

—কই? যতীশ্বর যেন অন্যমনস্ক—ওঃ 'বৌদি' বললাম তাই?…ভালোই তো, কথা বলার সুবিধে।

—এতোদিন বুঝি খুব অসুবিধে পোহাচ্ছিলেন?

—আহা, তা কে বলছে—বাক্‌পটু যতীশ্বরকেও একা একা এভাবে —কেমন একটু নার্ভাস দেখায়। সত্যশরণের যদি কোনো বিবেচনা থাকে!

নিবেদিতা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলেন—নিজেকে একটা সম্বন্ধের সূত্রে বেঁধে ফেলতে না পারলে বুঝি নির্ভয় হতে পারছেন না?…শুধু বন্ধুত্ব থাকা একেবারে অসম্ভব?

যতীশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—'অসম্ভব' শব্দটার সত্যিই কোনো অর্থ আছে কিনা কে জানে। হয়তো নেই।…কিন্তু মুশকিল কি জানেন, আপনাদের যে সম্বোধনের ঠিক কিছু সুবিধে নেই। 'মিসেস অমুক' বলতেও খারাপ লাগে।

—নাই-বা কিছু বললেন!

—কেন বিশেষ একটা ডাকে আপত্তি কি আপনার?

—নাঃ আপত্তি আর কি!

—কথার সুরে তো মনে হচ্ছে যথেষ্ট আপত্তি।…বেশ ওটা বাতিল। বলুন কি বলবো? 'মিসেস' দিয়ে পরের নামে না চালিয়ে, নিজের নামে 'দেবী' বললেই হয়। কিন্তু আমি তো আপনার নামই জানি না—

—নাম জানেন না! আশ্চর্য!

'আশ্চর্যটা অস্ফুট!

কিন্তু কেনই বা এটা এমন আশ্চর্য মনে হলো নিবেদিতার! জানাটা কি অবশ্য কর্তব্য ছিলো যতীশ্বরের?

যতীশ্বর বলেন,—নাম জানবার সুবিধে পেলাম কবে?…উনি তো 'ওগো শুনছো' দিয়েই কাজ সারেন।

—আপনিও তাই 'বৌদি-টৌদি' যা হয় দিয়ে কাজ সারছিলেন, কেমন? কাজ সারা নিয়ে কথা!

—তা ছাড়া আর বেশী দাবী করবার ভরসা পাচ্ছি কোথায় বলুন?

কথা বলার জন্যেই কথা বলা।

তলোয়ারের ফলকের মাঝখান থেকে পিছলে পড়ে সে কথা, ধারালো আগার কাছ পর্যন্ত যেতে সাহস করে না।

—নাম জানতে চাওয়াটা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলে দোষ ধরবেন?

—জেনে লাভ কি?

—লাভ লোকসানের হিসেব ছাড়া, আর কোনো কিছু থাকতে নেই?… ভাবি অনেক সময় কি ধরনের নাম হওয়া সম্ভব আপনার।…মানে আর কি, কি মানায়? সাহস করে জিগ্যেস করতে পারি না।

—এতে আর সাহসের প্রশ্ন কেন?…আমার নাম নিবেদিতা!

এলোমেলো বাতাসের কামাই নেই একতিল! উড়ছে কপালের চুল… উড়ছে শাড়ীর কোণ!…সমুদ্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু…কল্লোল!

নিচে রাস্তায় সত্যশরণকে আসতে দেখা গেলো। ঢিলে-ঢালা চেহারা, গেঞ্জি মাত্র গায়ে।

—কি হে প্রফেসর, কাজের কথার কতোদূর এগোলো?

প্রফেসর উত্তর দেবার আগেই দেন নিবেদিতা!

বলেন—সে কথা তো পাকা! আমার ইচ্ছেই শেষ কথা!

—তা আর জানি না! ধরেছো যখন! এই ছোকরাই আমার মাথা খেলো!…আমার ঘরের গিন্নীটিকে, কি বলে যে—তোমাদের ওই 'তরুণী' করে ছাড়লো!

* * * *

কোণারকে যাওয়ার জন্যে এতো তর্ক এতো চেষ্টা, সব পড়লো চাপা। বাক্সবিছানা বাঁধা শুরু হয়ে গেলো নিবেদিতাদের।

গৌতমের চিঠি এসেছে, ফটিকের জ্বর, আর স্টোভ জ্বালতে গৌতম নিজে হাত পুড়িয়েছে।…'তোমরা চলে এসো', কি 'আমার কষ্ট হচ্ছে' একথা বলেনি। কলকাতার এটা ওটা খবরের মধ্যে সাধারণ একটা খবর হিসেবেই চালিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তার জন্যে অভিমান মা বাপের সাজে না। 'তোমাদের আমার

প্রয়োজন' একথা দূরে থাক, ছেলেরা যদি স্পষ্ট বলে তোমাদের আমার প্রয়োজন নেই তবু অসময়ে স্থির থাকতে পারে মা-বাপ ?

চিঠিখানা উল্টেপাল্টে বার দুই পড়ে নিবেদিতা মুখ তুলে বললেন—তুমি যে বললে 'গৌতম যেতে লিখেছে', কই ?

—ওই হোলো—সত্যশরণ বললেন—ওর নামই ওর বলা ! ছেলেটিকে চেনো তো ? মান খুইয়ে বলবে—'তোমরা এসো' ?

—মানখোয়াবার দায়টা সর্বদা আমাদের দিকেই থাকা উচিত, কেমন ?

—কি মুশকিল, তুমি আবার কি 'আলতাবড়ি' বকতে শুরু করলে ? ফট্‌কের জ্বর, ও হাত পুড়িয়ে বসে আছে, শুনে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারবে ?

—কই আর পারছি ? যাচ্ছিই তো !

যতীশ্বর আর একবার জানান দিতে এসেছিলেন 'বাসে'র ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। পরদিন খুব ভোরে ছাড়বে। প্রায় শেষ রাত্রেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

এসে দেখলেন খোলা সুটকেসের সামনে চুপ করে বসে আছেন নিবেদিতা। সত্যশরণ বাড়ী নেই। সদর দরজা, সিঁড়ির দরজা সব খোলা হাঁ হাঁ করছে।

হাসতে হাসতে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার ! চোরেদের প্রতি এতো সহানুভূতিশীল কেন ? মনে হচ্ছে যথাসর্বস্ব তাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত !

নিবেদিতা সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বললেন—ওঃ আপনি ! উনি এইমাত্র বেরোলেন।

দরজা খুলে রাখার কৈফিয়ত এটুকু, ওইতেই সারেন নিবেদিতা। মনে হচ্ছে নিতান্ত ক্লান্ত, বেশী কথা বলার স্পৃহা নেই।

যতীশ্বর এদিক ওদিক তাকিয়ে অবাক্ হয়ে বলেন—এ কি, এতো সব ছড়িয়েছেন কেন ? বাসা বদলাবেন নাকি ?

—বাসা নয়, দেশটাই ! কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

—ফিরে যাচ্ছেন !…

—হ্যাঁ !

—কবে ?

—আজই রাত্রে !

মিনিটখানেক স্তব্ধতা!

যতীশ্বর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—এতো হঠাৎ?

—জীবনে সবই তো একদিন হঠাৎ ঘটে যায়, প্রফেসর মশাই। মৃদু হাসলেন নিবেদিতা!

—কিন্তু কেন?

বুকটা দুর দুর করে যতীশ্বরের। পুরুষের বুক হলেও করে।...সত্যশরণ কি কিছু সন্দেহ করেছেন?

নিবেদিতাকে কোণারকে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে যতীশ্বর কি বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন?...তাই শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কিন্তু কেন?

—গৌতমের চিঠি এসেছে!...চাকরের অসুখ, নিজে লুচি ভাজতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে নাকি—

—ওঃ এই কথা!

বুকের স্পন্দন কিছুটা স্বাভাবিক হয় যতীশ্বরের। তার জায়গায় আসে হতাশা। বলেন—তা একেবারে আজকেই! বেশী পুড়িয়েছে নাকি?

—লেখেনি স্পষ্ট করে! কিন্তু—আজ আর কাল! যেতেই যখন হবে, ও নিয়ে আর তর্ক করিনি।

—না, মানে বলছিলাম—কোণারক ঘুরে এসে পরশু রাত্রের গাড়ীতে যেতে পারতেন!

—সে হয় না!

হঠাৎ বিশেষ ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন যতীশ্বর—কেন হয় না? একটা দিনে আর এমন কি এসে যাবে? আপনি যাবেন ভেবে কাল থেকে—

—কি 'কাল থেকে'?

—না, না, সে কিছু নয়। বলছি—একটা দিনের তফাতে কি এসে যাবে?

—এসে যাবে না কিছুই হয়তো! তবুও হয় না।

—একেবারে অসম্ভব?

—একেবারে অসম্ভব। আপনার ওই আলাভোলা দাদাটির কাছে সব কিছুতে প্রশ্রয় আছে, নেই শুধু মাতৃস্নেহের ত্রুটির!

* * * *

—হয়তো জীবনে আর পুরী আসবেন না?

—আশা করি না।

—পুরীর কথা একেবারেই ভুলে যাবেন হয় তো!

—অসম্ভব কি? মানুষ কি না পারে?...বলেই একটু হেসে ওঠেন নিবেদিতা—একটু ভুল বলেছি, বলা উচিত ছিলো—'মেয়েমানুষে কি না পারে?' ...যাক আপনি কবে ফিরছেন তাই বলুন!

—কে বলতে পারে আজই কিনা!

নিবেদিতা শঙ্কিত ভাবে বলেন—সে কি?

—কেন, গেলে দোষ আছে?

নিবেদিতা শুষ্ক হাস্যে বলেন—দোষের কথা হচ্ছে না। কিন্তু যাবেন কেন? আপনার তো কোনো কারণ আসেনি।

যতীশ্বর চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে স্থির স্বরে বলেন—

—যদি বলি 'এসেছে'!

—নাঃ, আপনি যেন ক্রমশঃ রহস্যময় হয়ে উঠছেন—নিবেদিতা চঞ্চল-ভাবে উঠে দাঁড়ান, দ্রুতভঙ্গীতে বলেন—না না, সে ভারী বিশ্রী দেখতে লাগবে! আজকেই হঠাৎ যাবেন কেন?

—বারণ করছেন?

—কি মুশকিল, আমার অনুমতি নিয়েই আপনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে নাকি? আপনিও হঠাৎ আজকেই গেলে দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগবে মনে হচ্ছে, তাই বলছি।

এই পর্যন্ত বলতেই পিছন থেকে সত্যশরণের দরাজ গলার সম্বোধন শোনা যায়—ভায়া এখানে? আর আমি তোমাকে হোটেলে গিয়ে খুঁজে এলাম!

যতীশ্বর সচকিতে বলেন—খুঁজে এলেন? কেন?

—বাঃ, এই নতুন খবরটি দিতে, আবার কি! কাণ্ড শোনো নি?

যতীশ্বর কি উত্তর দিতেন কে জানে, কিন্তু যতীশ্বরকে স্তম্ভিত আর বাকস্ফূর্তি রহিত করে দিয়ে নিবেদিতা স্বচ্ছন্দে বলে ওঠেন—হয়েছে, তোমার নতুন খবরের বড়াই ঘুচে গেছে!...যতীশ্বরবাবুর অসময়ে আবির্ভাবের কারণ কি শুনবে?...উনি বলতে এসেছেন—কাল আর ওনার কোণারকে যাওয়া হলো না, আজকেই রাত্রের ট্রেনে কলকাতা রওনা দিচ্ছেন।

—সে কি!

—আর 'সে কি!' আমিও শুনে প্রথমে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম! বলি—কি রে বাবা! এ যেন আমরা নজরবন্দী আসামী, আর উনি গোয়েন্দা পুলিশ! আশ্চয্যি যোগাযোগ বটে!

সত্যশরণ গায়ের ঘামে ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে বললেন—তা বেশ হলো ভালো! কিন্তু তোমার ব্যাপারটি কি? স্ত্রী পুত্র কিছুই তো কোথাও রেখে আসো নি? কার কি হলো?

যতীশ্বর অনেক কষ্টে বলেন—কলেজ বোর্ডের একটা মিটিং আছে কাল। আজই মোটে খবর পেলাম!

নিবেদিতা ঝপঝপ করে হাতের কাজ সারতে সারতে বলেন—সাধে কি আর বলে 'ভক্তের বোঝা ভগবান ব'ন'। একা এইসব লটবহর সামলে স্টেশন পর্যন্ত পোঁছবে কি করে, সবকিছু গুছিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠবে কি করে ভেবে আকুল হচ্ছিলে, ভগবান সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন।...আপনি এক কাজ করুন যতীশ্বরবাবু, ওবেলা আপনার যা যৎকিঞ্চিৎ মালপত্র আছে নিয়ে এখানে চলে আসুন, এখান থেকে একসঙ্গেই—

সত্যশরণ সানন্দে সায় দেন—হ্যাঁ হ্যাঁ! ঠিক ঠিক! সেই বেশ হবে।... গিন্নীটি আমার কি রকম চালাক দেখছো তো ভায়া, নিজের সুবিধেটির বেলায় জ্ঞান টনটনে!

সত্যিই 'ভেবে আকুল' হচ্ছিলেন সত্যশরণ।

সেই আকুলতার দায়েই ছুটে গিয়েছিলেন যতীশ্বরের খোঁজে, স্টেশনে তুলে দিতে যাবার কথা বলতে! এ তো আরো ভালো হলো!

গিন্নীটির টনটনে জ্ঞানের পরিচয়ে উৎফুল্ল সত্যশরণ যাত্রাকালে নিজে এক অজ্ঞানের মতো প্রস্তাব করে বসেন।

বললেন—টিকিটের টাকা, মালপত্র আর নিবেদিতাকে নিয়ে যতীশ্বর আগে রওনা হয়ে যান, সত্যশরণ বাড়ীতে তালা লাগিয়ে তালার চাবিটা মালিকের কে এক আত্মীয় আছেন 'চটক্ পাহাড়ে', সেখানে পোঁছে দিয়ে সোজা যাবেন স্টেশনে!

খুবই সোজা হিসেব!

যতীশ্বর অসহায় ভাবে বলেন—সে আত্মীয়ের বাড়ী কোথায়? বুঝিয়ে দিন না, আমিই নয় চাবিটা দিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ গাড়ীতে—

—আরে না না, সে ঠিক হবে না। আমাদের ব্যবহারের জন্যে ওরা চৌকি শতরঞ্জি বালতি তোলাউনুন অনেক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিলো, তার জন্যে একটু ধন্যবাদ দিয়ে আসি। এমন আকস্মিক যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিলো না। ভেবেছিলাম—ভদ্রলোককে একদিন ডেকে এনে আপ্যায়িত করা যাবে। সে আর হলো না।…গাড়ীর জন্যে ভেবো না। হেঁটে আমি যাচ্ছি না। একখানা সাইকেল রিক্শা ধরে নিয়ে—তুমি কিন্তু এগিয়ে পড়ো এইবার। …কই গো, নাও চটপট! তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে তবে তো তালা লাগাবো!

ইশারায় স্বামীকে একটু আড়ালে ডেকে নিবেদিতা বিপন্নভাবে বলেন—আচ্ছা, তোমার সাধারণ বুদ্ধিটা এতো কম কেন বলো তো? এরকম প্রস্তাব করতে গেলে কেন?

সত্যশরণ উদ্বিগ্ন ভাবে বলেন—কি রকম প্রস্তাব?

—এই, যতীশ্বরবাবুর ঘাড়ে 'নির্জীব' 'সজীব' সবকিছু পোঁটলা পুঁটলি চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি ঝাড়া হাত পা হয়ে—

সত্যশরণ একগাল হেসে বলেন—ওঃ, এই কথা! সে তুমি কিছু ভেবো না। প্রফেসর কিছু মনে করবে না। ছেলেটা খুব ভালো!

—'ভালো' হয়ে তো ভদ্রলোকের ভারী স্থবিধে হচ্ছে দেখছি! কিন্তু— 'ইয়ে' এটা কি দেখতেই বেশ ভালো হবে?…একা আমি ওঁর সঙ্গে গটগট করে চলে যাবো—তুমি আলাদা যাবে—বেশ শোভন হবে?

সত্যশরণ হা হা করে হেসে ওঠেন—হরি বলো! এই ভাবনায় অস্থির হচ্ছো? কচি খুকি! বলুক না কেউ কিছু, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

—বলবার লোক এখানে বসে নেই কেউ।…কিন্তু…ধরো আমিই যদি ওর সঙ্গে পালাই।…

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে নিবেদিতার।…মুখের রঙ অস্বাভাবিক লাল হয়ে ওঠে।

—তা পালিও। তবে, গিয়ে কিন্তু ঠিকানাটা দিও।

কোন দিকে লক্ষ্যহীন সত্যশরণ আর একদফা হাসতে থাকেন।

* * * * *

নিবেদিতার মুখ কিন্তু বিরক্তি-কুঞ্চিত হয়েই থাকে।

যেন স্বামীর এই ছেলেমানুষী অবিবেচনায় বিব্রত বোধ করছেন। কিন্তু সেই বিরক্তির ছায়ার তলায় তলায় জ্বলতে থাকে নাকি একটা খুশির আভা!···যে আভা বিকশিত হয়ে ওঠে কিশোরী মেয়ের মুখে প্রত্যাশিত সম্ভাবনায়?

বাড়ী থেকে স্টেশনে যাবার পথের পরমায়ু কতোটুকুই বা? মোটরে বড়ো জোর মিনিট আষ্টেক!···

কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই কি সমস্ত পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে না?···

'ওলট-পালট' কেন, পৃথিবীটা তো নিশ্চিহ্নই হয়ে যেতে পারে, যদি মহাসমুদ্র উন্মাদ আলোড়নে জেগে ওঠে!

আট মিনিট সময় কি কম?

কিংবা হয়তো কমই।

সাহস সঞ্চয় করতেই যে অর্ধেক সময় কেটে যায়।

* * * * *

চলন্ত গাড়ীর উত্তাল হাওয়ার মাঝখানে মৃদু নিঃশ্বাসের মতো ক'টি কথা উচ্চারিত হয়—আমার জীবনে এমন ভয়ঙ্কর মুহূর্ত আর কখনো আসেনি!

ভয়ঙ্কর!

কারপক্ষে ভয়ঙ্কর!

নিবেদিতা যেন সচেতন হয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখেন। গাড়ীবোঝাই হয়ে আছে গৃহস্থালীর নানা সরঞ্জামে!···ওই ঘটি বাটি বাক্স বিছানাগুলোর মধ্যে থেকেই কি শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছেন নিবেদিতা?

কে জানে কি!

হাসতেই তো দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

—'ভয়ঙ্কর' না বলে শোচনীয় বলুন? কর্তাগিন্নী দু'জনে মিলে কেমন জব্দটি করা গেলো!···উঃ, তখন কিন্তু ভারী মজা লাগছিলো। আপনি

বোধ হয় আমার চালাকী দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন ?…একেবারে আপনার যাওয়া পাকা করে নিয়ে তবে আর কাজ !…বলছি আর ভাবছি—এই বুঝি ফাঁস করে দেন, এই বুঝি বলে বসেন—'কই আজই কলকাতায় ফিরছি একথা তো বলতে আসিনি আমি।'…খুব বাঁচিয়েছেন !

যতীশ্বর রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—তখন বলিনি, তখন বাঁচিয়েছি। এখন আর বাঁচাবো না, এখন বলছি—কেন আমাকে দিয়ে বলালেন ওকথা ?…বলুন কেন যাবো আমি ? নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের স্বাধীনতা হারিয়ে কেন আমার এই অসহায় আত্মসমর্পণ ? আমাকে এমন করে টেনে নিয়ে গিয়ে কি লাভ আপনার ?

নিবেদিতা জানলার বাইরে তাকিয়ে মুখ না ফিরিয়েই শুকনো গলায় বলেন—বাঃ, লাভ নেই ? এইতো দেখছেন কতো সুবিধে হলো ! ভাবলাম—যেতেনই তো দু'চার দিন পরে, না হয় একসঙ্গেই যাওয়া হোক।… বলেছিলেনও তো একবার যেন—

সহসা স্থির শান্ত ভদ্র অধ্যাপক একটা বেখাপ্পা কাজ করে বসেন।

জানলার দিকে ফেরানো নিবেদিতার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে বসেন—কেন বলেছিলাম ও কথা, কেন যে, তোমার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে টেঁকা অসম্ভব হবে মনে হয়েছিলো, এ বোঝবার ক্ষমতা কি তোমার নেই, নিবেদিতা ?

কাজটা কি বড়ো বেশী দুঃসাহসিক হলো ?

কিন্তু দুঃসাহসিক কিসে ?…

'তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে,
পলকে দেখেছি কতোবার।'

আপন হৃদয় আলোকে নিবেদিতার হৃদয় কি ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পাননি যতীশ্বর ? যে আলো নিবেদিতাই নিজের হাতে জ্বালিয়েছেন।

কেন দুঃসাহসিক ?

যতীশ্বরের নিস্তরঙ্গ কৌমার জীবনে যে জাগিয়েছে এই অজানা অনুভূতির আবেগ, কেন তাকেই সইতে হবে না সেই আবেগের ধাক্কা ?

কিন্তু ও কি, সে আবেগের ধাক্কায় কেঁপে উঠলেন কই নিবেদিতা ? হেসে উঠলেন যে ! আহত অপদস্থ যতীশ্বরকে হাসির ছুরিতে টুকরো টুকরো করে

কাটতে কাটতে বলছেন—এ আবার কি ছেলেমানুষী রোগে ধরলো আপনাকে ? মাটি করেছে !

—নিবেদিতা, দোহাই তোমার ! হেসো না এমন করে—

—আরে, আরে, কী কাণ্ড !…না হাসিয়ে ছাড়লেন কই আপনি ?…

আস্তে আস্তে যতীশ্বরের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেন নিবেদিতা।

* * * * *

ছাড়িয়ে নেওয়া ভিন্ন উপায় কি ?

না ছাড়ালে যে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়।

অসতর্ক হয়ে গৃহিণী নিবেদিতার অন্তরালবর্তিনী সত্যিকার নিবেদিতাকে প্রকাশ করে ফেললে তাঁর নিজেরই যে সব মাটি !…

গৌরব সম্ভ্রম পদমর্যাদা বিশ্বস্ততা !

কিন্তু সত্যিকার সেই নিবেদিতা কি আর কোথাও কোনোখানে বেঁচে থাকবে এরপর ? বরাবর যে, চেতনার আড়াল থেকে সংসারী নিবেদিতাকে দিয়ে এসেছে অফুরন্ত শক্তির যোগান !

* * * * *

হয়তো এর পরে নিবেদিতার রান্নাঘরে আশ্রয় নেবে ঝুলকালি তেল,… হয়তো ভাঁড়ারের শিশিবোতলে পড়বে ধুলোর আস্তরণ।…হয়তো নিবেদিতার বালিশের ওয়াড়ে তেলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে…উদাস অবসাদের অবসরে।…

যে কর্মভার এতোদিন নুড়িপাথরের মতো অনায়াসে ঠেলে এসেছেন নিবেদিতা, হয়তো সেই ভার 'পাহাড়ের ভার' হয়ে উঠবে তাঁর কাছে।

সহসা ফুরিয়ে যাবেন নিবেদিতা !

তবু কিছুই প্রকাশ করা চলবে না। অবগুণ্ঠনখানা সামলাতে হবে প্রাণপণে।

জীবনের যতো কিছু চাকচিক্য সবই তো ওই অবগুণ্ঠনের ওপরে জলের রঙ দিয়ে আঁকা।

পদাতিক

অসহ্য ! অসহ্য !

আবার শুরু হলো—সাবিত্রীর একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি।...ক্লান্ত সুর আর শানানো স্বরের অদ্ভুত একটা সংমিশ্রণ—'আর পারিনা রে বাবা ! মরণ হয় তো বাঁচি গো ! যম মুখপোড়া এতো লোককে নিচ্ছে আর আমায় নেয়না রে—'

অহরহ !

অহরহ এই অভিযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন সাবিত্রী 'মুখপোড়া যমের' বিরুদ্ধে।...অহরহ ঘোষণা করছেন নিজের অক্ষমতা।...মৃত্যুটাই যে তাঁর একান্ত কাম্য সেকথা ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে পাড়ার লোককেসুদ্ধ্‌ না জানালেই নয় যেন।

কুৎসিত লাগে জয়ন্তীর, অসহ্য লাগে।

মা'কে 'মা' বলে ডেকে কথা বলতে রুচি হয় না আর। কোনো রকমে দু'বেলা দু'টি খাওয়া আর রাত্রির আশ্রয়টুকু ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সংস্রবই মুছে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ইচ্ছে করেই মুছে দিচ্ছে জয়ন্তী, চা জলখাবারের পাটটা-সুদ্ধ্‌ বাড়ী থেকে তুলে দিয়ে।

সময়ই বা কোথায়, সময়-মাফিক চারবেলা এসে বাড়ীতে হাজরে দেবার ?

সময় করে নেবার চেষ্টাও নেই।

তবু একবার না একবার আসতে তো হবে বাড়ীতে ? ফিরতে তো হবে—সমস্ত দিনের দুঃসহ কাজের চাপে নিষ্পেষিত দেহটাকে টেনে এনে বিছানায় আছড়ে ফেলতে !

আর তখনি শুরু হবে সাবিত্রীর আক্ষেপ আর অভিযোগ।

কিম্বা শুরু নয়—সারাদিনই চলছে। জয়ন্তী বাড়ী থাকে না, তাই সারাদিন শুনতে পায় না। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, নইলে বোধ করি পাগল হয়ে যেতো জয়ন্তী।

সামান্য কয়েকটা লোকের আহারের আয়োজন করতে···তুচ্ছ এই সংসারটাকে সামলাতে এতো বিরক্তি সাবিত্রীর? এতো অক্ষমতা? তবু যদি উপার্জন করে যোগাতে হতো আহার্য!

কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম জয়ন্তীকে করতে হয়। সে কথা কোনোদিন ভেবে দেখেছে কেউ? মাতৃস্নেহের কোমল দৃষ্টিতে না হো'ক সাধারণ মনুষ্যত্বের দৃষ্টিতেও কি দেখতে পায় না সাবিত্রী? যে মেয়ে সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে নিজেকে পিষে ফেলছে, তার কানের কাছে এই নির্লজ্জ নালিশগুলো নিয়ে, ক্রুদ্ধ চীৎকারে একযোগে যমকে, আর ভগবানকে ডাকাডাকি করতে, বিবেকে বাধে না?

বলতে গেলে রক্ষে নেই, কেঁদে কেঁটে হাট বাধাবেন তা'হলে।

চুপ করে থাকাই ভালো।

চুপ করে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ দূরে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে জয়ন্তী। হঠাৎ বৃষ্টি এলে চুপ করে বসে বসে দেখতে পারে সে আজকাল,—অনায়াসেই পারে —দড়িতে মেলেদেওয়া কাপড়গুলোকে পড়ে পড়ে ভিজতে।

অনটনের সংসারের স্বল্পসংখ্যক কাপড় জামার এই শোচনীয় দুর্দশার পরিণাম চিন্তা মোটেই বিচলিত করতে পারে না জয়ন্তীকে।···কেমন যেন একটা নিষ্ঠুর আক্রোশ জয়ন্তীর মনেও জমে উঠছে আজকাল। ভগবানের বিরুদ্ধে নয়—মা'র বিরুদ্ধে।

তবু যদি—মানুষের মতো সংসার হতো। কী শ্রী সংসার করার!

ছোট ভাইবোনদের তো দুর্দশার অন্ত নেই।···গায়ে জামা জোটে না, চুলে চিরুনি পড়ে না, সময়ে খেতে পায় না, রোগে সেবা হয় না, বস্তির ছেলেমেয়ের মতো ধুলোয়, কাদায়, শ্যাওলায়, জলে, কী ভাবেই মানুষ হচ্ছে!

অফিসের বেলায় জয়ন্তী আর তার বাবা ভাত খেতে বসেন যেন চোর। অথচ সে খাওয়ার মহিমা কতো! ভাতের ওপর ডাল জুটলো তো যথেষ্ট! জ্বলন্ত আগুনের মতো আধসিদ্ধ ভাত ডাল সামনে ধরে দিয়ে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাক—'সাতসকালে' ভাত দিতে কি কি অসুবিধে, তার ফিরিস্তি আওড়াতে থাকেন সাবিত্রী, বরের আর মেয়ের কানের গোড়ায়।···একথাও বলতে ছাড়েন না, আর খানিকটা সময় পেলেই অনায়াসে দু'খানা তরকারি হয়ে যায়! শুধু এদের অনর্থক তাড়নাতেই—

যেন তরকারি দু'খানা খেতে পেলেই সকন্যা স্বর্গে যাবেন বিজনবাবু।… যেন সকাল থেকে বেলা ন'টা এমনই কম সময়!…এদিকে ওঠেন তো শেষ রাত্রে! করেন কি এতোক্ষণ! আশ্চর্য!

আর কতো পরে উঠেও জয়ন্তী দু'টো টিউশনি সেরে আসে। বিজনবাবু—টিউশনির সঙ্গে সারেন বাজার, দোকান, রেশন, কয়লা—অবশ্য-প্রয়োজনের অজস্র খুঁটিনাটি।

কই, কেউ তো দিনরাত মরণ কামনা করছে না সাবিত্রীর মতো!

আজ আর খেতেও প্রবৃত্তি হলো না যেন।

বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই দেখলে কোলের ছেলেটাকে কষে পিটোচ্ছেন সাবিত্রী, আর—নিজের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকামনা করছেন তারও। তার অপরাধটা কি তা' জানবারও উপায় নেই, কারণ ছেলেটা নিতান্তই অ-বাক শিশু।

কতোটা নৃশংস হলে মানুষ একটা দু' বছরের শিশুর পিঠের ওপর নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে তারই হিসাব কষতে কষতে উপরে উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো জয়ন্তী।

আর—একটু পরেই যখন ছোট্ট মিনু অনেক সাবধানে অনেক যত্নে চা'য়ের পেয়ালাটা এনে বসিয়ে দিলো সামনে, জয়ন্তী হুকুম দিয়ে দিলো—'বলগে যা আমি কিছু খাবো না। দূর করে দিগে যা চা!'

অন্য দিন হ'লে বিরক্তিকর একটা অনুরোধের পালা থাকতো তোলা, আজ আর কি জানি কেন বিরক্ত করলো না কেউ।

করবেই বা কে?

সাবিত্রীর কি মাথার ঠিক আছে আজ?

শুতে শুতেই তো আর সুনিদ্রা হয় না, বিছানায় পড়ে পড়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে…সাবিত্রীর চীৎকার—ছোট ভাইবোনের কান্না, তার সঙ্গে রান্নার 'ছ্যাক্ ছোঁক্'।…চীৎকার…থামতে চায় না…নালিশ জানাচ্ছেন সাবিত্রী—যমের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে, গোবেচারা স্বামীর বিরুদ্ধে, শিক্ষিতা লায়েক মেয়ের বিরুদ্ধে,…সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরুদ্ধেই।…বলছেন 'এতো পয়সা খরচ হয় সংসারে—পাঁচটা পয়সা দিয়ে একগাছা দড়ি কেউ কিনে দেয় না আমায়?…

দিক দিক একগাছা দড়ি এনে, এ হতচ্ছাড়া সংসারের হাত থেকে রেহাই পাই আমি !...তা' দেবে কেন ? নিজের হাতেও যে দড়ি পড়বে, তা' হলে।...তিলে তিলে দগ্ধাচ্ছে।...কি ? আবার এখুনি খেতে চাইছিস্ ? বেরো—বেরো—দূর হ সুমুখ থেকে, আপদ কোথাকার ! খা, আমার মাথাটাই খা এবার ! এতো যদি রাক্ষুসে খিদে, হাবাতের ঘরে মরতে এসেছিস্ কেন লক্ষীছাড়ী ?'...

অনর্গল এইরকম সভ্য আর সুন্দর ভাষার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সাবিত্রীর মুখ থেকে।...

অসহ্য ! অসহ্য !

* * *

—বাবা !

জয়ন্তী উঠে এলো এঘরে—আর তো সহ্য হয় না বাবা ! এ বাড়ীতে বাস করা মানুষের অসাধ্য হয়ে উঠেছে।

বিজনবাবু চমকে উঠে বসেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, বিস্মিত দৃষ্টিতে।...

—শুনে শুনে তোমার কানে হয়তো ঘাঁটা পড়ে গেছে বাবা, কিন্তু আমি আর পেরে উঠছিনা। এ বাড়ীর বাস আমাকে ওঠাতে হবে।

বিজনবাবু ঈষৎ কাতর স্বরে বলেন—ওর মাথাটা যেন আজকাল দিন দিন খারাপ হয়ে উঠছে। বিস্তর খাটুনিও পড়েছে। ঝিটা ছেড়ে গিয়ে অবধি—

জয়ন্তী আহত স্বরে বলে উঠে—সংসারের দু'টো ডাল ভাত সেদ্ধ করাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খাটুনি নয় বাবা, না খেটে আর কে ভাত খাচ্ছে ?...কিন্তু মেজাজ খারাপেরও একটা সীমা থাকা উচিত। সত্যি তো আর পাগল নয় ?

বিজনবাবু যেন স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের খেসারত দিতেই কুণ্ঠিত স্বরে বলেন—সত্যি—ভারী ইয়ে হয়েছে আজকাল, করিই বা কি ! বলতে গেলে তো কুরুক্ষেত্তর হয়ে যাবে।...

—ওই ভয়েই তো চুপ করে আছি বাবা, কিন্তু পেরে উঠছি কই ? একটা কিছু বিহিত করা দরকার হয়েছে—

—বিহিত আর কিসে হবে, এই অলক্ষ্মী বিদেয় না হলে ?...কি করবো—

যমে তো নিচ্ছে না! পিছন থেকে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন সাবিত্রী, কে জানে। দরজার গোড়া থেকে অন্ধকারে কথাটা যেন আছড়ে পড়ে—চব্বিশ ঘণ্টাই তো ডেকে মরছি সেই মুখপোড়া, একচোখোকে। শুনছে কই?

মায়ের এই গায়ে-পড়া কলহে গা জ্বালা করে ওঠে জয়ন্তীর, ঘৃণা বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণার একটা মিশ্রিত অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে দুই চোখের দৃষ্টিতে…তবু কথা না কয়েই চলে যাচ্ছিল সে, সাবিত্রী ডাক দিয়ে বলেন—খাওয়া হবে না কেন শুনি?

বারুদে আগুন ধরে যায় যেন—তিক্ত কটু কণ্ঠে জ্বলন্ত উত্তর দেয় জয়ন্তী—এ বাড়ীর ভাত খাবার প্রবৃত্তি আর নেই মা—

—কী? কী বললি? প্রবিত্তি হয় না? আমার হাতে খেতে প্রবিত্তি হয় না? কেন? মুখ্যু বলে?…তোমাদের মতন জুতো মোজা প'রে বেড়াতে পারি না বলে? অ্যাঁ?…

—কিছুর জন্যেই নয় মা,—কিন্তু দোহাই তোমাদের, আজকের মতো একটু শান্তি দাও আমাকে! বিদেয় আমিই হবো!

কাটা কাটা ভাষায় এই কথাটি উচ্চারণ করে নিজের ঘরে চলে আসে জয়ন্তী, আর প্রতীক্ষা করে আর একটা বিরক্তিকর ঝড়ের!…কিন্তু আশ্চর্য! হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বাড়ীটা।…নয় তো চালু মেশিনটা হঠাৎ বিকল হয়ে নিঃশব্দ হয়ে গেছে বুঝিবা!

শুয়ে শুয়ে এলোমেলো অনেক চিন্তার পর মনে পড়ে আগামীকাল ওদের ইউনিয়নের মিটিং আছে। সকলে জয়ন্তীকে চাপ দিচ্ছে কিছু বলবার জন্যে। মৌখিক না পারুক, লিখিত কিছু পাঠ করলেও চলবে।…খসড়াটা রাত্রে করে রাখা উচিত ছিল—কিন্তু এই মাথায় কি আর সম্ভব?…কাল শনিবার আছে এই সুবিধে,…বিকেল পাঁচটায় মিটিং, তার মধ্যে তৈরি করে নেওয়া যাবে।… সেক্রেটারীর বাড়ীই চলে যাবে না হয় সোজা।…নিজের বাড়ীর তো এই ছিরি। বক্তব্যের কয়েকটা পয়েন্ট বলে দিয়েছেন সেক্রেটারী সলিল সেন। মেয়েদের নেতৃত্বে কাজ বেশী হয়—এই তাঁর ধারণা…তাই জয়ন্তীকে এই অনুরোধ।…

বক্তব্যগুলো মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে!

*   *   *   *   *

অবিশ্যি কথা সেই পুরনোই,…শুধু সাজাবার কায়দাটা করতে হবে নতুন।

…সেই মালিক আর শ্রমিকের দ্বন্দ্ব।…সেই…গণ্য আর অ-গণ্যের মধ্যে পার্থক্যের বিরুদ্ধে লড়াই। প্রশ্ন করতে হবে—'স্বাধীনতার সংগ্রামে যে অগণ্য পদাতিক সৈন্যের দল লড়লো, মরলো, রসদ জোগালো, জোগালো খাদ্য, তাদের অন্ধকার ঘুচলো কই? তাদের মনে রাখবার দায়িত্ব কাদের?…ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে যাঁদের নাম লেখা থাকবে…অগ্রবর্তী সেই সেনাপতিদের ত্যাগ আর নিষ্ঠার, সংগ্রামের আর লাঞ্ছনাভোগের কাহিনী পড়তে পড়তে, কারুর কি একবারও মনে পড়বে এই হতভাগ্য অবজ্ঞাতদের কথা?…জীবনযুদ্ধে পরাজিত এই পদাতিক সৈন্যদের?'…

ভাবের বাষ্পে ভরা এই ধরনের অনেকগুলো কথা গড় গড় করে বলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক…মগজটা একটু ঠাণ্ডা করে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেই গুছিয়ে লিখে ফেলা যায়।…

কিন্তু মগজটা ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে ঘুম এসে গেল।

কী বিশ্রী পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জয়ন্তীকে বাস করতে হয় সে কথা কি সলিল সেন বোঝে?

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিল জয়ন্তী?

দু'ঘন্টা? দশঘন্টা?…এক যুগ?…নইলে হঠাৎ অমন কাতর আর্তনাদে তাকে ডাকবার দরকার কি হলো বিজনবাবুর?…

—জয়া! জয়া!…শিগ্‌গির ওঠ্। তোর মা কেমন করছে…আমি যাচ্ছি ডাক্তারবাবুর কাছে…জয়া রে!

মা কেমন করছেন!

এ আবার কোন্ ভাষা?

'কেমন করা'র অর্থ কি?

ধড়মড় করে উঠে বোকার মতো তাকায় জয়ন্তী!

গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে বিজনবাবু ভাঙা ভাঙা গলায় বলেন—আর ডাক্তার! 'হয়ে' গেল বোধ হয় এতোক্ষণে।…সাড়া শব্দ কিছুই নেই, নাড়ি-ফাড়িও পাচ্ছিনা! তুই একটু বোস মা সাহস করে! আমি দেখি একবার। আসতে চাইবে কি না ভগবানই জানেন! জল খেতে উঠতে গিয়ে কি যে হয়ে গেল! পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, না অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না—

জুতো পরতে ভুলে গিয়ে খালি পায়েই বেরিয়ে যান বিজনবাবু।

ভগবানের দয়া—ডাক্তার এলেন।

কিন্তু চিকিৎসা করবেন কার? পাথরের টুকরোকে কি চিকিৎসা করা যায়?···বিজ্ঞান আজও পরাজিত এখানে।

রক্তের চাপ যে সাবিত্রীর কতো প্রবল হয়ে উঠেছিলো—সেইটুকুই শুধু জানিয়ে দিয়ে গেলেন ডাক্তার—একটা সংখ্যার সাহায্যে।

জীর্ণ শীর্ণ রক্তহীন ফ্যাকাশে শরীরের মধ্যে রক্তের চাপ এতো প্রবল হয়ে উঠেছিল সাবিত্রীর কখন? কোন্ ফাঁকে?···টগ্‌বগে ফুটন্ত সেই রক্তের চাপে মস্তিষ্কের রক্তবাহী শিরাগুলো ফেটে যাবার আগে পর্যন্ত টের পেলোনা কেউ?···কিন্তু টের পেলেই কি প্রতিকার হতো কিছু?

অদ্ভুত রোগ!

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বসে শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করো—ব্যস!

হৈ হৈ হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি করবার অবকাশ নেই কোথাও। হয় তো বড়লোকের বাড়ী হলে নিরর্থক চেষ্টার প্রহসন চলতো কিছুক্ষণ, দরিদ্রের অতো বিলাসিতা সাজে না।

বিছানার ধারে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিছুই তাই আর করেন না বিজনবাবু।···সকাল হোক···আর একবার খবর দিতে হবে ডাক্তারকে, আর কি করা যায় তার বেশী?

কিন্তু সাবিত্রীর সমস্ত অনুভূতি নিথর হয়ে গিয়েছে বলে তো আর বাড়ীসুদ্ধ্ লোক অনুভূতিশূন্য হয়ে যায় নি!···বরং সারা রাত জাগার জন্যে চা খাবার ইচ্ছেটা অন্য দিনের চাইতে বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে বিজনবাবুর, অস্বীকার করে লাভ নেই জয়ন্তীরও।···ছোট ছেলেমেয়েগুলো উঠে শুরু করে দিয়েছে কান্না।···অভ্যস্ত নিয়মের চাইতেও বেশী।

বাড়ীর আবহাওয়াটা যে নিতান্তই অপছন্দকর লাগছে তাদের।

এক সময় চক্ষুলজ্জার মায়া কাটিয়ে বিজনবাবু মেয়েকে ডেকে বলেন—তুই তাহলে একবার উঠে উনুনটা ধরাবার চেষ্টা কর মা, কাচ্চাবাচ্চাগুলোর মুখে তো দিতে হবে কিছু! একটু চা না হলেও তো—

জয়ন্তীর যে চাকরি আছে একথা আজ আর মনে পড়ল না।

জয়ন্তী যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠলো…ওঃ এগুলো আজ তাকেই দেখতে হবে!

কিন্তু রান্নাঘরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বেচারা!

আগুন ধরাবে কোথায়? নিজের শাড়ীখানাতে নাকি?…উনুনটা তো এক-গলা ছাইভস্ম ভরে কঠিন মুখে বসে আছে।…কি হবে ওই সব ছাই আর কয়লার?…সারা ঘরে রাজ্যের এঁটো বাসন ছড়ানো…পিঁড়িগুলো পড়ে আছে যথেচ্ছ ভাবে।…মিনু আর সানুর খণ্ডযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপই বোধ হয় গড়াগড়ি খাচ্ছে দু'টো জলের গেলাস।…

গত রাত্রে আর এ সব পরিষ্কার করে উঠতে পারেন নি সাবিত্রী বোঝা যাচ্ছে।…প্রত্যেক দিন তো সমস্ত বাড়ী নিশুতি হয়ে যাবার পর তবে আরম্ভ হয় সাবিত্রীর পরবর্তী দিনের কাজ।…

বাসন মাজা আর ঘর ধোয়া, উনুন নিকানো আর কয়লা ভাঙ্গা, কুটনো কোটা আর মসলা বাটা। যথাসম্ভব নিঃশব্দে…যতো সম্ভব কম আলোয়। বাড়ীর কারোর ঘুম না ভাঙ্গে…কেরোসিনটা বেশী না খরচা হয়।

কখন যে সাবিত্রী শুতে আসেন কোনো দিন কি দেখেছে জয়ন্তী?

কিন্তু সাবিত্রীর কথা ভেবে লাভ নেই…সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে আছেন তিনি আজ,…জয়ন্তীকে জব্দ করতেই হয়তো বা।…

এখন জয়ন্তী কি করবে?

এই বাসনগুলো মাজবে? ঘরটা ধোবে জল ঢেলে ঢেলে?…উনুনের ছাইগুলো তুলে ফেলে আবার ভরবে ঘুঁটে কয়লা কাঠ?…আগুন ধরে গেলে? শুধুই চা নাকি?…ভাত ডাল? দুধ বার্লি?…সকালে? বিকেলে? রাত্তিরে?…

চায়ের আশায় হতাশ বিজনবাবু একসময় ছেলেদের খাবার আনবার ছুতোয় বাইরে বেরিয়ে চুপি চুপি এক পেয়ালা চা খেয়ে এলেন দোকান থেকে।…সাবিত্রীর অবস্থা দেখে প্রাণের ভেতরটা হু হু করলেও চায়ের কথাটা ভুলে থাকা যায় না।…আর কোনো দিনই যে, বড়ো সেই কাঁচের গ্লাসটা ভর্তি ধোঁয়া-ওঠা চা নিয়ে এসে সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে ডাকাডাকি করবে না সাবিত্রী, সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পেয়ালাটা নিঃশেষ করেও আবার মুখে তুলেছিলেন, চমক ভাঙলো পাশের ভদ্রলোকের

কথায়—আর এক কাপ নিন না?…আজকাল এই বর্ষার দিনে—ওহে এঁকে আর এক কাপ…

—না না, থাক থাক—বলে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছেন বিজনবাবু।—

কিন্তু জয়ন্তীর কি হলো?

মুড়িমুড়কির প্রভাব জঠর থেকে দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে খোকা আর চাঁদু ভাতের বায়না জুড়ে দিয়েছে…অতিষ্ঠ বিজনবাবু আবার মেয়ের কাছে কুণ্ঠিত প্রার্থনা জানান…ভাত কি হয়েছে জয়া?…হয়ে থাকে তো শুধুই দু'টো থাক এরা, এক ফোঁটা দুধ দিয়ে! আর রাখতে পারছি না।…

ভাত!…বিজনবাবু কি স্বপ্ন দেখছেন?

এই তো বাসনগুলো মেজে উঠলো জয়ন্তী, কাপড়-চোপড়গুলো ডাঁই করা পড়ে আছে, জল চলে গেছে কলের।…

মিনু দিদির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে উনুনে আগুন দিয়ে দিয়েছিল, সেটা অনেক ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করেও নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন ঈশ্বর জানেন।

এখন স্নান সেরে এসে পাখাটা হাতে করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে জয়ন্তী…এক ছিঁটে জল তোলা হয়নি, উনুন ধরলেই বা ভাত চড়াবে কি দিয়ে?

এই সময় প্রশ্ন এলো বিজনবাবুর—'ভাত হয়ে গেছে কি না।'

ভাত হয়ে যাবে? আশ্চর্য!

বাপের অবিবেচনায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় জয়ন্তীর, কিন্তু বলবেই বা কি? সাড়ে দশটা বেজে গেছে এটাও তো মিথ্যে নয়।

কলকাতা শহরে পুকুর নাই বটে, তেমনি টিউবওয়েল তো আছে? সরকারি অনুগ্রহের অসীম নমুনা! যুদ্ধায়োজনের ক্ষীণ স্মৃতি! ছোট্ট একটা বালতি নিয়ে মিনু এলো গেলো বার পনেরো।…

তবু লজ্জা নিবারণ।

কিন্তু শুধু ডাল আর ভাতসুদ্ধু থালাগুলো সবাইয়ের সামনে ধরে দিতে বেলা দু'টো বেজে গেল কোন্ ফাঁকে সেইটাই ভেবে পায়নি জয়ন্তী!…

নিজের খেয়ে উঠতেই তো বেজে যাবে তিনটে।…আবার ধুতে হবে রান্নাঘর, ঝাঁট দিতে হবে সারা বাড়ীটা, সকাল থেকে পড়ে আছে বাসি।… মাজতে হবে বাসন, কেচে তুলতে হবে দু'বেলার জড়ো করা কাপড়, জামা, কাঁথা, ন্যাকড়ার কাঁড়ি।…আবার উনুন!…সেই ভাত আর ডাল।…ফের

শুরু করতে হবে পরবর্তী দিনের কাজ। তা' নয় তো কালও চলবে এই বিশৃঙ্খলা।...তা ছাড়াও আরো কি কি কাজ আছে হয় তো জানাই নেই জয়ন্তীর।

কাল...পরশু...তরশু।...পর দিন আরও পরদিন...সাবিত্রী আর কোনোদিন এ ভার কাঁধে তুলে নেবেননা ; আর—পায়ে হেঁটে নিচের তলায় নামবেন না। ...পাথরের পুতুলের মত নিঃশব্দে পড়ে থাকতে থাকতে...এক সময় একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যাবেন। নেমে আসবেন অপরের কাঁধে চড়ে!

কে করবে এই সব ?

এক বেলার ধাক্কা সামলাতেই তো বিছানা নিতে ইচ্ছে করছে জয়ন্তীর —পালাতে ইচ্ছে করছে বনে।...তবে ?...

মেয়ের মুখ দেখে বোধ করি বিজনবাবুর নিতান্তই দয়ার সঞ্চার হয়, বিকেলের দিকে বলেন—জয়া, দেখ্, এ বেলা আর রান্নাবান্নায় কাজ নেই, দোকান থেকে পাঁউরুটি এনে যাহোক করে—আর তুই তোর মা'র কাছে এসে একটু বোস্, আমি বরং চা-টাগুলো দেখি।

—তুমি ? তুমি আর কি দেখবে ?...

জয়ন্তী ম্লান ভাবে বলে।

—দেখাই যাক। দু'জনেই তো সমান আনাড়ি!...মিনু...চল তো—কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিবি।...

বাপকে উনুনে আগুন দিতে দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্তী। ...ব্যস্ত হয়ে বারণ করবে—সে উৎসাহ নেই।...দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় উঠে মা'র বিছানার ধারে এসে বসে।

ভাবলেশশূন্য মুখে পড়ে আছে সাবিত্রী, যেন মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এ সংসারের সঙ্গে।

মা'র ওপর অভিমানেই কি এতোক্ষণে চোখে জল এলো জয়ন্তীর ?

শীর্ণ কঙ্কালসার এই দেহটা নিয়ে এই ভাবে চালিয়ে এসেছেন সাবিত্রী। দিনের পর রাত্রি...রাত্রির পর দিন!...কই কোনো দিন তো পাঁউরুটি খেয়ে রাত কাটাতে হয়নি তাদের!...টিউবওয়েল থেকে জল আনতেও হয়নি মিনুকে!...

রান্নাঘরের মেজেয় উবু হয়ে বসে পাখা নাড়তেই বা কবে দেখা গিয়েছে বিজনবাবুকে ?...

চাকরি হওয়ার পর থেকে একটা পানই কি কোনো দিন সেজেছে জয়ন্তী ?

সত্তরটা টাকার ওজন কী এতোই ভারী ? না কি টাকাগুলো এতোই চকচকে যে তার জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো জয়ন্তীর !

ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো হঠাৎ।...

পাঁচটা !...পাঁচটার সময় কি যেন একটা করবার ছিল না ? ও, মিটিং ! আজ বুঝি অফিসে যাওয়া হয়নি ?...এতোক্ষণ তো খেয়াল হয়নি।...কি যেন বলবার ছিল জয়ন্তীর ? সলিল সেনের মুখটা মনে পড়ছে না ভালো করে... কথাগুলো এক একটা ভেসে উঠছে মনে।...'পদাতিক' মানে কি ?...কারা তারা ?...শুধুই কারখানার শ্রমিকরা ?

সম্ভ্রম

—তোমাকে এসব সর্দারী করতে কে বলেছিল শুনি?

একখানা চিঠি হাতে করে এসে প্রিয়তমাকে যে স্বরে সম্ভাষণ করলো ভূপতি, বলা বাহুল্য সেটা প্রেমালাপের স্বর নয়।

কনক শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।...ভয়ে ভয়ে বললে—কেন গো কি করলাম?

—আমার চাকরির জন্যে—তোমার দাদার কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল বুঝি 'ইনিয়ে বিনিয়ে' কাঁদুনি গেয়ে?

'আমার' এবং 'তোমার' শব্দটার উপর বিশেষ জোর দেয় ভূপতি।

কনক মনে মনে চটলো কিনা জানিনা, বাইরে বেশ সহজভাবেই বলে—ওঃ এই কথা! আমি বলি না জানি কি অপরাধ করে বসলাম। 'ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গেয়ে'—ওসব আবার কি বিশ্রী কথা? এমনই কথার ছলে লিখে-ছিলাম—'অতোবড়ো একটা অফিসার মানুষ, ভালোমতো চাকরি বাকরি কি হাতে থাকে না? এক আধটা ছুঁড়ে মারলেই পারো এদিকে—।' বলায় দোষ হয়েছে নাকি?

—দোষ? পাগল! কতোবড়ো উপকার করলে আমার, কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত।...

কনক বেচারা চোখে অন্ধকার দেখে—ভয়ে এবং লজ্জাতেও।

নিশ্চয়ই দাদা সাফ্ জবাব দিয়ে দিয়েছেন, আর পড়বি তো পড় সেই চিঠি কিনা ভূপতিরই হাতে!...অথচ দাদাকেও খুব নিন্দা করা যায় না। ভূপতির চাকরি যাওয়ার পরে বেশ কয়েক বার অনুরোধ করেছে সুনীল, ওর অফিসে যেতে। ভূপতির গোঁ, 'শালার আণ্ডারে কাজ করতে পারবোনা'।...

আর কি করবে সুনীল?

তারপর থেকে এই দীর্ঘ আটটি মাস কিভাবে চলেছে সে কনকই জানে।

ঝিটাকে কনকই ছাড়িয়ে দিয়েছিল, গয়লা ছেড়ে গেছে নিজে থেকেই।

প্রথমে ভেবেছিল ধোবার পাট উঠিয়ে দিলে কিছু বাঁচবে, এখন সাবান সোডাও কেনা দুষ্কর হয়ে উঠেছে।...আস্তে আস্তে উঠে গেছে জলখাবার, উঠে গেছে চা, ভাতের উপকরণসমূহ বিলীন হ'তে হ'তে কেবল মাত্র ডালে এসে ঠেকেছে, তা'ও তাকে গৌরব করে 'ডাল' বলা হয় তাই, জল বললেও ভুল হ'তো না।

নিজেদের জন্যে না হোক—ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইলে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয় কনকের।...চেঁচিয়ে কাঁদবার জো নেই তাই, লোকলজ্জার বালাই না থাকলে বোধকরি সময় সময় ডাক ছেড়ে কাঁদতো সে।

অথচ কী নিরুপায় বন্দী জীবন!

লেখাপড়া শেখেনি যে নিজেই উপার্জনের চেষ্টা করবে, মধ্যবিত্ত সংসারের মোটা ব্যবস্থার মধ্যে কেটেছে দিন···কৈশোর থেকে যৌবন···যৌবন থাকতেও প্রৌঢ়ত্ব। শিল্পকলার হাতও এমন কিছু উঁচুদরের হবার সুযোগ পায়নি যে সে-দিক থেকে কিছু সুবিধা হবে···করবে কি?···করবার সামর্থ্য যতটুকু ছিল তা' তো প্রথম দিকেই করেছে।...এখন এই শাঁখের শাঁখা আর প্লাষ্টিকের চুড়ি দু'গাছা ধুয়ে ধুয়ে জল খেলেও তো পেট ভরবে না কারুর?

দিন আর কাটে না। এক একটি দিন এক একটি বছর। হাত দিয়ে ঠেলে দেবার জিনিস নয়—প্রত্যেকটি ঘণ্টা মিনিটকে সহ্য করতেই হচ্ছে; তবু—স্কুল ফেরত ছেলেদের 'সন্ধ্যা হতেই ভাত দেবার' প্রলোভন দেখিয়ে শুকনো মুখে বসিয়ে রাখা যদি বা সয়েছিল, মাইনে বাকী পড়ার অপরাধে তাদের স্কুল থেকে অপমানিত হয়ে ফেরত আসাটা অসহ্য হলো।

'মরিয়া' হয়েই সেদিন দাদাকে চিঠি লিখেছিল কনক।

ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেটে না হোক—বেশ একটু মোলায়েম উপরোধের ভাষাতেই।...ভূপতির সঙ্গে পরামর্শের সাহস হয়নি—কি উত্তর দেয় সুনীল কে জানে! সুরাহা হয়—সময় বুঝে বলবে ভূপতিকে।

এতো দুরবস্থার পরও কি নরম হবে না ভূপতি?

অন্ততঃ কনকের কাছে চক্ষুলজ্জার খাতিরে?···ছেলেমেয়েদের উপর কর্তব্যের দায়ে?···এদিক থেকে একরকম নিশ্চিন্তই ছিল কনক, ভাবনা সুনীলের দিক থেকে। যদি বলে—'চাকরি তো কারুর পিত্যেশে বসে থাকবার জিনিস নয় কনক, গাছ থেকে পেড়ে আনবারও নয়। এখন কোথায় পাবো? যখন বলেছিলাম—"

তাই হলো শেষ পর্যন্ত !

আর সেই চিঠি ভূপতিই খুললো !

অনেক কষ্টে স্বাভাবিক ভাবটা বজায় রাখবার চেষ্টা করে কনক, টেনে-আনা হাসি আর তৈরি-করা ভাষার সাহায্যে।···নকল রাগ দেখিয়ে বলে —আমার চিঠি তুমি পড়লে যে বড়ো ?

—আজ্ঞে না হুজুর ! চিঠির অধিকারী এই অধমই। তোমার করুণাময় দাদা যে খবর দিয়েছেন আমাকে—বামুনের গরুর মতো একটি চাকরি নাকি তাঁর হাতে আছে, খাটুনি কম মাইনে বেশী।···এখন শুধু আমি দয়া করে চেয়ারে গিয়ে বসলেই হয়।

উঃ ! ভগবান ! এখনো তবে আছো তুমি ?

মুখ রেখেছো কনকের ?

আনন্দে বোধ করি চোখে জলই অসতো কনকের, যদি ভূপতির কথার স্বরটা এতোটাই বাঁকা না হতো।···তাই চাঞ্চল্য গোপন করে হালকা করে বলে—তবে আর কি, 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়ো। কি জানি দেরী করলে আবার না চেয়ার বেদখল হয়ে যায়।

—হুঁ। শিরাবহুল শীর্ণ হাতখানা দিয়ে রুক্ষ চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে ভূপতি বলে—আর তুমিও অমনি ফুল তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে তৈরি থেকো।

—ফুল তুলসী ?···অবাক্ হয়ে তাকায় কনক।

—নয় কেন ? মনস্কামনা পূরণ হলে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার ওই তো রীতি।···দাদার দয়ায় ভাতকাপড়ের দুঃখু ঘুচবে তোমাদের, সোজা কথা ? দাদা তো এখন ভগবানের বাড়া।

কনক ঈষদুষ্ণ স্বরে বল্লে—তাতে এতো ঠাট্টাই বা কিসের ? আত্মীয় স্বজনে কেউ কি কাউকে চাকরি করে দেয় না ? না কি দিলে লোকে নেয় না ?

—নেবেনা কেন ? নিশ্চয়ই নেয়। কিন্তু মনে রেখো 'আত্মীয় স্বজন'। ···কুটুম্বু নয়। এতো কুটুম্বুর সেরা কুটুম্বু, উঃ।

কনক এবার আর রাগ চাপতে চেষ্টা করে না, তীক্ষ্ণস্বরে বলে—তোমার কাছে 'কুটুম্বু' কেন—রাস্তার লোকও হতে পারেন, কিন্তু এটাও মনে রেখো— আমার নিজের ভাই।

—তা'হলে নয় চাকরিটা তুমিই করো ?

বিষতিক্ত এই কথা কয়টি উচ্চারণ করে ফিরে যাচ্ছিল ভূপতি, ভীষণ মাথা ধরেছে তার—কথা কইতেও কষ্ট হচ্ছে।...দিনের পর দিন বরং ভাত না খেয়ে থাকতে পারে সে, পারে না চা না খেয়ে থাকতে।

অথচ পারতে হচ্ছে।

শরীরযন্ত্র শোধ নিচ্ছে সেই বঞ্চনার।

শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল—কনক পথ আগলে দাঁড়ালো। সমান তিক্ত স্বরে বললো—তুমি কি ভেবেছো যা খুশি করবার অধিকার আছে তোমার ? কি ভাবে সংসার চলছে দেখতে পাচ্ছোনা চোখে ?

ভূপতি তীব্র স্বরে উত্তর দেয়—কি করে আর পাবো ? রাজভোগ খাচ্ছি—কিংখাপের গদিতে শুচ্ছি, টের পাওয়ার উপায় কোথা ?

—রাজভোগ তো সকলেই খাচ্ছে—চীৎকার করে ওঠে কনক—ছেলেদের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছো কোনোদিন ?...আমি মেয়েমানুষ—আমার ইচ্ছে করে পথে বেরিয়ে যাহোক কিছু উপায় করে আনি, আর পুরুষ মানুষ হয়ে লজ্জা করে না তোমার মাথা ধরার ছুতো করে পাশবালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকতে ?...'শালার অধীনে চাকরি করবোনা'—মান কতো! এর পরে যে ওদেরই কাছে হাত পাততে হবে!

—তার আগে বরং পথে পথে ভিক্ষে করবো—বলে আবার একবার যাবার জন্যে পা বাড়ায় ভূপতি।

কিন্তু কনক দেবেনা যেতে।

একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে আজ।

প্রতি মুহূর্ত বিষ হয়ে উঠেছে তার।...বিষ হয়ে উঠেছে ভূপতির মুখ। হ্যাঁ নিশ্চয়ই তো! বললে খারাপ শোনায় তাই, কিন্তু মনের অগোচর তো কিছু নেই। ভূপতির মুখ দেখলেই যেন আজকাল হাড় পিত্তি জ্বলে যায় কনকের।

কেন ? কেন চারখানা হাত পা অটুট থাকতেও এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে ভূপতি ?...ভূপতির হিসেবে হয় তো নিশ্চেষ্ট নয়, কিন্তু কনক চায় আরো—চেষ্টা করুক ভূপতি।...শুধু পাশের বাড়ী থেকে কাগজ চেয়ে এনে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা নয়—কালে কস্মিনে—একটা ইনটারভিউ দিয়ে আসা নয়।...তার চাইতে অনেক জোরালো চেষ্টা।...রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে...লোকের

হাতে পায়ে ধরে…মুটেগিরি করে, রিক্‌শ গাড়ী টেনে, যেমন করে হোক ঘরে টাকা আনুক ভূপতি।

প্রথম প্রথম স্বামীর হতাশ করুণ মুখ দেখে যে সস্নেহ মমতায় বুক ভরে উঠতো, আগলে রাখতে ইচ্ছে হতো সংসারের সব ঝামেলা থেকে, সে সহানুভূতি আর নেই।

তখন ভূপতির নিজের মুখ থেকে অক্ষমতার উল্লেখ শুনে থামিয়ে দিয়েছে ভূপতিকে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।…শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে প্রবোধ দিয়েছে তাকে—পুরুষের দশা দশ রকম।…

সেই কনকই এখন যখন তখন ভূপতির অক্ষমতাকে ধিক্কার দিচ্ছে। প্রত্যেক কথায় দিচ্ছে ঠোকর।

স্নেহ সহানুভূতি, মমতা প্রেম, সব শুকিয়ে গেছে…কঠিন হয়ে গেছে হৃদয়বৃত্তি।…

শুকিয়ে গেছে—ক্ষুধার্ত নীরু নেপুর উত্তপ্ত নিশ্বাসের আঁচে, কঠিন হয়ে উঠেছে অপমানিত সনৎ সুধীরের রুক্ষ দৃষ্টির তীব্র কশাঘাতে।

চারটি ছেলে মেয়ের চার জোড়া চোখের মৌন তিরস্কারের ভাষা অহরহ বিঁধছে কনককে। মমতার চাইতেও অনেক মর্মান্তিক—লজ্জা।…ধিক্কারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, যখন ভাতের পাশে ডালের বাটিটা ছাড়া আর কিছুই দেবার থাকে না।…মাথা হেঁট হয়ে যায়—যখন রোজই 'শরীর খারাপের' ছুতো দেখিয়ে বলতে হয়,—'আজ আর খাবার করে উঠতে পারিনি বাবা'—

দৈবাৎ হাত পা কেটে গেলে যে, আইডিনেরও অভাব হয়, পেট ব্যথা করলে যোয়ান আরকের, এ কথাটা বোঝাতে হবে ছেলেদের—তেমন দুঃস্বপ্ন কবে দেখেছে কনক?

চলতি সংসারের প্রত্যেকটি মজুত মাল ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, আর আসছে না।

জামা কাপড় জুতো সবই জবাব দিচ্ছে ক্রমশঃ।…বাইরের ঠাটও বজায় থাকছে না আর।

ভূপতি বোঝে না এসব।

ছেলেরা এতোটুকু অসন্তোষ প্রকাশ করেছে টের পেলেই সে যেন জ্বলে

যায়। ওর যুক্তি আলাদা। ভূপতি বলে—'পর নয়—কুটুম্ব নয়—ঘরের ছেলে! তারাও যদি বাপের দুঃখু না বোঝে তবে আর ভূপতিরই বা দরদ কিসের? সংসারে আটকে থাকবে কোন্ কর্তব্যের দায়ে?'

কনকের সঙ্গে ভূপতির যুক্তির মিল নেই।

তাই—ভূপতির কথায় যেন সর্বাঙ্গে আগুন ধরে যায় তার।

কণ্ঠস্বরে যতোটা তিক্ততা ঢালা সম্ভব ঢেলে কনক আরো চেঁচিয়ে ওঠে—ভিক্ষে করবে? তাতেও পৌরুষ বজায় থাকবে, কেমন? যতো অপমান দাদার আপিসে কাজ করতে?…এ কী দাদার চাকরগিরি করা? পা টিপে দিতে হবে? দাদাকে তেল মাখাতে হবে?

—খুব তফাৎও নয়—

—তা'হলে চাকরি তুমি করবে না?

—না।

—কী উত্তর দেবে দাদার চিঠির?

—উত্তর দেবো না। খুশি হয় তুমি দিও। আমি তো খোসামোদ করতে যাইনি।

ঘৃণা আর রাগের সংমিশ্রণে কী ভয়ঙ্কর কুৎসিত হয়ে ওঠে কনকের মুখ!

—জানি জানি, দাদা বড় চাকরি করে, গাড়ী চড়ে বেড়ায়, সেই হিংসেয় মরে যাও তুমি।…কিন্তু তুমিও জেনো—আর তোমার এক্তারে থাকবো না আমি। হয়—দাদার কাছে চলে যাবো, নয় লোকের বাড়ী ঝি-গিরি করবো, দেখি কিসে তোমার অহঙ্কার বজায় থাকে।

পরস্পরে যেন হিংস্র জানোয়ার হয়ে উঠেছে।…

একে অপরকে ছিন্ন ভিন্ন করতে পেলে ছাড়বে না।…তা নয়তো অতো রুক্ষ দৃষ্টি কেন ভূপতির চোখে? ভাষায় এতো কর্কশতা?

—রোজগারের তো আরো পথ আছে, ঝি-গিরিই বা করতে যাবে কেন?

—কী বললে? কী বললে তুমি?

—নাঃ বলিনি কিছু, তবে—বৌদির খোসামোদ করে দাদার সংসারে পড়ে থাকতে পারলেও মন্দ নয়।…ওদের ফেলা ছড়ার সংসারে পাত কুড়িয়েও পেটটা ভরে যাবে।

—বেশ বেশ, তাইই করবো—যদি না করিতো আমি—

কঠিন আর কটু শপথটা নিতান্তই অনভ্যাসের বশে মুখে আটকে যায় কনকের। কণ্ঠস্বরটাই রুদ্ধ হয়ে আসে।

* * * * *

সেই সকাল বেলাই বেরিয়ে গেল ভূপতি, সারাদিনে আর দেখা নেই।

আক্রোশে ফুলছে কনক।

আর ভয়ঙ্কর সেই সময়ে নীরু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলো—মা বড়ো মামা আসছেন।

—দাদা!

সমস্ত পৃথিবীটা হঠাৎ যেন ধোঁয়া হয়ে গেল কনকের চোখে।...কী জবাব দেবে সে? কী কৈফিয়ত?...গায়ের জোরে তো পাঠাতে পারবে না ভূপতিকে?...নিজেও সত্যি নেবে না চাকরিটা।...তবে? কি বলবে?

ভূপতির অসুখের ছুতো দেখাবে? বলবে কি—'তোমাকে লেখাই আমার ভুল হয়েছিল দাদা, ওঁর শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে আজকাল, খাটতে পারবেন না?' বিশ্বাস করবে সুনীল? যে মানুষ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তাকে অসুস্থ ব'লে বিলাসিতা করবার সময় কি এখন? চারিদিকের শ্রীহীন দৈন্যদশা চোখে পড়বে না তার?

দাদা এলে—এক পেয়ালা চা খাওয়াবার ক্ষমতাও আর নেই কনকের, এ কি বোঝে না সুনীল?...তা' নয়তো—যখনই আসে আজকাল, আগে থেকেই কেন অর্ডার দেয়—'তুই যেন খাবার দাবারের হাঙ্গামা করতে যাসনি কনক, পেটটা মোটেই সুবিধের নেই।'...তবে? এখনো সেই পচা অহঙ্কার বজায় আছে ভূপতির, এইটাই কি বুঝে নেবে না সুনীল?

কি বলবে ভূপতিকে? কোন্ ভাষায় ধিক্কার দেবে?

মুঠো করে ধুলো দেবে না ভূপতির গায়ে?

* * * * *

—কইরে কনক, কি খবর?

দাদার স্নেহস্নিগ্ধ গম্ভীর সম্ভাষণটা বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ীর ঘা মারলো।

—দাদা ?

আঁচলের ছেঁড়াটা গুছিয়ে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো কনক—দাদা এসেছো ?…এবারে কিন্তু অনেক দিন পরে এলে দাদা !

—সময় পাই না রে ! এতো কাজের চাপ পড়েছে আজকাল।

ভদ্রতার আবরণে না আসার কারণটা দর্শালেও—মূল তথ্যটা ঠিক তা' নয়। ভূপতির ওপর চটে গিয়েই ইদানীং আর বেশী আসে না সুনীল।

—কেন ? হঠাৎ এতো কাজ বাড়লো কেন দাদা ?

ভাসা ভাসা এই প্রশ্নটা নিজের কানেই বোকার মত শোনাচ্ছে।

—ওই এক ব্যাটা সাহেব বম্বে গিয়ে বসে আছে—সে যাক্, আমার চিঠিটা ভূপতি পেয়েছে তো ?

—তোমার চিঠি ?

আকাশ থেকে পড়লো কনক—চিঠি দিয়েছিলে বুঝি ? কাকে ? ওঁকে ?

হ্যাঁরে—সুনীল আক্ষেপের সুরে বলে—পায়নি তো ?…ঠিক সন্দেহ করেছি আমি। দেখছিস্ তো—কি বিশ্রী ব্যবস্থাই হয়েছে আজকাল ডাকের।… দমদম থেকে কলকাতা—এই ক' মাইল রাস্তা, চিঠি আসতে পাঁচ দিন লাগবে ? ছি ছি।…পরশু সন্ধেবেলা পোস্ট করেছি চিঠিটা। মন জানতে পারে—হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো—চিঠিটা পেলো তো ?…নাঃ নিজেই ঘুরে আসি একবার। তারপর বাবুটি কই ? সুমতি হয়েছে তাঁর ?

হ্যাঁ দাদা, তাই বলবো বলেই ভাবছি—অনেক চেষ্টায় ভালো একটা কাজ জোগাড় হয়েছে। কোন ব্যাঙ্কে বুঝি—

—যোগাড় হয়ে গেছে !

সুনীল আকাশ থেকে পড়ে—কাজ পেয়ে গেছে ভূপতি ?

হ্যাঁ গো দাদা, রাজ্যের লোককে তো বলে রেখেছিলেন—আমি সেদিন চিঠি দিলাম তোমায়। সে দিন তো ঠিক হয়নি—ঠিক পরদিনই এসে বললেন কাজ পেয়েছেন।

সুনীল হতাশ ভাবে বলে—এতো দিন বসে থাকলো—আর ঠিক এই দণ্ডে পেয়ে গেল চাকরি ? অথচ আমি কতো তদারক, কতো চেষ্টা করে একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করলাম।

এবারে আকাশ থেকে পড়বার পালা কনকের! কি? তুমিও ঠিক করে ফেলেছো? এতো সহজে হয়ে গেল?...সত্যি সত্যি? দেখেছো তো—আমি কাল হাসতে হাসতে বলছিলাম—'কপালের গেরো কাটলো—এবারে হয়তো দাদাও একটা চাকরি জোগাড় করে খবর দেবেন'—। বললেন—'হ্যাঁ। চাকরি অমনি গাছের ফল! মাত্র সাত দিন আগে চিঠি দিয়েছে, আর হয়ে গেছে চাকরি!'...সত্যিই তাই হলো? আচ্ছা এতোই যদি সহজ—তা' হলে আর অতো দিন বাড়ী বসে কুঁড়ে হয়ে যাওয়া কেন বলোতো দাদা?

অবাক্ আর সরল মুখে তাকিয়ে থাকে কনক, বালিকার দৃষ্টিতে।

জগতের অনেক কিছুই যেন বোঝে না সে।

যেন—পুরুষ মানুষ বেকার বসে থাকলে যা ক্ষতি হয়, সে শুধু কুড়ে হয়ে যাওয়া!

সুনীল মিনিট খানেক চুপ হয়ে থেকে প্রশ্ন করলো—কোন্ ব্যাঙ্কে বললি?

—তা তো জানি না দাদা! বললেন তো ব্যাঙ্কে। ওঁর কোন বন্ধুর কাকা বুঝি সেখানের কেশিয়ার, মাইনে ভালোই দেবে বলেছে—তোমারটা তাহলে কি হবে দাদা?

—একটু অপ্রস্তুতে পড়তে হবে আর কি! অনেক চেষ্টা করেছিলাম—কি জানি কি রকম কাজ পেলো! এটা সত্যিই ভালো ছিল। উন্নতিরও আশা আছে—

—সত্যি দাদা তোমারই তো দেখছি মুশকিল হলো? তা' আর কাউকে দিয়ে দিতে পারবে কি বলো? এদিকে আবার বন্ধুর কাকা!...ও কি, এখুনি উঠছো যে বড়ো?...তা হবে না—আজ একটু মিষ্টিমুখ না করে যেতে পাবে না। যতোই হোক—সুখবর দিলাম।...ওরে সনৎ, শোন তো বাবা—

ঘরের ভিতর গিয়ে চাপা উত্তেজিত স্বরে ছেলের কাছে আবেদন করে কনক—

—সনৎ, যা বাবা—ছুটে যা একবার, তোর মামার জন্যে চারটে মিষ্টি নিয়ে আয়—ছুটে যা! পয়সাটা পরে দিয়ে দেবো—বলিস। বলিস তাড়াতাড়ি চলে এসেছি—

—কি? ধারে আনতে হবে? আমাকে কাটলেও না—বলে জানলার

দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে সনৎ।…মামা পাছে পড়াশোনার বিষয়ে প্রশ্ন করে বসেন, এই ভয়ে সামনেই বেরোয়নি সে এতক্ষণ।

—তাতে কি হয়েছে বাপু—দুর্বল আর ফ্যাকাশে লাগে কনকের গলার স্বর।…তোদের সব বাড়াবাড়ি। পাড়ার দোকান থেকে হঠাৎ এমন ধারে কিছু আনে না লোকে?

—আনে, যাদের শোধবার ক্ষমতা আছে।

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয় সনৎ।

—দোকানের ধার কি আমি ফেলে রাখতাম? আচ্ছা দেখি যদি কিছু—মানী লোকের ছেলে তোমরা—

পিছনের দরজা দিয়ে ঘুরে ভাঁড়ার ঘরে এসে ঢোকে কনক।…

আছে…এখনো আছে একটি টাকা।…পৌষ-সংক্রান্তির দিন 'বাউনি' বেঁধেছিল একটি টাকা দিয়ে।…শূন্যোদর চালের জালার মধ্যে আজও পড়ে আছে—খড় বাঁধা আর সিঁদুর মাখা সেই টাকাটা।…অভাব-রাক্ষসীর লোলুপ হাত আজও এসে হানা দেয়নি সেখানে। দিতে সাহস করেনি।

* * * * *

কনকের হাত পৌঁছবে? সাবেক কালের প্রকাণ্ড সেই জালাটার ভিতরে?

কিন্তু না পৌঁছলে উপায় কি?

বাইরের দালানে দাদা বসে। বরের চাকরি হয়েছে বলে কনক তাঁকে সন্দেশ খাওয়াবার আশ্বাস দিয়ে এসেছে।…

* * * * *

টাকার সিঁদুরটুকু মুছতে মুছতে ক্ষয়ে ফুটো হয়ে যায় জীর্ণ আঁচলটা।…তবু সন্দেহ হয়, লুপ্ত হয়েছে তো নিরুপায়তার চরম চিহ্ন, সেই সিঁদুরের দাগটা? দোকানী আর বুঝতে পারবে না নিশ্চয়ই?

সনৎ? সনৎও যেন না বোঝে।

লক্ষ্মীর টাকায় সন্দেশ এনে মামাকে খাওয়ানোর স্বপক্ষে অবশ্যই কোনো যুক্তি নেই তার মনে।

কিন্তু যুক্তি কি কনকের মনেই আছে?

আগুনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ কিসের যুক্তিতে? তখন কি প্রশ্ন আসে সাঁতার জানা না-জানার?…ভয় থাকে ডুবে যাবার?

পাতাল প্রবেশ

মেজ জ্যেঠির পিছনদিকে দালানের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঘলা দিনেও ঘামতে থাকে আরতি, 'মেজ-জ্যেঠি' শব্দটাকে কিছুতেই উচ্চারণ করে উঠতে পারে না।

অথচ মেজগিন্নী যেভাবে নিবিষ্টচিত্তে হেঁটমুণ্ডে শাকের কাঁড়ি নিয়ে বাছতে বসেছেন, সহসা যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনপানে তাকাবেন এ ভরসাও কম।

কী বিরক্তিকর কাজেই মা পাঠান আরতিকে।

কিছুতে নিজে আসবেন না! 'যা শত্রু পরে পরে'।

আরতির যে এই একই কারণে বারবার এখানে এসে দাঁড়াতে, 'মেজজ্যেঠি' বলে ডাকতে, মাথাটা কাটা যায় সে খেয়াল নেই।

ভারী নিষ্ঠুর মা আরতির।

মায়ের নিষ্ঠুরতায় ক্ষুব্ধ আরতির রাগটা আরো বেড়ে গিয়ে পড়ে বাপের ওপর। কী দরকার তাঁর মাঝে মাঝে বাড়ীতে এসে উদয় হবার? বারোমাস যেখানে থাকেন, জন্মের শোধ থাকুনগে না সেখানে। না এলে সাত জন্মেও বাপের জন্য মন-কেমন করবেনা আরতির। বাপ তো না, খাবার কুটুম!

আরতিদের যে কী ভাবে দিন চলে কোনোকালেও তার খোঁজ নেবেন না, থেকে থেকে আসবেন খালি রাজভোগ খেতে। আর মাও তেমনি, জ্ঞাতিগুষ্ঠি পাড়াপড়শীর কাছে ভিক্ষে করে জোগাবেন সেই ভোগটি।

আরতির হাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকলে দেখা যেতো—বিনা নোটিশে যখন তখন 'হুম' করে নিরভিভাবক দুটো স্ত্রীলোকের সংসারে এসে পড়ে রাত্রে 'গরম লুচি' আর ভাতের পাতে 'সরের ঘি' খাবার বায়না করার ফলটা কি! কিন্তু তাতো হবেনা। আরতির মা যে আদর্শ হিন্দু ললনা, পতিব্রতা সতী।

মায়ের ওপর, বাপের ওপর, মেজজ্যেঠির ওপর, বোধ করি সমস্ত জগৎ সংসারের ওপরেই তিক্ত বিরক্তি ধরে যায়—ষোলটি বসন্তে গড়া এই নবযৌবনা মেয়েটির।

কিন্তু তাইবা বলি কি করে? 'বসন্ত' আবার কোথায়? বসন্ত অতো সস্তা নয়।

যে মেয়ের সকাল থেকে দুপুর বেলায় ভাত খাওয়ার আগে পর্যন্ত শুধু 'খাবার জল' ছাড়া আর কোনো 'জলখাবার' জোটে না, ভাতের উপকরণ বলতে পড়শীর বাগানের কচু কুমড়োই যার একমাত্র ভরসা, আবার পরম পদার্থের মতো সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা সেই কুমড়ো কচুর একাংশ দিয়েই যাকে রাত্রের আহার সমাধা করতে হয় দু'খানা আটার রুটির সাহায্যে, তার কাছে আবার 'বসন্ত' উঁকি দেবে কোন লজ্জায়?

দুটোমাত্র শাড়ী-জামা দু'বেলা ব্যবহার করেও দু'বছর চালিয়ে দেবার রহস্যময় কৌশল যাকে আয়ত্ত করতে হয়, তার বয়েসটা কি ষোলোর মাধুর্য নিয়ে দেখা দিতে পায় কোনদিন? ছে'চল্লিশ বছর বয়েসটা যেন জীবনের সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে জেঁকে এসে বসে ষোলোর ঘাড়ের ওপর। ঠোঁটের কোণায়, চোখের তারায় থাকে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

ষোলো বছর বয়েস যদি সত্যিই এসে থাকে আরতির, সেটা তা'র মায়ের ভাবনা বাড়াতে নয়, বিরক্তি বাড়াতে। 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে' এমন অসম্ভব কথা মনের কোণেও ঠাঁই পায়না আরতির মার। তিনি শুধু এই ভেবে বিরক্ত হন যে, যে-মেয়ে কিছুদিন আগেও অপ্রতিবাদে মায়ের হুকুম তামিল করেছে, সে যদি এখন আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, 'পারবো না' বলে চুপ করে বসে থাকে, তা'হলে ভবিষ্যতে কি হবে তাঁর?

এই আজই তো পড়শীর বাড়ী ধার চাইতে যেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক মেয়েকে হুকুমের বদলে মিনতিই করতে হলো। অবিশ্যি তাতেই জিত হয়ে গেছে তাঁর। আদেশের চাইতে মিনতি বড়ো। সে অলজ্ঘ্য।

তাই না আরতি পূর্বেকার অপমান ভুলে আবার এসে দাঁড়িয়েছে জ্ঞাতি

জ্যেঠির কাছে ধার চাইতে—যে-ধার কোনদিনই শোধ করতে পারব না নিশ্চিত জানা। বহুবারই যে-রকম ধার 'অশোধ্য' হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ ঘেমে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে আরতি একবার নকল কাশি কেশে জ্যেঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, ফল হয় না।

কে জানে মেজগিন্নীর এই অন্যমনস্কতাটা 'ভান' নাকি! বিরক্তির একটা বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে দেখেও দেখতে না-পাওয়া। নইলে রাঙা নটেশাকের মধ্যে এমনকি দ্রষ্টব্য থাকতে পারে যে দৃষ্টিটা আর তার থেকে নড়তে চায় না মেজগিন্নীর?

—মেজ জ্যেঠিমা!

অস্ফুট এই উচ্চারণটুকুর কার্যকারিতাও বোঝা যায় না। কে জানে হতাশ হয়ে ফিরে যেতো কিনা আরতি, হঠাৎ একটা আকস্মিক ঘটনায় বাধ্য হয়ে মুখ ফেরাতে হলো মেজগিন্নীকে। আর দরজায় জায়গা দিতে দালানের মধ্যে ঢুকে পড়তে হলো আরতিকে।

দরজা খালি পেয়ে হুড়মুড় করে যে ব্যক্তিটি দালানে ঢুকে পড়লো তার এক হাতে একটা মাছধরা ছিপ, আর অপর হাতে সেই ছিপে ধরা দুটো মৃগেল মাছ। সের তিনেক করে হবে।

—পিসিমা, দেখো সক্কাল বেলাই কি রকম শিকার! সাতদিনে তোমার পুকুরের সব মাছ শেষ করে দিয়ে যাবো। 'পিসিমা' একবার আড়চক্ষে নিজের দেবর-কন্যাকে দেখে নিয়ে ভাইপোকে উদ্দেশ করে বলেন—তোর পিসে মশাইয়ের কি একটা মোটে পুকুর নাকিরে রণু? দুটো চারামাছ তুলে তো ভারী বাহাদুরি দেখাচ্ছিস!

—'চারা' থেকেই মহীরুহ।...কি আরতি যে? কি খবর? ভালো আছো তো? খুব যে বড়ো হয়ে গেছো! বলাবাহুল্য আরতি একটু জড়সড় হয় মাত্র, উত্তর দেয় না। মেজগিন্নী বিরক্তভাবে বলেন—তুই এখন বাড়ী যা আরতি, আমি ব্যস্ত আছি। রণু এসেছে—

আরতি কিছু বলবার আগেই রণু হৈ হৈ করে ওঠে—আরে কি মুশকিল! আমার নামে বদনাম কেন বাপু! আমি আবার তোমাকে কি ব্যস্ত করছি?...না না, আরতি তুমিই বরং যতো ইচ্ছে ব্যস্ত করো তোমার

জ্যেঠিমাকে, তোমার হলো গিয়ে পাকা চাকরি।...তারপর তোমার মা ভালো আছেন তো?

আরতি মনে মনে জ্যেঠির অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি অনুমান করে কোনোমতে একবার ঘাড় নাড়ে। রণু অথবা রণজিত হাতের মাছটাকে দোলাতে দোলাতে বলে—এদের কোথায় রাখবে পিসিমা?

—ছোট বৌ আছে রান্নাঘরে, দিগে যা তা'র কাছে। যাচ্ছি আমি।

রণু চলে যেতেই মেজগিন্নী চোখের অগ্নিজ্বালা কণ্ঠে আমদানী করে আরতিকে প্রায় মরমে মেরে বলেন—কী! তোর বাপ এসেছে বুঝি?

আরতি অবশ্য নীরব।

—টাকা হবে না! বল গে যা তোর মাকে।

তথাপি স্থাণুর মতোই দাঁড়িয়ে থাকে আরতি। মা বলে দিয়েছে 'টাকা যদি না দেয়, একটু সরের ঘি আর গোটাকতক নৈনিতাল আলু চেয়ে আনবি। ওতো আর কিনতে হয় না মেজদির'।

বস্তিবাটিতে মেজগিন্নীর বাপের বাড়ী, বাপ আলুর ব্যবসাদার, প্রায়ই মেয়েকে পাঠান বস্তাবন্দী আলু।...কিন্তু সে আলু যে মেজগিন্নীর অথন্থে অবধ্যে জ্ঞাতি দ্যাওরের ভোগে লাগবে, এমন কথা তো ছিলোনা। 'সরের ঘি'টা অবশ্য মেজগিন্নীর নিজের কৃতিত্ব।

—ফের দাঁড়িয়ে রইলি যে? বললাম না, টাকা হবেনা?

আরতি প্রায় মরিয়া হ'য়ে বলে ওঠে—টাকা নয়, মা বললে—একটু সরের ঘি আর আলু—

'দূত—অবধ্য' এ নীতি গ্রাহ্য করেন না মেজগিন্নী।

রূঢ় দৃষ্টিতে একবার মেয়েটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কটুকণ্ঠে বলেন—তোর মাকে পতিভক্তিটা একটু কমাতে বলগে যা আরতি। পরের ঘাড় দিয়ে বারোমাস চলে না। আমার ঘরে সবাইয়ের পাতে সরের ঘি কুলোতে পারিনে, নিত্যি যাবো দাতব্য করতে। বল গে যা 'নেই। ভাত খেতে ভাত জোটে না—ঘি খাবার বায়না।'

আরতি যে চলে যাবে সে অবস্থাও যেন থাকেনা তার, লজ্জায় ঘৃণায় চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে, চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসে। কী অপমান! কী অপমান! ...যতোদিন বয়েস কম ছিলো, লজ্জা হতো, দুঃখে চোখে জল আসতো, এমন

দাহ হতোনা। সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে উঠতোনা একটা দুঃসহ জ্বালায়।

আর ঠিক এই সময় চটিজুতোর শব্দ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন মেজকর্তা।

—কী? হচ্ছে কি এখানে? ওদিকে মাছফাচগুলো কোটা হয়ে যাচ্ছে। আমি চারটি টাটকা মৌরলা আনলাম, শশী তো সকালেই এনে ফেলেছে সেরটাক 'পোনা', আবার রণু—

কর্তার কথায় বাধা দিয়ে গিন্নী বলেন—তা যাকনা আমার সংসার ভেসে, তোমার জ্ঞাতিগুষ্টির মন রাখাটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

—হলো কি?

—নাঃ হয়নি কিছু। ছোটকর্তা অনুগ্রহ করে বাড়ী এসেছেন, কাজেই ছোট গিন্নীর অর্ডার এসেছে আলু আর গব্য ঘৃতের। দুটো টাকা হ'লে কোননা আরো ভালো।

—টাকা হবে না! টাকা কোথায়! আলুফালু থাকে তো—দিয়ে দাওগে গোটাকতক। ভায়ার আমার রোজগারের মুরোদ নেই, কিন্তু মুখটি আছে নবাবী।...বারোমাস ছোঁড়া থাকে যে কোথায়—

শেষ কথাটা চটিজুতোর শব্দে বিলীন হয়ে যায়।

মেজগিন্নী বিরক্তচিত্তে ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হ'ন। বোধকরি ভাবতে ভাবতে যান, ছোট পাথরবাটিগুলো তেমন ছোট আর কই! চামচে দুই ঘি দেওয়া যায় এমন বাটি থাকলে ভালো হতো। বড়ো বাটিতে যৎকিঞ্চিৎ জিনিস বড্ডো যেন বিশ্রী দেখতে লাগে। প্রার্থীর চাইতে দাতার নির্লজ্জতাটাই প্রকট হয়ে ওঠে তাতে।

অন্যদিন হলে হয়তো আরতি দাঁড়িয়েই থাকতো, চলে যাবার সাহস হতোনা। কারণ জানে মেজজ্যেঠি দেবেনই। না নিয়ে যাওয়ার দুঃসহ স্পর্ধা তাঁকে যা অপদস্থ করবে তার কাছে আরতির অপমান? কিছুই না। আরতি কে? আরতি আবার একটা মানুষ নাকি?

আজ কিন্তু হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায় সে। 'গোটাকতক' আলুর আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কিছুতেই। কে জানে, হয়তো রণুর উপস্থিতিটা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

এর আগে যখন এসেছিলো রণু, তখন আরতি বছর বারোর। নিতান্ত ছেলেমানুষ-বোধে প্রায় ত্রিশোত্তীর্ণ রণজিৎ তাকে পিঠ চাপড়েছে, মাছ ধরার খিদমদগারী করিয়েছে, প্রশংসা করেছে! মাত্র এই।

তবু সেই স্মৃতিটুকুই আরতির কাছে মূল্যবান।

ডেকে কথাই বা কে কয় তাকে?

হয়তো লোকে ভাবে কথা কইলেই পাছে কিছু চেয়ে বসে।

আরতির মা সকলের কাছে সব কিছু চেয়ে চেয়ে নিজেদের মানমর্যাদা বলে তো রাখেনি কিছু।

বাড়ী ঢুকেই ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ে আরতি, ছেঁড়া শতরঞ্জিপাতা চৌকিটার ওপর।

এ দৃশ্য মায়ের চোখে পড়তে দেরী হয় না, কারণ মেয়ের প্রত্যাশায় 'হাঁ' করে ছিলেন তিনি। এসে বলেন—কি হলো? দিলেন না বুঝি?

আরতি উঠে বসে।

পাশের ঘরে বাপের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে—না না! রোজ রোজ কেন দেবে লোকে তোমাদের? লজ্জা করে না তোমাদের বারোমাস ভিক্ষে করতে? রোজগার করবার যার ক্ষমতা নেই, তার আবার ঘি আলু ভাতে খাবার শখ কিসের? বলে দাওগে বাবাকে যখন তখন এসে আর আমাদের মাথা কিনতে হবে না তাঁকে—

—ওরে সর্বনাশী, চুপ কর—ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মা,—শুনতে পাবেন যে!

—পান না, ভালোই তো। অতো 'চুপ চুপ' কিসের? কি এমন ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করছেন আমাদের? মামার দেওয়া ওই ক'টা টাকার ভরসায় ফেলে রেখেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কোনোদিন আমরা কি খাই পরি? কুটুমের মতন এসেই বাড়া ভাতটি পাবেন এতো আশা কেন? অমন লোকের গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত।

থর থর করে কেঁপে আবার শুয়ে পড়ে আরতি।

কাঁপেন আরতির মাও।

রুষ্টস্বরে বলেন—কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণবাক্যি মুখে আনিস? পয়সা আনতে পারে না বলে সে বাপ বাপই নয় কেমন?

সময় অসময়ে আপনার লোকের কাছে হাত কে না পাতে? তাতেই তোমার মাথা কাটা যায়?

—হ্যাঁ যায়!...আরতি ক্ষণপূর্বের অসতর্ক উক্তির লজ্জা ভুলে আবার চেঁচিয়ে ওঠে—আমি আর ওঁর জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে যেতে পারবো না, পারবো না। হলো? তোমাকেও ধন্যবাদ মা, এখনো তুমি বাবার মুখ দেখো।

আরতির মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে মিনিট খানেক নীরব হয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—বেশ! ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েছি, সেই ক'টা সামনে ঢেলে দিয়ে বলিগে, এই পিণ্ডি গেলো, গিলে নিয়ে দড়ি একগাছাও যদি না জোটে কোঁচার খুঁট গলায় জড়িয়ে আড়ায় বেঁধে ঝোলো গে! তোমার মেয়ের নিচু মাথাটা উঁচু হোক।...কতো দুঃখেই যে বাড়ীতে মুখ দেখায় না মানুষটা, সে আর কে বুঝবে! বেশ মরুক, মরুক। মরাই ভালো ওঁর।

কিন্তু কই, এহেন বাক্যবাণেও আজ আর আরতিকে অপ্রতিভ করা যায় কই? মায়ের গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকে সে। নাঃ, কারুর ওপর কেনো মমতাই আর নেই তার! সব স্বার্থপর। মা তার কেউ নয় —

এর পরই পাশের ঘরে মায়ের গলা শুনতে পায়। তর্জন-গর্জন, খেদ, ধিক্কার, নানা সুরের খেলা। বোঝা যায় না উপলক্ষটা কে! মেয়ে, না তার বাপ!

এর পরই একটা ক্রুদ্ধ অথচ ব্যাকুল আবেদনের বাণী—'যেওনা বলছি—মুখের ভাত ফেলে! মাথা খাও আমার! তবু যাচ্ছো? বেশ যাও। একটা মানুষ ডোববার মতো জল এখনো দীঘিতে আছে। মুখের ভাত ফেলে চলে গেলে কি করি দেখো।

—'মরবে এই তো?' আরতির বাপের গলা ক্ষুব্ধরুষ্ট, শ্লেষাত্মক—'মরেই তো আছো। যার স্বামী এমন হাবাতে হতচ্ছাড়া, মেয়ে অতোবড়ো বিদুষী, তার আবার মরতে বাকী কি? আমার এই শেষ। আর আসবো না। মনে কোরো তুমি বিধবা হয়েছো। কে ওখানে?'

আজ্ঞে আমি, ছোটকাকাবাবু!...মাথায় আধঘোমটা টেনে এগিয়ে আসে

মেজগিন্নীর ঝি শশী। একটা চুপড়িতে গোটাকতক বড়ো বড়ো আলু, ছোট্ট একটা পাথরবাটিতে একটু ঘি, আর পাতায় মোড়া খানচারেক কোটা মাছের টুকরো দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে মধুবর্ষী কণ্ঠে বলে—'মা পাঠিয়ে দিলেন। দিদিমণি তখন গেছলেন—মায়ের হাতজোড়া ছিলো, একটুক্ষণ দেরী হয়েছেলো, তা দিদিমণির তো দেরী সইলনি। চলে এলেন 'ঠর ঠর' করে! মা বলে দিলেন যদি সময় হয় দিদিমণিকে একবার একটা বাটি হাতে করে যেতে, মাছের তেলকাঁটা দিয়ে ছ্যাচড়া রান্না হচ্ছে দেবেন। রাঁধা জিনিস তো আমাকে দিয়ে পাঠানো চলবেনি?

ছোটকর্তার বোধকরি নিজের কলকাতার বস্তিজীবন স্মরণে আসে।

কার হাতে যে খেতে হয়! সে তুলনায় শশী তো ভাটপাড়ার ভট্চায।

উদ্গতহাস্য গোপন করে বলেন—আচ্ছা আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি না হয়। মেয়েটার আবার রোদ থেকে এসে মাথা ঘুরছে নাকি, শুয়ে পড়েছে।...

ইয়ে—কইগো—একটা বাটি দাও না।

'মাছের তেলকাঁটা চচ্চড়ির' অপ্রত্যাশিত আনন্দে পূর্ব অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কথা বোধকরি আর মনেও থাকে না তাঁর। কাজেই তার সঙ্গে বর্তমান দৃশ্যের সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

ছোটগিন্নীও ততক্ষণে মেজদির বদান্যতার পরিচয়ে দ্রবীভূত। বোঝেন তাঁর নিজেরই যাওয়া দরকার। কিছুটা তোয়াজ করে আসা প্রয়োজন। বোঝাই যাচ্ছে একটু এদিক ওদিক কথায় মেয়ে তেজ দেখিয়ে চলে এসেছেন। আরে বাপু, ওদের কাছে আমাদের তেজ করলে চলে? তা ছাড়া মেজদি মানুষটিতো মন্দ নয়, কথাগুলোই যা একটু চড়া। তা' ভগবান যাদের মেরেছেন তাদের নরম হতে হবে বৈকি!

মেজদির বদলে তাঁর ঝিয়ের কাছেই মাখনের মতো নরম হয়ে পড়েন ছোটগিন্নী। তুমি যাও শশী, আমি যাচ্ছি বাটি নিয়ে।

শশী মুচকে হেসে চলে যায়।

জানে তো এদের ধাত। 'মেধো ভাত খাবি'? 'না, আঁচাবো কোথা'?

কর্তাগিন্নী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলেন।

এক পক্ষের ভাব...কই, যাও এবার জন্মের মতো?

অপর পক্ষের ভাব...যাওয়া আর হলো কই?

উভয়েরই মুখের প্রসন্নতায় যেন নৈনিতাল আলুর নিটোল মসৃণতা, মাছের 'তেল চচ্চড়ি'র স্নেহস্নিগ্ধতা। আলো ফুটে ওঠাটুকু বোধহয় মেজগিন্নীর করুণার জ্যোতির প্রকাশ।

ওদিকে অপর তৃতীয় পক্ষটি ঘৃণায়, লজ্জায় ধরণীকে দ্বিধা হ'তে বলার বদলে নিজের কপালটাই চৌকির গায়ে ঠুকে ঠুকে দ্বিধা করে ফেলতে চায়।

কী কুৎসিত লোলুপতা!

লোভের কী নির্লজ্জ প্রকাশ! ঘৃণায় 'রি রি' করতে থাকে সমস্ত শরীর।

এই আরতির মা বাপ! এতো নির্লজ্জতা বোধহয় এর আগে কোনদিন ধরা পড়েনি।...কি করবে আরতি? নিজেকে কি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে?... নাঃ, গলায় দড়ি যদি দিতে হয় সে আরতিরই দেওয়া উচিত।...হাঁ মরবে, সেই মরবে।

ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াক ওরা। লোকের কৃপাকণায় তুষ্ট হয়ে তাদের পদলেহন করুক। বাপের চাইতে মায়ের ওপরই ঘৃণা বেশী আসে। আজকে যেন সত্যই আশা করছিলো আরতি, একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে। জন্মের শোধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবেই একটা।

এই তার পরিণাম!

ভাবতে ভাবতে, কাঁদতে কাঁদতে, ঘৃণা করতে করতে, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো আরতি।...ঘুম ভেঙে দেখলে রোদে ছেয়ে গেছে উঠোন, বাড়ীটা কেমন যেন থমথমে।

প্রথমটা কিছু মনে পড়ছিলোনা, তারপর পড়লো।

জেগেই মনে হলো স্নানের দরকার। বাড়ীতে তোলা জলে নয়, দীঘিতে। ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর।

কিন্তু এরা কোথায় গেলো?

মা আর বাবা?

* * * *

ছেঁড়া গামছাখানা হাতে নিয়ে উঠোনে নামতেই সন্ধান পাওয়া গেলো এদের। রান্নাঘরে। বেড়ার দেওয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে।

বাবা খেতে বসেছেন, সামনে মা।

দাঁড়িয়ে প'ড়ে দাঁড়িয়েই থাকে আরতি।

হঠাৎ যেন চমকে গিয়েছে।

* * * *

এতো রোগা ওর বাবা?

ময়লা একটা ফতুয়া পরে বেড়ান বটে সারাদিন, কিন্তু খালি গা কি আরতি আর দেখেনি কোনো সময়?…প্রত্যেকটি পাঁজরের হাড় যেন চামড়ার আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাঁধের হাড়খানা পর্যন্ত খোঁচা হয়ে উঠেছে।…আর শীর্ণমুখে কী ক্ষুধার্ত লোলুপতা! নিজের পাতের চাইতে স্ত্রীর হাতের কাঁসিখানার ওপরেই সব দৃষ্টিটুকু আটকে আছে যেন।…যদিও তা'তে সামান্যমাত্র তরকারিই পড়ে আছে। মনে হচ্ছে নেহাত চক্ষুলজ্জায় চাইতে পারছেন না, অথচ সমস্ত ইচ্ছেটা উগ্র হয়ে আছে ওই অবশিষ্টাংশটুকুর ওপর।

আর মা!

মায়ের মুখে…হ্যাঁ সেই শীর্ণ শ্রীহীন মুখে এ কি অপরিসীম তৃপ্তির ছবি আঁকা! এছবি আরতির কতো অপরিচিত!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা সহানুভূতিতে আরতির মুখের কঠিন পেশীগুলো কেমন যেন শিথিল হয়ে আসে।…কেন যে আরতির মা লজ্জা ঘেন্না সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষুক-বৃত্তিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন, সে প্রশ্নের উত্তর যেন লেখা রয়েছে তাঁর মুখের ওই পরিতৃপ্তির ছবিতে।

মায়ের ঠোঁটের কোণে এখনো এমন হাসি ফুটে উঠতে জানে? কৌতুক আর প্রশ্রয়ের? স্নেহ আর দরদের? হাসিজড়ানো সুরে বলেন—

—অতো আর চক্ষুলজ্জার দরকার কি বাবু, নাও এটুকু। দেমাকী মেয়েতো তোমার খাবেনা এসব।

হাতের কাঁসির সবটুকু দিয়ে দেন স্বামীর পাতে।

—আর তুমি?

লোভে চকচকে দুইচোখ তুলে প্রশ্ন করেন ছোটকর্তা

—আমি?…আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

—সে কি,…কখন?

মুখটিপে হাসেন ছোটগিন্নী—এই এখন। তোমার সঙ্গে সঙ্গে। তুমি খেলেই আমার খাওয়া—

—ও হো হো। তাই বলো!…কিন্তু না না, অতোটা চচ্চড়ি, ফার্ষ্ট ক্লাশ হয়েছিলো—তোমাদের একটু—

—আহা আমরাতো বারোমাস ঘরের রান্না খাচ্ছি, তোমারই অখাদ্য হোটেলের রান্না খেয়ে প্রাণ যায়।

* * * *

নিশ্চিন্ত প্রেমালাপ।

কেউ সাক্ষী রয়েছে—এটা ধারণা নেই।

হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে যায় আরতির।

বাড়ীর রান্না!

সত্যি কী ভালো ভালো রান্নাই খায় তারা।

* * * *

আলু আর রইলো নাকি? মাছ?

আকণ্ঠ খেয়েও আশা মেটেনি। রাত্রের ব্যবস্থার সন্ধান নেওয়া চলছে।

—আলু আছে দুটো বড়ো বড়ো। মাছ আর কই? ভাজা হলো দু'খানা, আর এই দু'খানা ঝাল। চারের তিন যে ভোজনকারীর উদরেই স্থান পেয়েছে, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

—বেশ আলুগুলো। ওই সঙ্গে খানকতক রুইয়ের দাগা পড়তো, আর তোমার হাতের রান্না! আহা হা! কতোকাল যে কালিয়া খাইনি। মাছের যোগাড় হয় না দু'খানা?

—কোথায়? সবাই কিপটে হয়ে গেছে আজকাল।

উত্তরটা ম্লান।

—যা বলেছো। একটা নেমন্তন্নও হয় না। সেবারে সেই মেজগিন্নীর নাতির ভাতে যা ভালো নেমন্তন্ন খাওয়া হলো! সেই শেষ না গো? ক'বছর হলো?

—বছর ছয়েক।

—সেই শেষ খেয়েছিলাম ভালো কালিয়া। রান্নাটাও হয়েছিলো তেমনি! আহা! আর সেই ইলিশের টকটা? হ্যাঁগো মনে আছে?

গলার স্বরে মনে হয় ঘটনাটা বুঝি গতরাত্রের, এখনো আস্বাদ লেগে রয়েছে জিভে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে আরতি! এদের ওপর রাগ করবে? হায় ভগবান!

তা'হলে 'করুণা' বস্তুটাকে রাখবে কোথায়?

পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ছোটকর্তা।

ঝট করে সরে গিয়ে হনহন করে দীঘির দিকে এগিয়ে চলে আরতি। বেলা দেড়টা দুটোর কম নয়, পথে লোকের চিহ্ন নেই।

কী আশ্চর্য! এই রোদে রণজিৎ একা বসে আছে ছিপ নিয়ে একাগ্র সাধনায়!

—আপনি আবার এখন শিকারে বসেছেন?

চমকে ওঠে রণজিৎ?

—তুমি এ সময়? স্নানে নাকি?

—হ্যাঁ। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—ঘুমিয়ে? চমৎকার!

—চমৎকারই তো। অসময়ে চমৎকার একটি ঘুম দিতে যা মজা—

ছেচল্লিশের খোলস ফেলে ষোলো বছর বয়েসটা আত্মপ্রকাশ করে বসলো নাকি?

—থাক, ও মজা মেয়েদেরই মানায়।

—আর আপনাদের মানায় শুধু আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শিকারের সাধনা, কেমন?

নির্জন দীঘির পাড়, মধ্যাহ্নের বিশ্রামে বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। এই পরিবেশে নিতান্ত বালিকা বলে আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা আরতিকে।

রণজিৎ তবু গম্ভীরভাবে বলে—তেমন শিকার আর জুটছে কই? সেবারে এসে তবু পাড়ার একটি মেয়ের একটু সাহায্য-টাহায্য পাওয়া গিয়েছিলো—

—পাড়ার মেয়ের দায়।...চটুলহাসি খেলে যায় একটি অস্নাত অভুক্ত শ্রীহীন মুখে।...হ্যাঁ বুঝতাম গরম মাছভাজা খাবার আশা আছে—

—খেলেই পাওয়া যায়, ওইতো এক ব্যাটাকে ধরে বেঁধে জলে চুবিয়ে রেখেছি। খাওগে ভেজে।

—দাঁড়ান স্নানটা সেরে নিই।…কিন্তু বিনা পরিশ্রমেই পারিশ্রমিক?

আরতির দৃষ্টিও কি লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে তার বাপের মতো?

কিসের লোভে?

রণজিৎ বুঝতে পেরেছে সে লোভের সঙ্গে ষোলো বছর বয়সের কোনো সংস্পর্শ নেই, ওটুকু ভানমাত্র! তাই অবহেলাভরে ধরে রাখা মাছের বাঁধনটা খুলে আরতির পায়ের কাছে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে বলে—পারিশ্রমিক কিসের? দাতব্য! নিয়ে যাও খাওগে।

ওর কণ্ঠস্বরে যেন আশাভঙ্গের তিক্ততা।

কিন্তু আরতি কি কুড়িয়ে নেবে হেঁট হয়ে?

তেজী মেয়ে আরতি!

না কি চলে যাবে গট গট করে? বলবে 'দাতব্যে'র জিনিসে দরকার নেই তার?

কি করে যাবে?

ছ্যাচা বেড়ার ফোকর থেকে যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে…পাতলা চামড়ায় ঢাকা একখানি একখানি পাঁজর…ক্ষুধার্ত লোলুপ দুটি চোখ…দেখা যাচ্ছে…অসীম পরিতৃপ্তির ছাপ আঁকা একখানি শীর্ণ মুখ।…

হেঁট না হয়ে উপায় কোথায়?…

হয়তো—

হয়তো আরো হেঁট হতে ও পিছপা হতো না! রণজিৎ রক্ষা করেছে।

যা নয় তাই

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে' দেখলে গায়ত্রী, সামনে থেকে—পাশ থেকে। কী আছে তার চেহারায়? এমন কি বিশেষত্ব, যার জন্যে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত পুরুষ জাতি শুধু তার দিকেই লুব্ধ দৃষ্টি হানছে—এমনি একটা উৎকট ধারণা শ্রীপতির?

এ ধারণাটা কি কিছুতেই ঘোচানো যায় না, যে ধারণার জ্বালায় শ্রীপতির স্বস্তির লেশ নেই, গায়ত্রীর অশান্তির শেষ নেই?

অবশ্য, নিজেকে পুরুষ জাতির চক্ষে সত্যিকার লোভনীয় মনে করতে পারলে রীতিমত একটা সুখাবেশ আসে বৈ কি, সেটা স্বীকার করাটা নিন্দনীয় হলেও অস্বীকার করাটা মিথ্যাচার। কিন্তু সে দাবী করবার মতো সুন্দরী যে গায়ত্রী নয়, এ জ্ঞান তার যথেষ্ট আছে।

শ্রীপতিরই কি নেই? অন্ধ তো নয়?

তবে কেন শ্রীপতির অহরহ এই যম-যন্ত্রণা?

সত্যিকার সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে যারা ঘর করে, তাদের হৃদয়-অরণ্যে কী দাবানল জ্বলতে থাকে তা হলে?

রাগ হয়, অপমান বোধ হয়, দুঃখও হয় গায়ত্রীর।

অকারণ কী আগুনের দাহে খাক্ হয় শ্রীপতি! বাড়ীতে পুরুষ-আত্মীয় কেউ বেড়াতে এলেই কাজকর্ম শিকেয় উঠলো তার! তা সে যতো দরকারী কাজই হোক।

আগন্তুক ব্যক্তির বয়স সম্বন্ধে বিচার-বোধের বালাই থাকে না, এমনই বাতিক।

এই তো সেদিন চোখ দেখাতে ডাক্তারবাড়ী যাচ্ছে, বেরোবার মুখে মামাতো ভগিনীপতি রাজেন এলো মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। দাঁড়িয়ে পড়লো শ্রীপতি।

বাক্যবাগীশ লোকটা। পাত্রের বাজার আর বাজার-দর নিয়ে বক্-বক্ করেই চলে, ওঠে না। শ্রীপতিও নড়ে না! অথচ ডাক্তারের সঙ্গে টাইম ঠিক করা আছে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে শ্রীপতির যাওয়াই হলো না।

চোখ চুলোয় যাক, চোখের তারাকে চোখ-ছাড়া করে রেখে চলে যাওয়ার উপায় কোথা তার—যেখানে নির্লজ্জ লোলুপ একজোড়া চোখ হাঁ করে গিলতে চাইছে তাকে?

গায়ত্রীর বাপের বাড়ীর দিকের নেহাত বাপ ভাই ছাড়া প্রায় সকলেরই এ-বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। লিখিত অনুশাসনে না হলেও অলিখিত শাসনে। বিয়ের পর নূতন নূতন অনেকেই আসতো, এখন কেউ বড়ো আসে না। আসা ছেড়েছে—শ্রীপতির মুখের চেহারায় গলাধাক্কার নীরব নোটিশ পেয়ে।

যাক্, এ সবই তো সয়ে এসেছিলো গায়ত্রী।

যে যা বুঝতো, মনে মনেই বুঝতো। শ্রীপতির ভেতরকার এই গলদ এমন করে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েনি কোনো দিন, যেমন কাল হয়ে গেলো।

অথচ আবারও আজ সেই নাটকের পুনরভিনয় হতে চলেছে।

ব্যাপারটা এই ঃ স্কুলজীবনে নৃত্যগীতপটীয়সী বলে রীতিমত একটা খ্যাতি ছিলো গায়ত্রীর। আইবুড়োবেলায় অনেক নেচেছে, অনেক গেয়েছে। সে গায়ত্রী চাপা পড়ে গিয়েছিলো কবরের মাটিতে। এই আট বছর পরে একদল অবুঝ বাহিনী পণ করেছে কবর খুঁড়ে আবিষ্কার করবে তাকে।

কাল কতকটা কাজ এগিয়ে গেছে, আবার আজ আসবে বলে শাসিয়ে রেখে গেছে। গায়ত্রীর বাপের বাড়ীর পাড়ার ছেলেরা।

গায়ত্রীর যখন বিয়ে হয়েছে, ওরা তখন হাফ প্যান্ট পরে মারবেল খেলতো। এখন মস্ত লায়েক হয়ে উঠে এক সমিতি গড়েছে—'দুর্গত-কল্যাণকামী সঙ্ঘ' না কি ঐ রকম একটা গালভরা নাম দিয়ে। সেই সঙ্ঘের উদ্যোগে 'ভুখা মানবের ভুখ' মেটাবার সাধু সঙ্কল্প নিয়ে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' না কি ছাই-পাঁশ হবে বুঝি টিকিটের ব্যবস্থায়। টিকিট-বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাবে দান-পুণ্যে।

এই পর্যন্ত বেশ। মোটা টাকার একটা টিকিট যদি ওরা গছিয়ে যেতো গায়ত্রীকে, তাহলেও এসে যেতো না কিছু। শ্রীপতি গরীবও নয়, কৃপণও নয়।

কিন্তু তা তো নয়,—ওদের চাহিদা আরো জোরালো।

ওরা চায় গায়ত্রীকে!

বলে ঃ গায়ত্রীর কণ্ঠস্বরটাই নাকি মোটা চাঁদার চেয়েও অনেক বেশী দামী।

ব্যবস্থাপনার গিন্নী রেখাদিকে নিয়ে সদলবলে এসে হানা দিয়েছিলো কাল।

প্রস্তাব শুনে প্রথমটা তো গায়ত্রী হেসেই খুন! বলে: গান গাইবো কি রে? তবু ভালো যে, নাচতে বলিসনি! সে প্রোগ্রামও তো আছে তোদের অনুষ্ঠানে? গান-টান সব ভুলে মেরে দিয়েছি।

—ইস্ তাই বৈ কি! শেখা জিনিস আবার ভুলে যায় মানুষ?

—তা যায় না? বুড়ো হলে যায়।

ছেলের দল হেসে ওঠে: বুড়ো! আপনি বুড়ো? রেখাদি তাহলে কি? স্থবির?

রেখাদি?—রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে গায়ত্রী উত্তর দেয়: রেখাদির কথা বাদ দে, রেখাদি চির-তরুণী।

প্রায় চৌকো গড়নের দেহখানিকে কেনো রকমে একখানা চেয়ারে ঠেসে ভরিয়ে রেখাদি এতোক্ষণ হাঁপাচ্ছিলেন, এইবার নিজমূর্তি ধরেন: তা থাকবো কেন, তোর মতন অকালপক্ক হবো! ছিঃ ছিঃ, কী গোল্লায় গেছিস, অ্যাঁ!... বাবাঃ! বিয়ে আবার কার না হয়? তোর মতন এমন ডুবে যায় না কেউ। বিশ্বসংসার ভুলে কেবল 'আমি আর তুমি'!

—আঃ রেখাদি, চিরকাল একরকম থাকবে তুমি?

—নিশ্চয়! একশোবার। তোর মতন বদলে যাবো নাকি? যাক্ গে বাজে কথা, এখন চল দিকিন।

গায়ত্রীর আবার হাসির পালা।

—যাবো কি বলো! আর এখুনি হঠাৎ কোথায় বা যাবো?

—কোথায় যাবি? যমের বাড়ী! কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। ছেলেগুলো বলেছিলো ঠিক—'আমরা বললে কি আসতে চাইবেন?' আমি মরতে মরতে এলাম সেই জন্যে। একেবারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছি—চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে হয়, তাও রাজী।

যাওয়ার কথা গায়ত্রী কল্পনাও করে না।

শ্রীপতির অনুপস্থিতিতে একপাল ছেলের সঙ্গে কোথায় না কোথায় তাদের সঙ্ঘের অফিসে যাওয়া? তা হলে আর ফিরে এসে বাড়ী ঢুকতে হবে না। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সত্যি কথাটা তো আর লোকের কাছে তোলা যায় না, তাই ঠাট্টার ছলে বলে: বাড়ীর কর্তা উকিল, সেটি মনে রেখো।...'অনধিকারপ্রবেশ,'

'বলপ্রয়োগ', 'লুঠপাট'—এতোগুলো চার্জশীট তৈরী হয়ে যাবে তোমার নামে।

—রেখে দে তোর উকিল! বলে—'হাতি ঘোড়া গেলো তল, ব্যাঙ বলে কত জল!' রেখা ভটচায্যি হাইকোর্টের জজকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে! ...বিজয়, গাড়ীতে স্টার্ট দিতে বল।...গায়ত্রী, জল্‌দি। ...এক মিনিট মাত্র সময় দিতে পারি তোমাকে,—বেশভূষা-সংস্কার করতে।

গায়ত্রী খুঁজে খুঁজে যতো যুক্তি দেখায়, রেখাদির বাক্যের তোড়ে ভেসে যায়। ঘণ্টা দু'তিনের জন্যে একবার বাড়ীর বাইরে যেতে যে এতো রকম অসুবিধে হতে পারে, একথা সে গ্রাহ্যই করে না।

—একের নম্বরের কুনো হয়ে গেছিস তুই, সেই জন্যেই আরো বেরোনোর দরকার।...ভারী তো সংসার—কর্তা আর গিন্নী, তার আবার এতো বড়াই! তোর তো চব্বিশ ঘণ্টা ধিঙ্গি-নাচ নেচে বেড়াবার কথা।......চার-চারটে রঘু ডাকাতের পকেট সংস্করণ নিয়ে ঘর করি আমি, তাও তোর চেয়ে আমি অনেক মুক্ত জীব।

গায়ত্রী আর কতো যুঝবে?

তবু শেষ চেষ্টা করেছিলো, বলেছিলোঃ শুধু কর্তা-গিন্নী বলেই তো এতো ভাবনা! কর্তা এসে যখন দেখবেন পাখী উড়ে গেছে, তখন মূর্ছা যাবেন।

—আহা যেতে দে—যেতে দে! এসে আঁচল দিয়ে বাতাস করে পতিসেবার পুণ্য অর্জন করতে পারবি। সাধে বলছি—বিয়ে করে একেবারে গোল্লায় গেছিস! বর তো কারুর হয় না, বৌকে ভালোও কেউ বাসে না! হুঁ!... কোথায় গেলো তোর ওই ঝিটা? এতোক্ষণ তো ঘুর-ঘুর করছিল!... ওগো বাছা, কই তুমি?...এই শোনো, তোমার 'মা' না 'বৌদিদি'—কি বলো, একে নিয়ে চললাম আমি।...বাবু এলে বোলো—একদল ডাকাত আর তাদের সর্দারণী এসে ওনাকে ধরে নিয়ে গেছে!...

—নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! বেশ তো কালকেই যাবো না হয় বাপু, আজ কিচ্ছু ঠিক করা নেই...

—আরে মোলো তোর ঠিকের নিকুচি করেছে! কাল থেকে তো রিহার্সাল দেওয়াতে হবে ছুঁড়িগুলোকে। আজ সেই ঠিক করি গে চল্—কিভাবে সাজাতে হবে জিনিসটা।...এ ছোঁড়ারা তো 'রেখাদি সব ভার তোমার'—বলে

নিশ্চিন্দি হয়ে হবু গোঁফে তা দিচ্ছে! রেখাদির যেন শাশুড়ী-মরা দায়! এদিকে হাতে মাত্র চারটে দিন!

এরপর আর কি করবে গায়ত্রী?

তবু এই শর্তে গাড়ীতে উঠেছে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই নিশ্চয়ই ফেরত দিয়ে যেতে হবে তাকে।...

—হবে বাবা, হবে! উঃ কী পায়া ভারী! নড়ানো যায় না একেবারে! সাতজন্মেও যেন উকিল-গিন্নী না হই। এতো অহঙ্কার!

ঝিকে অনেকভাবে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে প্রায় নিরুপায় হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলো গায়ত্রী।

—আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে যে পরিশ্রমটা হলো গায়ত্রীদি, গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা ছিলো এর চেয়ে!

সাফল্যের আনন্দে একগাল হেসে একটা ছেলে এই সস্তা রসিকতাটুকু করে।

গায়ত্রী ফিকে হাসি হেসে বলে: বীর হনুমানদের ক্যাপাসিটিটারও প্রমাণ হয়ে গেলো তো?

বুকের ভেতর তার তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছে!...

একমাত্র ভরসা শ্রীপতি ফেরার আগে এসে পড়া।

কিন্তু সে ভরসা কোথায় ভেসে গেলো!

আসলে যা হয়! 'দুর্গত'দের দুঃখে বিগলিত মহামানবরা যেভাবে আড্ডা জমালেন, তাতে আড়াল থেকে মনে করা বিচিত্র নয় যে, বন্ধুর বিয়েতে বর-যাত্রীই বা এসেছে সব। প্রথমে নতুন নতুন পরিকল্পনার রঙিন ফানুসে প্রোগ্রামের সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে ঠেকলো—তার ঠিক নেই, তারপরে চললো ছাঁটাই। শেষ পর্যন্ত যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটালো, তখন খেয়াল হলো পাঁচটা বেজে গেছে—পঁচানব্বুই মিনিট আগে।

কাতর গায়ত্রী একেবারে উঠে দাঁড়ালো।

তবু দাঁড়াবার পরেও আরো কতো দেরি!

আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে তাকে ছাড়লো তারা।

—পৌঁছতে যাচ্ছে কে?

রেখাদির প্রশ্নে একটা ছেলে জানালো ঃ ওই যে শিবাজীদা গাড়ী নিয়ে রেডি রয়েছেন।

শিবাজীদা! সে আবার কে! এ নাম তো গায়ত্রীর জানা নাম নয়!

'দা' শব্দটা যে রাম দা'য়ের কোপ!

ওই একাক্ষর শব্দটিতেই মালুম হচ্ছে, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি এদের বয়সের গণ্ডী পার হয়েছে। কে জানে, কতো দিন আগে পার হয়েছে! মনে করেই হৃৎকম্প হলো গায়ত্রীর। গোঁফ গজিয়েছে—কি গজায়নি, মাথায় খানিক বেড়েছে মাত্র, এই ছেলেগুলোকেই শ্রীপতি বরদাস্ত করতে পারতো কিনা সন্দেহ, দেখেনি তাই রক্ষে!

এর ওপর আবার 'দাদা!'

চাঁদের ওপর চুড়ো!

ব্যগ্র হয়ে বলে ঃ কেন তোরা কেউ পারবি না? আবার কেন সে ভদ্দর-লোকের ঘাড়ে ভার চাপানো?

—হায় অদৃষ্ট!—গায়ত্রীর কথারই উত্তর দিতে দিতে বাইরে থেকে একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো ঃ এই বেচারা ভদ্দরলোকের স্কন্ধকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতোদিন না এঁদের কার্য-সমাধা হয়, ততদিন দৈনিক ছু'বার করে এ ভার বহন করতে হবে!…অতএব—চলে আস্থন নিঃসঙ্কোচে।

সে তো নিঃসঙ্কোচেই অন্থরোধ করলো গায়ত্রীকে নিঃসঙ্কোচে চলে আসতে, কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্কোচ কি শুধু ভদ্রতার? অপরকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে যে-ভদ্রতার সঙ্কোচ আসে?

কী স্বচ্ছন্দ জীবন রেখাদির! দেখলে হিংসে হয়।

কি করে ওর সামনে নিজের জীবনের অপমানকর গলদের কথা প্রকাশ করবে গায়ত্রী! কি করে বলবে, একা শিবাজীর সঙ্গে এক গাড়ীতে যাবার প্রস্তাব শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে তার!

তা' বলা যায় না।

কাজেই ভেঙে পড়তে উদ্যত আকাশের ভয় অগ্রাহ্য করে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠতে হয় গিয়ে।

—আসছিস তো কাল?

রেখাদির প্রশ্নে গায়ত্রী যেন এড়াবার একটা উপায় পায়। মিথ্যে রাগের

ভান দেখিয়ে বলে ঃ এসে কি হবে শুনি ? কাজ তো হবে কচু, খালি আড্ডা! কাল আসছি-টাসছি না।

—না এলে এরা ছাড়বে? শিবাজী সহাস্যে বলে ঃ 'কল্যাণকামী'দের ঠেকানো অতো সোজা নয়!

ভালোমতো একটা উত্তরের অভাবে গায়ত্রী শুধু হেসে চুপ করে থাকে। গুছিয়ে কথা বলবার মতো মানসিক অবস্থা এখন নয় তার।

কে জানে, কপালে কি আছে তার আজকে!

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই একেবারে শ্রীপতির সামনে।...

'রেখাদি পৌঁছে দিয়ে গেলেন'—এই গোছের কিছু একটা মিথ্যে কথা বলেই যে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করবে, তারও আর উপায় রইল না!

অথচ সত্যিই কিছু আর শিবাজী ভয়ঙ্কর একটা দৈত্যদানব নয়, নিতান্তই 'ছেলে' মাত্র! গায়ত্রীর চেয়ে দু'-ছ'মাসের ছোটই হবে হয়তো।

শ্রীপতি রাস্তায় পায়চারি করছিলো।

এসেই ঝিয়ের মুখে গায়ত্রীর 'উধাও' হওয়ার কাহিনী শুনেছে, তার পর থেকে এই ঘণ্টা দুই ধরে চলেছে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো পদচারণা।

জল খায়নি, হাত-মুখ ধোয়নি পর্যন্ত।

—ইয়ার ছোকরাটি কে? একটি লক্কা-পায়রা একেবারে!...

গায়ত্রী একটু জোর সঞ্চয় করছিলো মনে মনে। বিরক্ত হয়ে বলে ঃ কি যে অভব্যের মতো কথাবার্তা তোমার! একটা ছেলেমানুষ...

—হ্যাঁ দুগ্ধপোষ্য শিশু বলেই মনে হলো! তা যাওয়া হয়েছিলো কোথায়?

গায়ত্রীর ইচ্ছে হলো, বলে 'যমের বাড়ী', কিন্তু না, শ্রীপতির মেজাজটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, কে জানে!

তাই মনের রাগ চেপে সহজ গলায় বলে ঃ আর বলো কেন! দুপুরবেলা হঠাৎ কি বিপদ! বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ রেখাদি এসে একেবারে জোর-জবরদস্তি শুরু করলেন। কিছুতেই এড়ানো গেলো না!...

—এড়াবার ইচ্ছে থাকলে এড়ানো যায় না, একথা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। মতলবটা কি, শুনতে পাই? হঠাৎ রেখাদির এমন প্রেম উথলে ওঠবার মানে?

—মানে একটা কিছু আছেই।

গায়ত্রীও একটু বিরক্তি দেখায়।

—বলি, কার হুকুমে একপাল ছোঁড়ার সঙ্গে হৈ হৈ করে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছিলো?

বিশ্বের তিক্ততা শ্রীপতির কণ্ঠে।

খোলাখুলি এরকম রূঢ় কথা বড়ো একটা বলে না শ্রীপতি। কিন্তু এর আগে বলবার সুযোগই বা কবে দিয়েছে গায়ত্রী? বাপের বাড়ী পর্যন্ত সাধ্যপক্ষে যায় না। রাস্তা থেকে একটা ফেরিওয়ালাকে পর্যন্ত ডাকে না।

—আমি যে একটা ক্রীতদাসী মাত্র, সেটা অতো বুঝিনি।—বলে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় গায়ত্রী—মাথায় একটু খোলা হাওয়া লাগাতে।

—আর কি! লম্বা লম্বা কথা আছে খালি। জানো তো আমি এসব পছন্দ করি না। যাক, রেখাদির হঠাৎ তোমাকে কি দরকার পড়লো শুনি?

মরিয়া হয়ে গায়ত্রী এক নিশ্বাসে বলে যায়ঃ রেখাদির নয়, আমাদের ওপাড়ার ছেলেরা একটা চ্যারিটি শো করবে, আমাকে গান গাইতে হবে।

—বটে! শুধু গাইতে?—বিদ্রূপের কালো হাসি হেসে শ্রীপতি বলেঃ নাচতে নয়?…দেশে আর গায়িকা পেলো না, কেমন?

—আমার মতো ভালো গায়িকা পায়নি নিশ্চয়। বলে একটু বিজয়িনীর হাসি হাসে গায়ত্রী।

কিন্তু হাসিতে ভোলবার মতো অবস্থা এখন শ্রীপতির নয়, কুৎসিত একটা মুখভঙ্গী করে বলেঃ রূপ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে পয়সা রোজগার করা ভদ্রঘরের মেয়ের উপযুক্ত কাজই বটে!

—বিশ্রী বিশ্রী কথা বোলো না,—গায়ত্রী বলেঃ ঝি-টা ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনছে!…আচ্ছা তুমি যে বলছো, …আজকালকার দিনে কে না করছে ও-সব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই করছে। দু'চারটে ফ্যাশনেবল বাড়ীর মেয়েদের বেহায়াপনা দেখে দেখে চোক ধাঁধিয়ে গেছে তোমাদের! মোট কথা, বাছাধনদের ভালো করে বুঝিয়ে দিও, এখানে ওসব আবদার চলবে না। ইয়ারকির আর জায়গা পায়নি!

গায়ত্রী স্থিরভাবে বলে ঃ এখন আর কিছু বলা চলবে না, আমি কথা দিয়েছি।

—কথা দিয়েছো? ওঃ তা'হলে তো মাথাটা বিকিয়ে গেছে একেবারে! কাল এলে এক কথায় জবাব দিয়ে দেবে। বলবে—আমার স্বামী এসব পছন্দ করেন না।

—তাই কখনো বলা যায়?

এবারে শ্রীপতির আশ্চর্যের পালা!

—স্বামী পছন্দ করেন না—একথা বলা যায় না!…ঘরের বৌ গিয়ে পাঁচশো লোকের সামনে স্টেজে দাঁড়িয়ে নাচনা-গাওনা করবে, সবাই পছন্দ করে এসব?

—খারাপ করে বললেই খারাপ শোনায়। আমি তো দোষের কিছু দেখছি না।

প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করছে গায়ত্রী।

—তুমি দেখছো না, আমি দেখছি, ব্যস! এর ওপর আর কথা নেই।

কিন্তু কথা নেই বললেই কি কথা থামে?

তাসের পিঠে তাসের মতো কথার পিঠে কথা পড়ে!

স্ত্রী সুন্দরী না হলেও অহরহ যে দাবাগ্নি জ্বলছে শ্রীপতির হৃদয়-অরণ্যে, তারই হলকা ছড়িয়ে পড়ে তার কথায়। বলে ঃ বেছে বেছে ভদ্রলোকের বাড়ী আসবার জন্যে সময় বার করেছেন বটে! দুপুরবেলা! দুগ্ধপোষ্য শিশু কিনা, …জ্ঞান হয়নি। পড়তো আমার সামনে, ঠাণ্ডা করে দিতাম একেবারে!…

গায়ত্রী বলে ঃ কিভাবে ঠাণ্ডা করতে? গলা-ধাক্কা দিয়ে বোধ হয়?

—দরকার হলে দিতাম বৈকি!…গলাধাক্কা তো ছোটে কথা, ওসব ডেঁপো ছেলেদের চাবুকই হচ্ছে উপযুক্ত ওষুধ!

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনি অনেক কথাই বলে। বলতে বলতে মাত্রা রাখতে পারে না এবং 'শেষ কথাটা' যা বলে সেটা মারাত্মক।

'স্বামী পছন্দ করেন না'—এই কথাটা উচ্চারণ করতে যাদের মাথা কাটা যায়, সেরকম মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র কতো ভালো হয়, তা' জানা আছে শ্রীপতির। তাদের সায়েস্তা করবার অস্ত্র হচ্ছে জুতো! এই শ্রীপতির শেষ কথা!

এহেন শেষ কথার পর আর কথা কইবার অবস্থা ছিলো না গায়ত্রীর।

শুধু অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে হিসেব করেছে—আধ বোতল স্পিরিটে পরনের শাড়ীখানা ভালো করে ভেজে কিনা? ...মজবুত একগাছা দড়ি যোগাড় করা কি খুব অসম্ভব?...দোতলার ছাতের আলসে থেকে ফুটপাথের দূরত্বটা কি যথেষ্ট নয়?...দুপুর রাতে হঠাৎ যদি কারুর মৃত্যু-পিপাসা জেগে ওঠে, কি খায় সে?—আইডিন?

এসব অবশ্য গতকালকার চিন্তা! ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত যতোক্ষণ না মাথার রক্তটা ঠাণ্ডা হয়েছিলো, ততোক্ষণের।

সকালে ঘুমে থেকে উঠে নিত্যকর্মের ত্রুটি হয়নি। কাজ তো ঢের আছে। বামুন নেই, চাকর নেই—শ্রীপতির অর্থনৈতিক অসুবিধায় নয়, অনর্থনৈতিক অসুবিধায়।

কাজগুলো করে যাচ্ছে আষাঢ়ের আকাশের থম্‌থমে ভাব নিয়ে।...মনকে ঠিক করে নিয়েছে সে। দূর ছাই, তার আবার জীবন! সে জীবনের আবার ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্ন! বলেই দেবে যাওয়া সম্ভব হবে না তার।

বাড়ীর ঝি, তারও এতো সাহস হল যে, সকালে বললো: দাদাবাবু কাল কি অনর্থ কাণ্ডই করলো! করবে না? ও বাতিক যে বড়ো সব্বনেশে বাতিক বৌদি! জানি কিনা, নিজের ঘরেই ছিলো।—একটা কিছু 'সন্দ' হলো তো মেরে হাড়গতর চূর্ণ করে দিতো!...আপনাদের ভদ্দরের ঘরে তো তবু পরিবারের গায়ে হাত তোলে না।...

এ অপমান সয়েও চুপ করে থাকতে হয়েছে।

কী করবে? প্রতিবাদ করা—বকাবকি করা?—সে তো আরো অপমান।...

সকাল থেকে শ্রীপতিও কথা কয়নি। ঠিক রাগে নয়, বরং বলা যায় সাহসের অভাবে। গায়ত্রীর মুখভাব লক্ষ্য করেছে তো।...কালকের কথাগুলো একটু বেশী রূঢ়ই হয়ে গিয়েছিলো সতিই।

মনটা খারাপ লাগছে বৈ কি!

প্রেমটা তো মিথ্যে নয়, রাহুর প্রেম—এই যা!

কোর্টে বেরোবার সময় ধাঁ করে সাহস সংগ্রহ করে বলে ফেলে: ছোঁড়াগুলো আবার আজ জ্বালাতে আসবে বোধ হয়? বলে দিও: 'শরীর খারাপ।' ব্যস!...ঝি দোরটা দাও।

শ্রীপতি চলে যেতেই ঝিকে ভাত খেতে বলে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলো গায়ত্রী। অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলো ঝিয়ের ডাকে : বৌদি ভাত খাবে না?

—না! বলেছি তো? তুই খেয়ে নিগে।

বলে উঠে পড়লো গায়ত্রী, আর চোখ পড়ে গেলো বড়ো আরশিটায়।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো নিজেকে! সামনে থেকে···পাশ থেকে!

কী আছে তার চেহারায়? এমন কি বিশেষত্ব—যার জন্যে—আতঙ্কে আতঙ্কে খেয়ে-শুয়ে স্বস্তি নেই শ্রীপতির?

এর চেয়ে যদি একেবারে হাড়-কুৎসিত হতো গায়ত্রী, অনেক ভালো হতো। পৃথিবীসুদ্ধ পুরুষজাতি তাকে হাঁ করে দেখছে, এ দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতো শ্রীপতি। গায়ত্রীও বাঁচতো!

আচ্ছা ধরো—যদি সে বসন্ত হয়ে হাড়-কুৎসিত হয়ে যায়? একেবারে খুব সাংঘাতিক বসন্ত হয়ে?

কড় কড়—কড়াৎ!

গায়ত্রীর নিভৃত চিন্তার ওপর যেন বজ্রপাত হলো; আর কিছু নয়, দরজার কড়া নড়েছে।

কিন্তু কে?

নিশ্চয় শিবাজী!

আর কে এমন সময়?···

বসন্ত হয়ে হাড়-কুৎসিত হয়ে যাবার ইচ্ছেটা স্থগিত রেখে তাড়াতাড়ি চুলে একটু চিরুণী বুলিয়ে, পরনের শাড়ীখানা ছেড়ে, আলনা থেকে একটা ফরসা ডুরে শাড়ী টেনে নিয়ে প্রায় পরতে পরতে নীচে নেমে যায়।

ঝি দরজা খুলে দিয়েছে।

একা শিবাজী নয়। রেখাদিও।

এদের সামনে বলতে হবে—'আমার যাওয়া সম্ভব নয়?' কারণ, আমার স্বামী পছন্দ করেন না?

গায়ত্রীর গলাটা কেটে ফেললেও কি গলা দিয়ে বেরোবে একথা?

ওকে দেখেই রেখাদির কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো: ঘুম ভাঙলো মহারানীর!

বাব্বাঃ! কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে ব্যথা হয়ে গেলো একেবারে! তা'পর শ্রীমতী এখন যাবেন তো?

ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে হেসে ওঠে গায়ত্রী: না গেলে তোমরা ছাড়বে তো! দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে বাঁচতাম, তা' ঘুচে গেলো। কোথা থেকে যে এই বর্গীর হাঙ্গামা এলো কালকে!··· বাড়ী ফিরে দেখি—গিন্নীর অদর্শনে কর্তার কী রাগ! 'চা খাবো না,' 'খাবার খাবো না,' 'চাই না—দরকার নেই'···এই সব দস্যিপনা! আজ বোধ হয় আমার অদৃষ্টে মার খাওয়া আছে! নিদেন পক্ষে—নাকের ওপর দরজা বন্ধ!···হেসে কুটি কুটি হয় গায়ত্রী—চলো বাবা, যা' আছে কপালে।···ঝি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কিন্তু বন্ধ দরজা খুলিয়ে আবার তো ঢুকতে হবে? না কি বন্ধ হয়ে গেলো জন্মের শোধ? সতি সত্যি কি করবে শ্রীপতি, বাড়ী ঢুকতে দেবে না? না কি ধরে মারবে? কোনোটাই কি অসম্ভব?···'ভদ্দর লোকের ঘরে যে পরিবারের গায়ে হাত তোলার রেওয়াজ নেই'—ঝিয়ের এ ধারণাটা নিতান্তই কাঁচা।

একদিন নয়, দৈবাৎ নয়, রোজ রোজ ভর দুপুরে বেরিয়ে যাবে গায়ত্রী—গানের তালিম দিতে! শেষ পর্যন্ত স্টেজে উঠে গাইবে! সে গান শুনতে আসবে দুশো পাঁচশো পুরুষ!

এতেও যদি শ্রীপতির মাথার রক্তে আগুন ধরে না যায়, তো কিসে আর যাওয়া সম্ভব?

অথচ গায়ত্রী বা এ ছাড়া আর কি করতে পারতো?

সকাল থেকে তো বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছে—ফিরিয়ে দেবে ওদের। বলবে: 'আমি নিরুপায়, আমি পরাধীন, আমার স্বামী পছন্দ করেন না।'

কই, বলতে পারলো কই?

পরের কাছে এতোখানি মাথা হেঁট করা যায়?

বরং মার খেতে পারবে শ্রীপতির কাছে, তবু লোকের কাছে খাটো হতে পারবে না।···

হয়তো জীবন-ভোর এই-ই করতে হবে, গায়ত্রীকে!···লাঞ্ছনা সইবে, গঞ্জনা পাবে, হয়তো বা সত্যিই জুতো খাবে, তবু সেই কুৎসিত বিবর্ণ দাম্পত্য-জীবনের ছবিখানা লোকচক্ষে তুলে ধরতে পারবে না।···পাঁচজনের সামনে

তুলে ধরবার সময় প্রাণপণে লাগাবে চড়া রঙের পোঁচ,—চট করে যা'তে চোখ ধাঁধিয়ে যায় লোকের।

এ ছাড়া আর কি করতে পারবে? আর কি উপায় আছে তার হাতে?

বিদ্রোহ করা উচিত?

পাগল! গায়ত্রী তো নির্বোধ নয়। বিদ্রোহ করে লোক হাসিয়ে শ্রীপতিকে লোকের কাছে খেলো করে ফেললে গায়ত্রী লোক-সমাজের চুড়োয় উঠবে কোন্ খুঁটির জোরে?

নিজের স্বামীকে যে মেয়ে আঁচলে বাঁধতে পারে নি, পাঁচ জনে তা'কে করুণা করতে পারে, সমীহ করে না।

তবে শূন্য আঁচলের গিঁঠটা বড়ো করে বেঁধে লোক-সমাজে দেখিয়ে বেড়ানো ছাড়া উপায়?

নিরাশ্রয়

হাত থেকে জপের মালাটা আছড়ে ফেলে রঙচটা টিনের ট্রাঙ্কটা গোছাতে বসেন অন্নমাসী। নিঃশব্দ তৎপরতায় যে শুধুই হাতের কাজ করে যান তা নয়, রসনাকেও খাটাতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে! পুরো দমে খাটান।

এবাড়ীতে যে আর একদণ্ডও থাকবেন না তিনি, এবাড়ীর চৌকাঠ পার হবার আগে এক গণ্ডূষ জলও মুখে দেবেন না, সাড়ম্বরে সেই সঙ্কল্প ঘোষণা করতে করতে অন্নমাসী ট্রাঙ্কের গহ্বরে সুখশয্যায় শায়িত নামাবলী আর মটকার চাদর, 'কেটে কাপড়' আর কম্বুলে র‍্যাপারকে নির্মমহস্তে হিঁচড়ে বার করে আবার পাট করতে বসেন।

'—ঢের হয়েছে বাবা! আর নয়, বোনপোর বাড়ী এসে খুব সুখ করে গেলাম। চেরকাল মনে থাকবে। মরণদশা না হলে কেউ বৈমাত্র বোনের বেটা-বোয়ের কাছে শরীর সারতে আসে না—মরণদশা ধরেছিল আমার তাই এসেছিলাম—তা' খুব শিক্ষে হলো। এখন দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও বাবা, বিদেয় হয়ে বাঁচি।'…এই হচ্ছে নমুনা।

নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীমায় এই কথাগুলোই বারবার বলতে থাকেন অন্নমাসী। অভিযোগ শুনে মনে করা স্বাভাবিক—এ বাড়ীর বাসিন্দারা নিজেদের স্বার্থের আনুকূল্যে আটকে রেখেছে অন্নমাসীকে, আর যাবার জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তিনি। আর এও ভাবতে হবে—ঠিক আজই এমন কোনো ভয়ঙ্করী ঘটনা ঘটে গেছে যার পর আর একদণ্ডও তাঁর এ বাড়ীতে থাকা চলে না।

তবে, পর পর দু'তিনটে দিনের চেহারা দেখলে অবশ্য সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে।

রঙচটা ঐ টিনের ট্রাঙ্কটাকে গোছাতে বসা অন্নমাসীর দৈনন্দিন কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ। তবে নাকি আক্কেলের মাথা একেবারে খেয়ে বসেননি বলেই বোনপোর সংসারের অকল্যাণ করে অদিনে অক্ষণে চলে যেতে পারেন

না। অপমানের জ্বালা গায়ে মেখে আবার সেই ভিটেয় জলগ্রহণও করতে হয় তাঁকে, সে দিনটা থেকে যেতেও হয়।

কিন্তু বোনপো-বৌ রমলা সত্যিই কি এমন অভদ্র যে তার দুর্ব্যবহারে তার বাড়ীতে টিকতে পারেনা মানুষ? না—তা নয়! দুটো পাশ করা সভ্য ভব্য মেয়ে সে, ঝি চাকরকে পর্যন্ত কখনো 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলে না। মাসশাশুড়ীকে কোন অপমানের কথা কোনদিন বলেছে সে প্রমাণ করুক দিকি কেউ?

বলেনা। কিন্তু বলেনা—সেইটাই তো অসহ্য। মুখের ওপর স্পষ্ট করে দু'কথা বলা এর থেকে একশো গুণে ভালো। যেটা সহজ, যেটা স্বাভাবিক, যেটা বোধগম্য। তাতে ফিরিয়ে দু'কথা বলবার পথ আছে। আর বলাবলির সেই সহজযুদ্ধে অন্নমাসীরই জিতের আশা ষোলো আনা।

কিন্তু এ কী?

পরের মুখের ওপর স্পষ্ট শুনিয়ে দেবার বদলে অহরহ সেই অনুচ্চারিত কটূক্তি নিজের মুখের চেহারায় স্পষ্ট করে লিখে রাখবার এ কী নিষ্ঠুর বিলাস রমলার? ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন বিরক্ত অবজ্ঞায় প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করছে 'তুমি কেন? তুমি কে? চিরকাল এ সংসারে থাকবার আশা করছো না কি তুমি'?

সে ভাষা পড়তে পারেন অন্নমাসী, মুখ্যু হলেও পারেন। কিন্তু এর উত্তরের ভাষা জানা নেই তাঁর। অদৃশ্য এই আক্রমণের কাছে অহরহ তাঁর নিরুপায় পরাজয়।

তাই না এতো দাহ!

তাই না যখন তখন কারণে অকারণে, হয়তো বা ঝি চাকর কি বাড়ীর নেহাত অবোধ ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেও তুচ্ছ ত্রুটি আবিষ্কার করে এই কাণ্ড করতে হয় তাঁকে! মরচেধরা পুরনো এই অস্ত্রটা ছাড়া আর কিই বা সম্বল আছে অন্নমাসীর? রণবিজ্ঞানের আধুনিক কৌশল আয়ত্ত করতে যাবেন কি নিয়ে? তাই আজকে চঞ্চল একটা বাচ্ছা চাকরের পা দৈবাৎ তাঁর গায়ে ঠেকে যাওয়ার দুরন্ত অপমানে ঘন্টাখানেক ধরে চেঁচাচ্ছেন অন্নমাসী।

'—গলায় দড়ি আমার গলায় দড়ি! এখানে বসে বসে বোনপোর বাড়ীর ক্ষীর সর খাচ্ছি। কিন্তু আর নয়! ঝি চাকরের লাথি খেয়ে হজম করতে

পারবোনা। বিভূতি কোথায় গেলে বাবা? দাও এখুনি আমার কেষ্টকে একটা 'তার' করে দাও—এসে নিয়ে যাক। বয়াটে হোক, লক্ষীছাড়া হোক, পেটের সন্তান তো বটে সে, তার ভাত মাখ্যির ভাত। ক্ষীর সরে কাজ নেই বাবা, ছেলের ঘরে খুদ সেদ্ধ করে খাবো, তুমি এখুনি 'তার' করে দাও বিভূতি।'

বিভূতি নিঃশব্দে ঘরের ভেতর বসে মক্কেলের ফাইল ওলটাচ্ছিলো, দেখে মনে হয় না এ আবেদন তার কানে যাচ্ছে। কিন্তু রমলার কানতো বিভূতির মতো অমন সীসে দিয়ে ভর্তি নয়, কতো আর সহ্য করতে পারে সে?

ঘরের ভেতর এসে ফেটে পড়লো সে,—'এই রকমই তা'হলে চলতে থাকবে বরাবর?'

বিভূতি কেমন একটা অসহায় অপ্রতিভ ভাবে বলে—কিবা করা যায়!

কিছু করা যায় না—কেমন? অম্লান বদনে বসে বসে এই গালমন্দ সহ্য করতে হবে! চমৎকার!

উত্তরে বিভূতি একটু বোকার মতোই কথা বলে বসে। বলে, তা ওঁর সঙ্গে একটু 'ইয়ে' করে চললেই হয়? তা'হলে আর—

—'ইয়ে করে'? ওঃ, তা'হলে—বাদল মিণ্টুদের নিয়ে আমাকেই এ সংসার ছাড়তে হয়। তা ভিন্ন তো আর ওঁর 'ইয়ে' বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বলতে পারো কেন? কিসের জন্য আমি সর্বদা এতো অশান্তি সহ্য করবো?

বিভূতি বিব্রতস্বরে বলে—একটু আস্তে। আচ্ছা কি করতে পারা যায় বলো? স্বভাব তো আর বদলানো যায় না কারুর? মাঝে মাঝে তো বোঝাতেও চেষ্টা করি।

—বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করো! বেশ তা'হলে—বরাবর এই থিয়েটারই চলুক। উনি যথেচ্ছ গাল মন্দ করুন, যতো খুশি তেজ দেখান, দিনে পাঁচবার তোমার বাড়ী থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবার ভান করুন, আর তুমি গিয়ে 'বাপু বাছা' করে মান বজায় রেখো।

বিভূতি একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বলে—কি করবো? সত্যি তো আর 'বেশ চলে যাও' বলতে পারিনা?...আমাদের আশ্রয় ছাড়া ওঁর যে এখন আর কোনো জায়গা নেই সে তো তোমার অজানা নয় রমলা।

রমলা বিরক্ত ভাবে বলে—অজানা থাকবে কেন, খুবই জানা আছে। তা নইলে আর এতোদিন নীরবে সয়ে যাচ্ছি। তবে যাঁর নিজের সে জ্ঞান

থাকা উচিত ছিলো, তাঁকেই সেটা জানতে না দিয়ে, একটা অবাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে কতোদিন চলবে তাই ভাবি। একটা ভুল ধারণাকে চেষ্টা করে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে বুঝিনা। প্রত্যেকেরই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে চৈতন্য থাকা সঙ্গত। দ্বিতীয় আশ্রয়ের মিথ্যা কল্পনায় সত্যিকার আশ্রয়কে তা'হলে এতো অবহেলা করবার সাহস হয়না। যে ছেলে আজ ছ'মাস হলো মরে ভূত হয়ে গেছে—এখনো তার অহঙ্কারে—

—আঃ রমলা, আস্তে কথা কইতে কি তুমি পারোনা ?

—আস্তে কেন, বোবা হয়ে আছি। কিন্তু তোমাদের মতো অমন বাজে সেন্টিমেণ্ট আমার নেই। শোক-সংবাদ শুনে হার্টফেল করতে তো কখনো দেখিনি কাউকে। কি জানি তোমার মাসী যদি করেন! কিন্তু এও বলে রাখছি—বেশীদিন আর আমি এসব লুকোচুরির মধ্যে থাকবোনা।

—বলতে পারবে মুখের ওপর ?

রমলা নীরস স্বরে বলে—ওর আর পারাপারি কি ? চিরদিন কি না জানিয়ে চলবে ?

—যতোদিন চলে। এতে তো আমাদের কোনো লোকসান নেই রমলা ?

—লাভ লোকসানের কথা নয়। মিথ্যে—মিথ্যেই। তার সপক্ষে কোনো সদযুক্তি নেই। 'দুঃসংবাদ' বলে শব্দটা তা'হলে থাকতো না। দু'দিন চীৎকার করবেন, হাত পা আছড়াবেন, তারপর সবই ঠিক হয়ে যাবে। অন্ততঃ বুঝে যাবেন নিজের অবস্থাটা কি।...তোমার এই বাজে সেন্টিমেণ্টটা একেবারে অর্থহীন।

রমলা রাগ করে চলে গেলো।

আর বিভূতি খোলা দরজাটার দিকে চেয়ে চেয়ে তার কথাই ভাবতে লাগল বসে বসে।

হ্যাঁ, তারই কথা।

বিদুষী রমলা, সভ্য ভব্য মার্জিত ভাষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাই বলুক, বিভূতির কাছে তার অর্থ সুস্পষ্ট। সাদা বাঙলায়—সে মুখরা মাসশাশুড়ীকে টাইট করে দিতে চায়!...

কেনই বা চাইবেনা ? আশ্রিতার এতো তেজ দর্প কে কবে সহ্য করতে পারে ? আর সে দর্পচূর্ণ করবার অমোঘ ওষুধ যখন হাতের মুঠোয় রয়েছে।

বিভূতির এই এক দুর্বলতা। এক রকম অস্বাভাবিকই বৈকি! ছ'মাস ধরে কেষ্টর মৃত্যু-সংবাদটা পুষে রেখেছে, বলতে পারছেনা অন্নমাসীকে। দিনে দশবার কেষ্টকে 'তার' করে দেবার অনুরোধ সত্ত্বেও না।

অবিশ্যি একথা মনে করলে ভুল হবে কেষ্ট নামক সুসন্তানটি একটা বড়ো রকমের ভরসা ছিলো অন্নমাসীর, আর নেহাতই 'শরীর সারবার' স্বল্প মেয়াদে সতাতো বোনের ছেলের বাড়ী এসেছিলেন তিনি।

গুণধর পুত্রের কাছে অন্নের প্রত্যাশা অন্নমাসীর কোনো কালেই ছিলোনা। ছেলের মূল আস্তানাটা ছিলো গ্রামের বাইরে একটা নীচ পল্লীতে, অর্থের প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে বাড়ী আসতো এবং মাকে গালমন্দ করে টাকাটা সিকেটা—এমনকি সংসারের ঘটিটা বাটিটা পর্যন্ত সংগ্রহ করে কিছুদিনের মতো উধাও হতো।...ছেলের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েই ভিটেয় চাবি দিয়ে জামাইবাড়ী গিয়ে উঠেছিলেন অন্নমাসী। মেয়ে জামাইয়ের দেওয়া মাসোহারাতেই যখন চালাতে হবে, তখন তাদের কাছে গিয়ে পড়ে থাকাই ভালো।

সেখানে বছরকয়েক কাটানোর পর অন্নমাসীর বরাতগুণে মেয়েটি গেলো মারা। বলাবাহুল্য অতঃপর সে বাড়ীতে টিকে থাকা শক্ত হলো। মুখরা শাশুড়ীকে স্ত্রীর খাতিরে যেটুকু সমীহ করে চলতো জামাই, স্ত্রীর মৃত্যুতে সেটা অনাবশ্যক বিবেচনা করলো। কাজেই একদিন 'জামাই বাড়ীর মুখে ঝাড়ু মেরে' রংচটা টিনের ট্রাঙ্কটা নিয়ে অন্নমাসী এসে উঠলেন বোন-পো বিভূতির এখানে। সে প্রায় বছর খানেকের কথা।

সে সময়—রমলার কথা বাদ দাও—বিভূতিও যে এই আবির্ভাবটাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখেছিলো তা' নয়। অস্থায়ী ব্যবস্থা ভেবেই চুপ করে ছিলো মাত্র। কিন্তু অন্নমাসীর আচরণে অস্থায়িত্বের লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। এসেই তিনি এই 'নবাবীকেত্তনের' সংসারের হাল ধরতে চাইলেন। বৌ ছেলে আর একপাল চাকর বাকরে মিলে বেচারা বিভূতিকে যে ডোবাতে বসেছে, এ তথ্যটুকু তাঁর চোখে ধরা পড়তে দু'দিনও লাগলোনা। কথায় বলে 'মা মাসীর প্রাণ', সেই প্রাণের তাড়নায় মগ্নোন্মুখ ছেলেটাকে ভাসিয়ে তুলবার চেষ্টা করবেন না অন্নমাসী?

'ওমা এইটুকু সংসারে আবার পঞ্চাশটা ঝি-চাকর কেন, দেখলে গা জ্বালা

করে!'…'তিরিশ টাকা মাইনে দিয়ে একটা দস্যি বামুন রাখা কি জন্যে, বৌ কি দুটো ভাত সেদ্ধ করতে পারে না? আকাঁড়া গতর নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা করবে কি?'…'ছেলেপুলের এতো নবাবী খাওয়ার ঘটা কি করতে গা, দুধ সন্দেশ মাখন মিছরি নইলে জলখাবার হয় না! দু'খানা দু'খানা পরোটা ভেজে রাখতে পারো না?' 'বিভূতি যাই মেনিমুখো তাই এই সব সহ্য করছে, অন্য ছেলে হলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতো'—এই সব ছিলো অন্নমাসীর প্রথম যুগের বাকমাধুর্যের নমুনা। তবে রমলার নিরুত্তর অগ্নিদৃষ্টি, আর নিরুত্তাপ কাঠিন্যের আঘাতে অবশ্য সে যুগ কাটতে দেরি হয়নি। অতঃপর এলো সূক্ষ্ম অভিমানের যুগ! সে যুগে—সাড়ম্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন অন্নমাসী—তিনি আর এ সংসারের কে, দাসীবাঁদীর সামিল বৈ তো নয়! কি দরকার তাঁর এদের কথায় কথা কওয়া!

রমলার ঔদাসীন্যের তুষারপ্রলেপে সে অভিমানের যুগটাও গেছে। এখন ছেলে-পুলে ঝি-চাকর প্রায় প্রকাশ্যেই অবহেলা করছে, এবং শত চেষ্টাতেও রমলার সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই অপমানাহত অন্নমাসী এখন মুহুর্মুহু কেষ্টকে 'তার' করবার নির্দেশ দিচ্ছেন, আর এরা যে তাঁকে যাবার ব্যবস্থা না করে দিয়ে আটকে রেখেছে, সেই কথাটাই পাড়াসুদ্ধ্ লোককে জানিয়ে ছাড়ছেন।

মধ্যবর্তী খবর শুধু এই—প্রায় মাস কয়েক আগে অন্নমাসীর দেশ থেকে মুকুন্দ নামক এক ছোকরা বোধ করি—কেষ্টর তাড়ির আড্ডার ইয়ার, এসে বাইরের ঘরে বিভূতির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলো, ঘণ্টা খানেকের বেশী থাকেনি।

কী এক অদ্ভুত করুণার বশে কে জানে বিভূতি সে ছেলেটার আসার খবর অন্নমাসীর কাছে সেই যে গোপন করেছিলো, আজ পর্যন্ত আর পারলো না প্রকাশ করতে। অন্নমাসীর এতো ধৃষ্টতায় নয়, রমলার শত উৎপীড়নে নয়। বিভূতি ভাবে—অন্নমাসীর আস্ফালনের সকরুণ দিকটা রমলার চোখে পড়ে না কেন? দয়া করবার মতো মহত্ত্ব না থাকে, অবহেলা করবার উদারতাটুকুও নেই কেন রমলার? কেষ্টর মৃত্যুসংবাদ না জানলেও, বড়লোক বোনপোর সচ্ছল সংসারের নিশ্চিত অন্নের প্রলোভন জয় করে নিশ্চিত উপবাসের দেশে ফিরে যাওয়া যে অন্নমাসীর পক্ষে নিতান্তই কঠিন এটুকুও কি বুঝতে পারে না রমলা?

একান্ত নিরুপায় ব্যক্তিকে কি করে লাঞ্ছনা করতে পারে মেয়েরা? কি করে পারে আশ্রিতজনকে ঈর্ষা করতে?

কিন্তু শুধু রমলাকে দোষ দিলেই বা চলবে কেন। আশ্রিতজনের ব্যবহারেও তো দৈন্যভাব থাকা উচিত? তা নয়, তিনি এসে বিভূতির কাছে কেঁদে পড়বেন—বিভূতি তোমার সংসারে ঝাঁ্যাটা লাথি খেয়ে আর কতোদিন থাকবো বাবা? এর একটা বিহিত করো!

অন্নমাসীর আবির্ভাব আর অভিযোগে সচমকে চারিদিকে তাকিয়ে নিলে বিভূতি। কাছেপিঠে রমলা নেইতো? যে রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে ও, ভয় করে। অবশ্য অন্নমাসীর পদ্ধতি অনুসারে থাকাই উচিত রমলার। দৃষ্টিগোচরে না হোক শ্রবণগোচরে। নেহাতই যে বিভূতির অনুরোধ উপরোধে এ যাত্রা রয়ে গেলেন অন্নমাসী, সে কথা রমলা না জানলেই বা লাভ কি হলো?

তবু দৃষ্টিগোচরে না থাকার সুবিধায়, বিভূতি আশ্বস্ত হয়ে বলে—আচ্ছা আচ্ছা হবে হবে। অতো ব্যস্ত কেন? কে কি বলেছে বলোতো? ধমকে দিচ্ছি তাকে গিয়ে। ছেলেপুলেগুলোও হয়েছে তেমনি পাজী।

অন্নমাসীর চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসে এবার—না বাবা কেউ মন্দ নয়, আমিই কুচক্কুরে বজ্জাত। তা এ পাপকে আর কতোদিন পুষবে? আপদ বিদায় করবার ব্যবস্থা করো।

—কি মুস্কিল! এখুনি যাবে কি গো! সামনের মাসে বাদলাটার পৈতে দেবো ভাবছি, তুমি না থাকলে চলবে কেন?

"—আমি আবার একটা মানুষ, আমার জন্যে আবার অচল।…কি যে বলিস", বলে, আশ্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন অন্নমাসী, জের টেনে বললেন—অবশ্যি ছেলেটার গলায় স্থতোগাছাটা দেবে বলছো তাই। থাকতেই হবে কথায় পড়ে। বৌমা পাশ করা মেয়ে, ওসব 'নিয়মকম্ম নিতরিতের' কি বা জানে? তবে কাজটি মিটে গেলে কিন্তু আর একদিনও নয় বাবা। এই বলে রাখলাম।

কেন কে জানে বিভূতির চোখটা ছলছলিয়ে ওঠে।

আহা! কতো অল্পে সন্তুষ্ট, কতো বেচারা!…সম্মানের এই ভানটুকুই কী মূল্যবান এদের কাছে? আচ্ছা কী লোকসান এই ভানটুকুতে! তুচ্ছ করুণাটুকুতেও কৃপণতা কেন মানুষের!

সস্নেহ মমতায় বলে—আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। এখনতো নিশ্চিন্ত হলাম বাবা। দণ্ডীঘরে থাকা-টাকা সে কতো ঝঞ্চাট। তোমরা ওসব যত জানো, তেমন কি আর,—ইয়ে, আজ তোমার নিরিমিষ ঘরে কি রাঁধবে বলতো? বহুকাল পলতার বড়া খাওয়া হয়নি, আর মোচার ঘণ্ট। রাঁধো না?

অন্নমাসী এক গাল হেসে বললেন—শোন পাগল ছেলের কথা! মোচা কি অমনি রাঁধবো বল্লেই রাঁধা হয়? রাতে কুটে ভিজিয়ে রাখতে হয় তবে না? আজতো হবে না, আসছে কাল মঙ্গলবার, মোচা খেতে নেই। সেই তোমার সে পরশু।

বিভূতি হতাশভাবে বলে—হায় কপাল! পরশু অবধি টিকলে হয়।

—ষাট ষাট ষষ্ঠীর দাস! কি যে ছাই ভস্ম কথা ক'স। বলে আর একবার ষাট বানিয়ে হৃষ্টচিত্তে নিরামিষ ঘরের উনুনে আগুন দিতে যান অন্নমাসী।

পাশের দালানে জ্বলন্ত উনুনের চেয়েও আগুন হয়ে রমলা যেখানে গুম হয়ে বসে আছে, সেদিকে একটা কটাক্ষ করে যেতে ভোলেন না।

ঘটনার চেহারাটা প্রায়ই এই একরকম।

কি করে তবে মাসশাশুড়ীকে সমঝে দেবে রমলা? নিজের স্বামীই যে তার প্রতিবন্ধক। আর মজা এই—স্বামীকে যেন মনে মনে ভয় লাগে তার! মুখে যতই আস্ফালন করুক, ভয়টা ভেতরে থাকেই।

কিন্তু কথায় বলে "চোরের সাতদিন সাধুর একদিন।" রমলার কি একটা দিনও আসবে না? মক্কেলের কাজে দিন তিনেকের জন্যে আসানসোল যেতে হলো বিভূতিকে।

মাসীর কথা ভেবে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন যে না হলো তা নয় কিন্তু সত্যি তো আর বৌকে স্পষ্ট করে বলতে পারে না—আমার অনুপস্থিতিতে আমার মাসীর ওপর দুর্ব্যবহার কোরো না।

আবার চারদিন পরে এসে প্রথমেই কিছু আর মাসীর কুশলবার্তা নেবার ফুরসত হয় না! খেয়াল যখন হলো তখন রহস্য করে বললে—মিণ্টু তোর অন্নঠাকুমার কণ্ঠ নীরব কেন? বাড়ীটা আন্‌কা ঠেকছে যে!

মিণ্টু সভয়ে একবার মার মুখের পানে চেয়ে মুখ নামালো। এগারো বারো বছরের পাকা মেয়ে—জগতের অনেক তথ্যই বোঝে।...মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রমলাও মুখ নামালো।

—কি ? মায়ে মেয়েতে এতো মুখ-তাকাতাকি কিসের ?

বিরক্ত ভাব গোপন করলো না বিভূতি। এবং বাপের বিরক্তির ভয়ে নয়, বোধকরি পৃষ্ঠবলের ভরসায় মিণ্টু তাড়াতাড়ি বলে ফেললে—কেষ্টকাকার মরার খবর জেনে পর্যন্ত দু'দিন ধরে একটিও তো কথা বলেন না অন্নঠাকুমা। শুধু ঘরের ভেতর বসে থাকেন চোরের মতন।

মিনিট খানেক স্ত্রীর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বিভূতি একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে উঠলো,—এতো বড়ো সুযোগটা আর অবহেলা করতে পারলে না, কেমন ?

তিরস্কারের উত্তর তৈরী রেখেছিলো রমলা, বিদ্রূপের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। একবার থতমত খেয়েই জ্বলে উঠলো সে। সেও বিদ্রূপতিক্ত স্বরে বলে উঠলো, ভয় পেও না, আকস্মিক আঘাতে উন্মাদ হয়ে যাননি তোমার মাসী। দু'দিন চুপ করে আছেন, বোধকরি নিতান্তই চক্ষুলজ্জার দায়ে। দুঃসংবাদ উনি আজ নতুন শুনলেন না, যথাসময়েই শুনেছিলেন। তবে হ্যাঁ, কোটি কোটি নমস্কার করতে হয় তোমার মাসীপিসির চরণে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুসংবাদ একেবারে হজম করে ফেলে ছমাস ধরে সেই ছেলের নাম নিয়ে নিয়ে থিয়েটার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব, এ তোমাদের বাড়ী এসেই দেখলাম।

আগাগোড়া ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমাল লাগে বিভূতির, অথচ রমলার বিদ্রূপকুঞ্চিত মুখের দিকে চেয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে প্রবৃত্তি হয় না।··· শুধু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে এই কথাটাই হঠাৎ মনে হয়—উনিশ বছর ধরে এই মুখের অধিকারিণীর সঙ্গে ঘর করে এসেছে সে ! আশ্চর্য !

কিন্তু ক্ষণপূর্বশ্রুত কাহিনীটাও যে আশ্চর্য !

এর রহস্য ভেদ করবে কে—অন্নমাসী ছাড়া ?

ঘরে ঢুকে প্রথমটা নজরেই পড়েনি।···তাকিয়ে দেখা গেল রঙচটা সেই ট্রাঙ্কটার পেছনে নিজেকে যথাসম্ভব গোপন করে সত্যিই যেন ধরা-পড়া চোরের মত বসে আছেন অন্নমাসী। বিভূতিকে দেখে আরো একটু জড়সড় হলেন।

ট্রাঙ্কটার উপরেই বসে পড়লো বিভূতি। বিনা ভূমিকায় বললে—বাড়ী যাবে অন্নমাসী ?

বাড়ী ?···হঠাৎ যেন অকূলে কূল পান অন্নমাসী, ব্যাকুল অনুনয়ে বলেন—হ্যাঁ বাবা তাই যাবো। দু'দিন ধরে ভেবে আর ঠিক করতে পারছিনে। তাই

দে, একটু ব্যবস্থা করে বাড়ীই পাঠিয়ে দে আমায় এবার।...সেখানে গিয়ে কেষ্টর নাম করে গলা ছেড়ে খানিক কাঁদি গিয়ে।...মহাপাপিষ্ঠী আমি, পুত্র-শোকের কান্না গিলে ফেলে, আজ ছ'মাস ধরে কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলছি—এই তামাসা দেখে কেষ্ট "সেখানে" বসে বসে কত হাসিই না হাসছে। ভাঙা ভিটেয় পড়ে প্রাণভরে চেঁচিয়ে সে পাপের প্রাচিত্তির করিগে।

বিভূতি ইতস্ততঃ করে বলে—কিন্তু তুমি তো জানতে না অন্নমাসী?

অন্নমাসী কেমন হতাশ অসহায় দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে বলেন—জানতাম বৈ কি বাবা। এ খবর কি মায়ের প্রাণে অজানা থাকে? মনই জানিয়ে দেয়। মুকুন্দ এসে যেদিন বাইরে বাইরে শুধু তোর সঙ্গে দেখা করে পালিয়ে গেল সে কি আমি টের পাইনি? তখনই বুঝেছিলাম কী খবর নিয়ে এসেছে সে। জেনে বুঝে চুপ করে থেকেছি, পষ্ট করে জিগ্যেস করিনি।

বিভূতির মুখ থেকে বোধ করি অজ্ঞাতসারেই অস্ফুট একটা 'কেন' উচ্চারিত হয়।

অন্নমাসী মুখ তুলে বলেন—কেন? কেন তাই শুধোচ্ছিস? ভেবেছিলাম মোদো মাতাল যাই হোক তবু তো 'ছেলে'। তার আশ্রয় জোরের আশ্রয়। সে নাম মুছে গেলে ত্রিজগতে আর মুখ কোথায় আমার? নিরাশ্রয় হয়ে পরের ঘরে পড়ে থাকা যে বড়ো ঘেন্না।...রাগ করিসনে বাবা, বৌমা বড়ো নিষ্ঠুর, বড়ো অহঙ্কারী। মানুষকে 'মানুষ' জ্ঞান করে না। বড়ো 'হেয় বোধ' হয়ে থাকতে হয় ওর আশ্রয়ে। সেই ওর কাছেই আমি একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে আছি এ কথা স্বীকার করতে পারছিলাম না। তাই মা হয়ে, আমি আজ ছ'মাস—এই শোক চাপা দিয়ে—

ছ'মাস পরে বোধকরি এই প্রথম ছেলের শোকে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে অন্নমাসীর।

কে জানে হয়তো যথার্থ ছেলের শোকেও নয়! হয়তো এতোদিনে সত্যকার নিরাশ্রয় হয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক দুঃখেই!...খড়কুটো সাজিয়ে আশ্রয়ের যে ছলনাটুকু এতোদিন প্রাণপণে খাড়া রেখে আসছিলেন, রমলার একটি ফুৎকারে যে ধুলো-গুঁড়ো হয়ে গেছে সে আশ্রয়।

কিসের জোরে আর তবে দাঁড়িয়ে থাকবেন অন্নমাসী?

লোকসান

ট্রেনে আসতে আসতেই দুঃসংবাদটা শোনা হয়ে গিয়েছিলো। ডেলি প্যাসেঞ্জার রমেশ বাগচী পাশের গাড়ী থেকে এ গাড়ীতে উঠে এসে শুনিয়ে গিয়েছিলো।

বরাবরই লক্ষ্য করেছি এ বিষয়ে রীতিমত একটা উৎসাহ আছে রমেশ বাগচীর, ভগ্নদূতের পেশাটা ওর পছন্দসই।...কিন্তু—শুধুই কি রমেশের? অধিকাংশ মানুষেরই কি নয়? আমার মৃত্যু-সংবাদটা আপনার কানে তোলবার জন্যে কে না 'মুখিয়ে' থাকে? আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে—এমন শাঁসালো বিষয়বস্তু আর কি আছে অপরের দুর্গতির কাহিনীর মতো?

বাড়ী ঢুকতে ঢুকতেই মাও তো সেই সংবাদই পরিবেশন করেন।...

—প্রবোধ ঠাকুরপোর বাড়ীর খবর শুনেছিস অরুণ? ...শুনেছিস? কে বললে?

—রমেশ বাগচী।

—রমেশ? ওঃ, ওতো জানবেই, রোজ যাওয়া-আসা করছে। তোদের —হপ্তায় একদিন বাড়ী আসা—তার মধ্যে কতো কাণ্ডই ঘটে যায় দেশে! উঃ কী সর্বনাশই হয়ে গেলো! যাকে বলে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

আমি বলি—সত্যি! ভাবা যায় না যেন! প্রভাসদা'র মতো ছেলে—

—কি বলিস! অমন ছেলে গাঁয়ে আর একটা ছিলো? ইদানীং তো হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিলো। তার ওপর আবার আফিসের বড়কর্তা না কি যেন হবার কথা ছিলো শীগ্‌গির, হলে চোদ্দ পনরোশো টাকা মাইনে হতো—অমন ছেলেও যায় মানুষের! উঃ ভগবানের কি অবিচার! নৈবিদ্যির চুড়োর সন্দেশটির ওপরই কি তাঁর যতো লোভ! বলা উচিত নয় অবিশ্যি—বেঁচে থাকুক—দুর্গা, দুর্গা...তবে "অগা বগা" আরোও দুটো তো ছিলো? খাবার মুখগুলি রইলো—দেবার হাতটি গেলো।

শুনতে খারাপ হলেও কথাটা সত্যি বৈ কি!

উপার্জনশীল ব্যক্তি বলতে একমাত্র প্রভাসদা'ই ছিলেন পরিবারের মধ্যে।

অবশ্য থাকতেন সুদূর বিদেশে মীরাটে। আসা-যাওয়া খুবই কম ছিলো। কালে কস্মিনে পুজোর ছুটিতে আসতেন এদিকে, কলকাতার শ্বশুরবাড়ীতে বৌ ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে দু' এক দিনের জন্যে দেশে বেড়িয়ে যেতেন ; সে যাই হোক, মাসের প্রথম দিকেই তাঁর প্রেরিত মোটা অঙ্কের মণিঅর্ডারটিই তো ছিলো প্রবোধকাকার একমাত্র ভরসা। আর এ বিষয়ে সত্যি আদর্শ ছেলে বলতে হতো প্রভাসদাকে, কখনো কোন অজুহাতেই দু'টাকা কম কি দুটো দিন দেরী হতো না।

সেই ছেলে গেলো !

মা অনেক হা-হুতাশের পর নির্দেশ দিলেন—যা হবার তা' তো হয়েই গেছে, এখন দু'দণ্ড জিরিয়ে নিয়ে যা একবার দেখা করে আয়। আহা, মানুষটাকে দেখলে বুকটা ফেটে যায় যেন।

বুকটুক না ফাটুক, মনটা আমারও সত্যি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু মার প্রস্তাবে সভয়ে বলি—যেতে হবে ? কিন্তু—কি করে মুখ দেখাবো —তাই ভাবছি। ···বলবোই বা কি ?

—শোনো কথা ছেলের—মা অবাক্ বিস্ময়ে বলেন—তুই কি অপরাধ করেছিস যে মুখ দেখাতে পারবি না ? মানুষের বিপদে-আপদে শোকে-দুঃখে গিয়ে দুটো ভালো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে না পারলে আবার আত্মীয় বলেছে কেন ? আমি তো যখন শুনলাম, সবে তখন রান্না চাপিয়েছি, হাতের কাজ হাত থেকে ফেলে ছুটে চলে গেলাম।······এ পর্যন্ত কখনো কথাটথা তো কইনি প্রবোধ ঠাকুরপোর সঙ্গে, কিন্তু এমন বিপদের সময় কি আর মুখ বুজে থাকা চলে ? কথা কয়ে দুটো ভাল-মন্দ বুঝ দিয়ে সেই কতো বেলায় ফিরলাম। লেখাপড়া শিখে—কলকাতায় বাস করে তুই যে এতো মুখচোরা কেন, তাই ভাবি।

'কেন' সে কথাতো আমিও ভাবি, কিন্তু 'চোরামি' ঘোচে কই ?

কিন্তু মা ছাড়লে তো ?

শেষ পর্যন্ত ঠেলে পাঠালেনই ওপাড়ায়।

আহা, সত্যিই ভারী দুঃখ হলো বেচারা প্রবোধকাকাকে দেখে। যদিও আমাদের নিতান্তই দূরসম্পর্কের কাকা, কিন্তু এক গ্রামে বাস করার জন্যে

আত্মীয়তা ছিলো। বিশেষ করে—কর্মক্ষেত্রে প্রভাসদা'র পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধকাকারও যেন সমাজে পদোন্নতি হয়েছিল। বেশ কিছু অহঙ্কারও যে তাঁর না হয়েছিলো তা নয়। সামনে সমীহ করলেও—নির্বোধ গ্রাম্য বৃদ্ধের সেই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য-গর্বের সুস্পষ্ট অহঙ্কার আমাদের উপভোগ্য ও আলোচনার বস্তু ছিলো।······কিন্তু সে কথা থাক—আজ প্রবোধকাকার সবকিছু অহঙ্কার ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে গেছে। আজ আর সমীহ করবার দরকার নেই, পিঠে হাত বুলিয়ে সহানুভূতি জানালেই চলবে।

প্রথম দর্শনেই একবার হাহাকার করে উঠলেন কাকা, তারপর ধীরে ধীরে অনেক কথাই হলো।···কী ছেলে ছিলো তার, কী প্রতিপত্তি ছিলো আফিসে ! বড়োসাহেব নাকি প্রভাসদা'র কথায় উঠতো বসতো, নিজে ভুল ভুল ইংরিজি লিখে সংশোধন করাতে দিতো প্রভাসদা'র কাছে। প্রভাসদা'র মতো নির্ভুল আর নিশ্ছিদ্র ইংরিজি কথা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা সারা আফিসে একজনেরও ছিলো না। বেঁচে থাকলে যে ভয়ানক একটা কেষ্ট-বিষ্টু কিছু হতেন—সন্দেহ নেই—এই সব নানা কথা।

সত্যিই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিলো বেচারার।

নিয়তির মতো এমন নিষ্ঠুর পরিহাস রসিক আর কে আছে ?

উঠি উঠি করছি—হঠাৎ তীব্র আর তীক্ষ্ণ একটা চীৎকারের শব্দে চমকে উঠলাম। এ চীৎকারের স্বরূপ চিনতে অন্ততঃ বাঙালীর ছেলের ভুল হয় না। —চিরন্তনী সুর !······শোক প্রকাশের উদ্দাম উন্মাদ পন্থা।

প্রথমে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার আছড়ে এসে আঘাত করলো কানের পর্দাকে, তারপর হৃৎপিণ্ডটাকে যেন মোচড় দিয়ে দিয়ে ধ্বনিত হ'তে থাকে করুণ কাতর অবুঝ বিলাপবাণী।······যা হবে না, যা হয় না, যা বিধাতার রাজ্যে একমাত্র অসম্ভব ব্যাপার, সেইটার জন্যেই বুদ্ধিহীন প্রার্থনার আকুলি-বিকুলি। ···পলাতক প্রিয়জনের উদ্দেশে অন্ততঃ "একটি বারের জন্যও" ফিরে আসবার ব্যর্থ অনুরোধ, সমস্ত শব্দ জগৎ থেকে চয়ন করা সকরুণ শব্দরাশিতে গঠিত অন্তহীন মিনতি, তরঙ্গের পর তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে··· শিহরণ ধরিয়ে দিলো সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে।

এ শব্দ চিনতে ভুল হয় না।—

কিন্তু এ শব্দ তো প্রবোধকাকার বাড়ীর ভিতর থেকে আসছে না! খানিকটা দূর থেকে যেন!—

এমন অকস্মাৎ আবার কার কি হলো!

কোথায় কোন্ প্রবাসে গচ্ছিত ছিল কার বুকের কল্‌জে? কার কোন্ সৌভাগ্যবতী কন্যা নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাচ্ছিলো পতিগৃহে?

একটা টেলিগ্রাম এসে উপড়ে দিয়ে গেলো বুকের শিরা? ছিঁড়ে দিয়ে গেলো কল্‌জের যোগসূত্র? না কি একখানা পোস্টকার্ড এসে জানিয়ে দিয়ে গেলো সৌভাগ্যবতীর সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হওয়ার সংবাদ?

এ যে নতুন শোক বলেই মনে হচ্ছে।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে প্রবোধকাকার দিকে তাকালাম, কিন্তু কই উনি তো চমকালেন না? শুনতে পান নি? তা' কি সম্ভব? না কি নিজের শোকে এতোই আচ্ছন্ন যে কানের সীমানা ছাড়িয়ে মনে প্রবেশ করেনি?

আর একবার কান খাড়া করে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কণ্ঠস্বর বুঝতে পারি না। কে? কে?

প্রশ্ন না করে পারি না,—অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করি—ও কি? প্রবোধকাকা হতাশ বৈরাগ্যের নির্বিকার হাসি হেসে বলেন—আর কি! ও বাড়ীর নতুন-বৌমার চেঁচানি! মেয়েমানুষ, তবু খানিকটা হাউচাউ করে বুকের ভার লাঘব করে।

প্রবোধকাকার ভাষ্যে অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে পড়ে যাই। 'নতুনবৌমা' অর্থাৎ নতুনখুড়ী, প্রবোধকাকার মৃত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বিধবা। বহুদিনাবধিই হাঁড়ি এবং বাড়ী দুইই আলাদা। আর নতুন খুড়ীতো প্রায় প্রভাসদা'রই সমবয়সী!

প্রভাসদা'র মৃত্যুশোকজনিত "বুকের ভার" লাঘব করবার জন্যে তাঁর এই বুকফাটা চীৎকারটা বেশ স্বাভাবিক কি? প্রবোধ খুড়ীমা ত পৃথিবীর জ্বালা জুড়িয়ে অনেক কাল চলে গেছেন, তাঁর অভাবে গৃহস্থের 'লক্ষ্মী ষষ্ঠী ঘেঁটু মনসা'র দায়টা না হয় নতুন খুড়ীই ঘাড়ে করে নিয়েছেন রীতি বজায় রাখতে। তাই বলে—তাঁর পুত্রশোকের কান্নার ভারটাও নেবেন?

প্রবোধকাকা বোধ হয় আমার 'অন্ধকার অবস্থাটা' কিছু বুঝতে পারেন, তাই ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলেন—তুমি বুঝি ওবাড়ীর খবরটা শোনোনি?

—না তো!

প্রবোধকাকা ম্লান হাসি হেসে বলেন—শোনোনি? শুনবেই বা কি? বলতেও ধিক্কার আসে লোকের—সুব্‌লোটাও তো গেলো!

'সুব্‌লো'! অর্থাৎ সুবল!

সেই হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান ছেলেটা! 'গেলো' মানে? মারা গেলো?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। নতুন খুড়ীমার একমাত্র সন্তান যে! আর সে কি যাবার ছেলে? অবিশ্যি 'হীরের টুক্‌রো'ও নয়, পাড়ার সেরা রত্নও নয়, আকাট মুখ্যু গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলেটা, কিন্তু স্বাস্থ্যটা যে দেখবার মতো ছিলো ছেলেটার! গেলো রবিবারেও যে দেখে গেছি—'কালীতলার' ওখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে পাড়ার গুণ্ডামার্কা ছেলেগুলোর সঙ্গে। সেই আড়ে-দীর্ঘে প্রকাণ্ড দেহটা কর্পূরের মতো উবে গেলো?

মিনিট দুই চুপ করে থেকে প্রশ্ন করি—কি হয়েছিলো?

—কিছুই নয়, একদিনের জ্বরে। ডাক্তার বদ্যি দেখাতেও সময় পেলো না। হতভাগা হোক—যাই হোক—নতুনবৌমার তো ওই একটাই ছিলো, এই বড়ো কষ্টের কথা।

খুবই বিষাদপূর্ণ মমতার সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করেন বটে প্রবোধকাকা, তবু মনে হয় কোথায় যেন লুকোনো রয়েছে সূক্ষ্ম অবহেলা। যেন আপসোস নয়—শুধু করুণা। পুত্রশোকাতুরা বিধবা ভ্রাতৃবধূর প্রতি একটু করুণা করলেই যথেষ্ট। তার পুত্রশোকের তুলনা করা যায় না নিজের সঙ্গে।

আর সত্যিই তো—প্রবোধকাকার বিরাট ক্ষতির কাছে নতুন খুড়ীমার ক্ষতি-টুকু? তুলনা সম্ভব? সমুদ্রের সঙ্গে গোষ্পদের তুলনা হয়?···প্রভাসদা'র সঙ্গে সুব্‌লোর? যে ছেলে জন্মে একমুঠো ভাত মাকে দিতে পারতো কিনা সন্দেহ!

ধীরে ধীরে উঠে পড়ি।

প্রবোধকাকা বলেন—উঠলে? এসো বাবা আবার আসছে রবিবারে। তবু তোমাদের দেখলেও একটু শান্তি হয়।···ওবাড়ীতেও ঘুরে যাবে নাকি একবার? অবিশ্যি রাত বিস্তর হয়ে গেছে। না হয়—পার তো কাল সকালে।

আর গিয়েই বা করবে কি, শুনতে পাই নাকি অতিরিক্ত অধীর হয়েছেন বৌমা, যে যাচ্ছে, তার সামনে কেঁদে কেটে বুক চাপড়ে একাকার করছেন একেবারে। মেয়েজাতের স্বধর্ম।

বলেন বটে "মেয়েজাতের স্বধর্ম", তবু কথার ধরনে স্পষ্টই ধরা পড়ে নতুন খুড়ীমার অধীরতাটা অসঙ্গত বাড়াবাড়ি। সুবলের মতো ছেলের জন্য এতোটা করা শোভা পায় না।

হয়তো প্রবোধকাকার হিসেবই ঠিক। বাড়ী ফিরে ঠিক ওই কথাই তো শুনলাম!

এই নতুন খবরটা আবার মাকে কি করে দেবো তাই ভাবতে ভাবতে সারাপথ আসছি, কি ভাবে আরম্ভ করা যাবে কথাটা? যে রকমই ভেবে ঠিক করি—বলে ফেললাম বাড়ী ঢুকেই ধাঁ করে। বললাম—পাড়ায় এসব কি হতে আরম্ভ করলো মা? আরও কী কাণ্ড হয়ে গেছে ওপাড়ায় জানো? নতুন খুড়ীর—

মা চমকে ওঠেন না, সুস্থির ভাবে বলেন—সুবলের কথা বলছিস?

—শুনেছো?

—শুনবোনা না তো আর যাবো কোথায়? বসে বসে সবই শুনছি। ও তো আগেই গেছে। সুবল গেলো মঙ্গলবার ভোরে, আর প্রভাসের খবর এলো পরশু—বেস্পতির সকালে।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলি—কই একথা তো বলোনি আমাকে? নতুন খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করা হোল না! রাত হয়ে গেলো—

—আর দেখা করা! করেই বা কি হবে ছাই! দেখা করা তো আমারও হয়নি, সেদিনকে ষষ্ঠী ছিলো—নানান কাজ, পরদিন কি বিষ্টি! বাড়ীর চৌকাঠ পেরোনো গেলো না, তারপর দিনই তো প্রবোধ ঠাকুরপোর বাড়ী ওই বজ্রপাত!

কথাটা শুনে কেমন ভালো লাগলো না, বোধ হয় একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলি—তা' ওখানে তো গিয়েছিলে, হাতের কাজ ফেলে—তক্ষুণি! ওখান থেকে নতুন খুড়ীর বাড়ীটা তো পঞ্চাশ গজ দূরও নয় বোধ হয়।

—তা'তো বুঝলাম, কিন্তু সব ছিষ্টি ফেলে-ছড়ে বৌমার ঘাড়ে দিয়ে চলে গেছি! কচি ছেলের মা, ছেলে কাঁদিয়ে কাজ করা, আর দেরী করতে পারি?

যেন "বৌমার ঘাড়ে সব ছিষ্টি চাপিয়ে দিয়ে" বেরোনো তাঁর এই প্রথম! যেন "কচি ছেলে কাঁদিয়ে" কাজ করার দৃষ্টান্তটা নিতান্তই বিরল।

—যাওয়া উচিত ছিলো—গম্ভীর ভাবে বলি।

বলাবাহুল্য এ গাম্ভীর্যে লেশমাত্র অপ্রতিভ করা যায় না মাকে। অবহেলা-ভরে উত্তর দেন—হয়েছে, তোমার আর আমাকে উচিত অনুচিত শেখাতে আসতে হবে না।···একটু সুস্থির হোক, যাবো অখন একদিন। শুনছি নাকি এই পাঁচদিন ধরে চেঁচানির তিলার্ধ বিরাম নেই। পাড়ার পাঁচজনে ঢের বলেছে —উঠে নাইতে, জল মুখে দিতে। শুনবে না—কাঠকবুল। কদিন চালাবি এ রকম? পাঁচদিন পারবি—ছ' দিন পারবি—ছ' মাস তো পারবি না? তবে? ···আর দেখেও তো শিক্ষা হওয়া উচিত? কী রাজা ব্যাটা গেলো তোর ভাসুরের, কই কতো অধৈর্য হচ্ছে? ধীর স্থির শান্ত।···তুই অতো অধৈর্যপনা করলে লোকেরই বা ভালো লাগবে কেন? পাড়ার লোকের ওপরই তো ভরসা? সংসারে তোর আছে কে? ভূত বাঁদর যাই হোক, যেটুকু ছিলো তাও তো গেলো!

আহতভাবে বলি—নতুন খুড়ীমার ওই একমাত্র সন্তান মা, রাজা বাদশা না হলেও নতুন খুড়ীমার প্রাণে কিছু কম লাগেনি। মায়ের প্রাণ—

—তা জানি—মা বিরস ভাবে বলেন—সে কথা আর হুঁশ করিয়ে দিতে হবে না আমাকে। তবু—এও বলি, সন্তানের কর্তব্য করলে তবেই না সন্তান? ও ছেলের কাছে আর কি পিত্যেশ ছিলো নতুন বৌয়ের?—মরলে মুখে আগুন-টুকু ছাড়া? মায়ের মুখে এক গরস ভাত তুলে দেবার ক্ষ্যামতা ওর কখনো হতো?···অবিশ্যি 'নাড়ীর জ্বালা' যাবে কোথায়, তবু লোকসানের কম-বেশী আছে বৈকি। প্রবোধ ঠাকুরপোর কথাটা ভাব দিকিন? কী রাজার হালে ছিলেন ইদানীং? সবই তো ওই প্রভাসের দৌলতে। মাস গেলে চারশো সাড়ে চারশোখানি টাকা বিনাবাক্যে পাঠিয়েছে। ঠাকুরপোর 'ক্ষেতি'র তুলনা হয়?

আর কিছু বলতে পারি না।

বলবার কিছু ছিলও না। সত্যি ক্ষতির পরিমাপ না করে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির বশে চলতে চাইলে—পাঁচজনে সহ্য করবে কেন? কি করতে তবে 'আদিখ্যেতা' শব্দটার সৃষ্টি হয়েছিলো?···পুঁতির মালা হারিয়ে সোনা

হারানোর খেদ করা শিশুর পক্ষে শোভন হতে পারে, সংসারী জীবের পক্ষে অমার্জনীয়—অশোভন।

বেকার বাউণ্ডুলে ছেলেটাকে, শুধু চীৎকারের জোরে 'হাজার বারোশো'র ওপর তুলে ধরা যায় কখনো? তোমার শোকের গভীরত্ব কেউ তোমার বুক চাপড়ানোর বহর দিয়ে মাপবে না।

'হাজার বারোশো'র স্বপ্নও কখনো দেখিনি, পৌনে দু'শোটা দু'শোয় গিয়ে ঠেকলেই পরমার্থ লাভ হয়, এমনই একটা ধারণা আছে মনে মনে। কিন্তু নিজের দামটা তো কখনো কষে দেখিনি! খেয়ালই হয়নি।

মার কাছে প্রশ্ন করে দেখবো—সেই পৌনে দু'শোর জন্যে কতোটুকু অধীর হওয়া শোভন? সীমারেখাটা টানা হবে কোথায়?

কিন্তু না থাক!

গ্রীনরুমের ভিতর উঁকি মারবার প্রয়োজন কি? আমাদের কাজ তো আলোকোজ্জ্বল মঞ্চটুকু নিয়ে। জেনে ফেলে লাভ কি—কার কতোটুকু রঙ নিজস্ব, কার চুলের রাশি ভাড়াকরা পরচুল!

মোহভঙ্গের লোকসানটা কি সোজা?

আবেদন

রাধি, এই রাধি, বলি আছিস কোন্ চুলোয়? বেঁচে আছিস—না মরেছিস?

অনেকগুলো ছাপ-মারা একখানা পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে, বিনয় ভট্‌চায্ চটি জুতোর শব্দ করতে করতে বাইরে থেকে ভেতর বাড়ীর দালানে এসে আদরের ছোট বোনটিকে এই স্নেহসম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।

মেটে উঠোনের ওদিকে রান্নাঘর।

স্নেহময় দাদার আহ্বানে পুলকিত রাধারানী বেরিয়ে আসে গরম খুন্তিখানা হাতে নিয়ে। অবিশ্যি দাদাকে ছ্যাঁকা দিতে নয়, বোধ করি হাতে একটা হাতিয়ার থাকলে জিভটা খোলে ভালো বলেই।

খোলা জিভেই উত্তর দেয় সে—মরবো! তোমার সংসারে মরবারই বড়ো ফুরসত আছে যে! বলি—সক্কালবেলাই গাঁজা টেনে এলে নাকি মেজদা? ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছো কেন?

—চেঁচাচ্ছি কেন? বলে কি না চেঁচাচ্ছি কেন! এই দেখ কেন চেচাঁচ্ছি! এ রকম চিঠি পড়লে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে; তা' চেঁচানো!

হাতের পোস্টকার্ডখানা বোনের দিকে ছুঁড়ে দেন বিনয় ভট্‌চায্।

—কোন্ যমের বাড়ী থেকে আবার 'রাধারানী দেবী'র নামে চিঠি এলো—বলে ঈষৎ কৌতূহলে চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই ফেলে দেয় রাধারানী, মুখটা যতোটা বিশ্রী করা সম্ভব, তা' করে বলে—মরণ আর কি! এ আবার কোন্ মুখপোড়ার চিঠি?

—তুমিই জানো—বিনয় ভট্‌চায্ 'পরম পুরুষে'র ভঙ্গীতে দুই হাত উল্টে বলেন—তোমার শ্বশুরকুলের সব্বাইকে তো চিনে রাখিনি আমি!

—আর আমিই একেবারে মশামাছিটিকে পর্যন্ত চিনে রেখেছি যে—রান্নাঘরে ফিরে যেতে যেতে কথাটাকে যেন দাদার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে যায় রাধারানী—তোমার কথা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় মেজদা!

জ্বলে যাবারই কথা!

নিতান্ত কটুভাষী রগচটা লোক হলেও এ বোধশক্তিটুকু আছে বিনয়ের, তাই আর কিছু বলেন না।

বিয়ের অষ্টমঙ্গলার ভেতরই বিয়ের শাঁখা দু'গাছা ভেঙে মা-বাপের কাছে ফিরে এসে কায়েম হয়েছিলো রাধারানী তেরো বছর বয়সে, সে-ও আজ তেরো-চোদ্দ বছরের কথা।

ক্রমশ মা-বাপ মরেছে, বড়ো ভাই বিধবা বোনের দায়িত্ব ত্যাগ করেছে—স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশত্যাগ করে; রাধারানী এই মেজদার গলায়। শ্বশুরবাড়ীর ছায়াও মাড়ায়নি কখনো। ওপক্ষও অবশ্য এই 'বিষকন্যা'কে এই অবধি সযত্নে পরিহার করে চলেছে।

তা'বলে—'গলায় পড়ে আছে' বলে 'চোর' হয়ে আছে রাধারানী, এমন ভাববার কারণ নেই। এক-গা গহনা, মা-বাপ মায়া করে খুলতে দেয়নি। তারা মরতে, সবগুলো খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে রাধারানী দাদার পুরনো নরুণপাড় ধুতিগুলো প'রে 'দজ্জালি' করে বেড়ায়, আর ছুতো পেলেই ভাই-ভাজের মুখের সামনে মাজা-মাজা লম্বা-লম্বা হাত দু'খানা নেড়ে দু'শো কথা শুনিয়ে দেয়। ভাইপো ভাইঝি দু'টোকে ভালো যদি বাসে তো সে অন্তঃশীলা, ব্যাবহারিক দৃশ্যে শুধু পাঁশ পেড়ে কাটতে বাকি রাখে। ভাজের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়।

বলাবাহুল্য ভাজও মাটির মানুষ নয়, পেরে ওঠে না কেবল ক্ষমতার অভাবে। বাক্‌বিন্যাসের ক্ষমতায় তো ননদের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না, কার্যক্ষমতাও কম। রাগ হলে ছেলে ঠেঙায়, আর ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা কয়।

রাধারানী বেশী কথা বলে না, কিন্তু যা বলে মোক্ষম!

'চিঠি-পর্বের' সময় বাড়ী ছিল না চারুলতা, ঘাট থেকে ফিরে এসেই 'রাধারানী দেবী'-চিহ্নিত পোস্টকার্ডখানা দাওয়ায় পড়ে থাকতে দেখেই দুই চোখ গোল হয়ে উঠলো তার। এ আবার কি অভূতপূর্ব দৃশ্য! বারো বছর এ সংসারে এসেছে সে, এমন দৃশ্য তো কই দেখেনি!

ভিজে হাতখানা ভিজে শাড়ীতেই মুছে চিঠিটা তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বিলম্বিত ছন্দে বলে—এ যে

দেখি 'অস্মরণ রাজার স্মরণ' হয়েছে! এবারে—তা'হলে আমাদের মায়া কাটিয়ে শ্বশুরবাড়ী চললে ঠাকুরঝি ?

ঠাকুরঝি একনজর মাত্র তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে—কাতর হয়ো না মেজবৌ, তোমাকে চণ্ডীতলার শ্মশানে তুলে না দিয়ে এ সংসার থেকে নড়বো, এমন বেআক্কেলে আমি নই।

—চণ্ডীতলায় আমার শত্তুর যাক—বলে ঠিকরে চলে যায় চারুলতা! আর কথা বাড়াতে সাহস হয় না।

উঃ কিছুতেই কি তার জিত হতে নেই ?

যতো গুছিয়ে, যতো কায়দা করেই ছোট্ট একটু কামড় দিতে যাক বেচারা, কি করে যে সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব বার করে ফেলে রাধারানী, আর সে এমন বিষাক্ত জবাব, যে চারুলতার বুদ্ধির ভাঁড়ারে তার প্রতিষেধক নেই।

অথচ রাধারানী অনায়াসে তার কামড়টা তো ফিরিয়ে দেয়ই, তার সঙ্গে নিজে একটি মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিতে ছাড়ে না।

খেতে বসে বিনয় ভট্‌চায্‌ আবার সেই কথা তোলে—বলি চিঠির একটা উত্তুর দিবি তো রাধি ?

—কেন, ভূতে পেয়েছে না কি ? বলে পাতের গোড়ায় আমড়ার টকের বাটিটা ঠক্ করে বসিয়ে দেয় রাধারানী।

বরকে চারুলতার খুব বিশ্বাস নেই, তবু পৃষ্ঠবল হিসেবে ওর সামনে বলে নেয় এক আধটা কথা। কিছু না পেয়ে বলে—বাটিটা পাথরের ঠাকুরঝি, তোমার মেজাজের ঘা সইতে পারবে কেন ?

—না পারলে আর করছি কি মেজবৌ, ঘটিবাটি তো আর 'অমর' বর নিয়ে আসে না সংসারে!

মেজবৌ রাধারানীর অনুকরণে ঠাণ্ডাগলায় বলে—সে তো দিনরাতই দেখছি ঠাকুরঝি, তবে মেজাজটা একটু নরম করলে গেরস্তর লোকসানটা কিছু কম হয়।

রাধারানী পাখাখানা নিয়ে ভাইয়ের সামনে বসে পড়ে মধুঢালা সুরে বলে—গেরস্তকে দরদ করতে গেলে কি সংসার করা যায় বৌ ? এই যে—তোমার, একটা পেট ভরাতে তিনটে মান্‌সের খোরাক লাগে, সে দরদ কে করতে যাচ্ছে বলো ?

কথাটা নিদারুণ সত্য !

চারুলতার—আহারের পরিমাণটি নামের অনুরূপ নয়। আবার রাধারানী নেহাত অল্পাহারী।

সত্যি হলেও—মেয়েমানুষকে খোরাকের খোঁটা, তা'ও আবার 'দেনে-ওয়ালা'র সামনাসামনি !

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে নিজস্ব ভোঁতা ভাষাই ব্যবহার করে বসে চারুলতা। বলে—খাই বেশ করি, আমি তো কারুর বাপের খাই না।

রাধারানী অমায়িক হাস্যে বলে—আমার তো সেই ধারণাই ছিলো মেজবৌ। তলে তলে তালুইমশাই যে মেয়ের খোরাকী পাঠান তা তো কই খবর পাইনি।

এরপর আর কি বলবে চারুলতা !

এমন দুর্ভাগ্য যে স্বামী কক্ষনো তার পক্ষ নেবে না। এই তো এখন কি বোনকে দু'কথা বলতে পারতো না? তা নয়—আদরে গলে গিয়ে বলা হলো—নাঃ দুটোতে একজায়গায় হয়েছে কি ঠোকাঠুকি! আপদটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

যেন ভারি একটা অসম্ভব হাস্যকর কথা! যেন বিধবা মেয়েমানুষ কেউ কখনো শ্বশুরঘর করে না, চিরকাল ভাই-ভাজের ঘাড় ভাঙে !···বোনও আনন্দে গলে বলেন—তাই দাও না, আমারও তো তা'হলে হাড় জুড়োয়।

বিনয় ভট্‌চায্‌ পরিতৃপ্ত আহারের প্রসন্ন মুখে বলেন—লিখে দে দু'কলম, বিকেলের ডাকে দিয়ে দিই। "অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না, দুঃখিত" এই আর কি।

আত্মসম্মানবোধহীন চারুলতা আবার ফোড়ন কাটে—কেন? 'অনুরোধ রাখিতে না পারার'ই বা কি আছে? গেলেই তা'রা খেয়ে ফেলবে? বলেছে যদি বা—ঘুরে এলেই হয় কিছুদিন। মেয়েমানুষের এক-দুয়োরি হয়ে থাকাই কি খুব মান্যের?

রাধারানী উত্তর দেওয়ার আগেই বিনয় ভট্‌চায্‌ বকে ওঠেন—বাজে বোকো না মেলা। রাধির আবার শ্বশুরবাড়ী! তাই আবার ও যাবে। শহরে হলে বাপ মা আবার বিয়ে দিতো ওর।

—তোমরাই বা তাই কেন দিলে না? বলে মুখ টিপে হাসে চারুলতা।

তার চাইতে ঝাঁঝাঁলো টেপাহাসির সঙ্গে রাধারানী বলে—

—পরামর্শদাতা মন্ত্রীর অভাব ছিলো তখন, তাই হয়ে ওঠেনি বৌ।

আর চারুলতাকে অপদস্থের একশেষ করে বিনয় ভট্‌চায্‌ বলে ওঠেন—যেমন নীচ মন তেমনি ইতর কথা! নিজের শাড়ীচুড়ি আর মাছের হ্যাজা ঘুচলে, তবে—কুকুরের উপযুক্ত মুগুর হয়।

মুগুরটা আগে কার মাথায় পড়লে তবে এমন ঘটনাটা ঘটা সম্ভব সেটা আর ভাবেন না ভদ্রলোক।

—দুর্গা! দুর্গা! বলে রান্নাঘরে ফিরে যায় রাধারানী, আর চারুলতা রাগ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাধারানীর শ্বশুরবাড়ীর কথাটা আজকের 'নিমিত্ত মাত্র,' এরকম ঘটনাটা নিত্য-নৈমিত্তিক। এরপরে অবশ্য রাধিই গিয়ে ডেকে এনে খাওয়াবে। তবে এখুনি নয়, চারুলতাকে চরম অবস্থায় পৌঁছতে দিয়ে।

বারোটা বেজে গেলে আর না খেয়ে থাকতে পারে না চারুলতা। মাথা ঝিমঝিম করে, হাতে পায়ে খিল ধরে।

এরকম দিনে ততক্ষণ রাধারানী কাজ সারে।

দৈনন্দিন পর্ব মিটলেও উপরিগুলো আছে। সুপুরি কাটা, মুগকড়াই ভাঙা, চালডাল ঝাড়া, নিদেনপক্ষে কাঁথা সেলাই।

আজ কিন্তু ওদিক দিয়ে গেলো না রাধারানী। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে এসে, সেই অবহেলিত পোস্টকার্ডখানা নিয়ে উঠে গেলো ছাতে।

মেঘলা দিন!

পড়শীমহলে ছাতে ওঠার প্রয়োজন আর কারো নেই। বড়ি আচার আমসত্ত্ব কাঁথাকানি—এই জন্যেই না ছাতের দরকার?

রাধারানীরই বা কবে কোন্‌কালে মেঘলা দিনে ছাতে ওঠার প্রয়োজন হয়েছিলো?

আজই বা কিসের প্রয়োজন?

কিছুই না! শুধু—ফেলে-দেওয়া জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ছে ত—একটু চক্ষুলজ্জা! অথচ কৌতূহলও হচ্ছে। তখনই যদি পড়তো ভালো করে, বালাই চুকে যেতো।

মুখরা রাধারানীর সঙ্গে চক্ষুলজ্জাটা বেমানান। কৌতূহলটা আরো বেশী।

সে বোধটা ওর নিজেরই আছে বলেই বোধ হয় লোকলোচনের অগোচরে পালিয়ে এসেছে। দেখতে এসেছে 'স্নকুমার চক্রবর্তী' কে? 'নবকুমার চক্রবর্তী'র সঙ্গে যার নামের সাদৃশ্য ধরা পড়ে!

জ্ঞাতিদের কেউ। তাছাড়া আর কে?

নিজের দ্যাওর ভাস্থর নয়। তাদের নামগুলোও মনে আছে ঠিকই—'রাজকুমার' 'দেবকুমার'—'কুমারের' গোষ্ঠী একেবারে!

চিঠিখানা বার দু'তিন পড়ে ফেললো রাধারানী। এমনই! হাতে কাজ না থাকলে এমন করেই থাকে মানুষ।

তিন পুরুষের জ্ঞাতি জ্যেঠ্শ্বশুরের ছেলে। বিদ্যে সাধ্যি যে অষ্টরম্ভা, চিঠির ভাষাতেই মালুম হচ্ছে। তবে লিখেছে ইনিয়ে বিনিয়ে, রাধারানীকে নিয়ে যেতে চায়।

অবশ্য বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে ডাকেনি, ডেকেছে নিছক স্বার্থের খাতিরে।

"মা মরণাপন্ন, সংসারে নিতান্ত লোকাভাব, অথচ তাঁহার 'নিষ্ঠা কাষ্ঠার' বাতিকের জন্য রাঁধুনী চাকরানী অচল। আজ যদি তাঁহার নিজের পুত্রবধূ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে আর রাধারানীকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু রাধারানীও চক্রবর্তী-কুলের বধূ তো বটে। অতএব যদি রাধারানী—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অবশেষে এটুকুও লিখতে ছাড়েনি—রাধারানীর জীবন তো অসার্থকই গেলো, জ্যেঠ্শাশুড়ীর সেবারূপ পুণ্যকার্যেও কিছুটা সার্থক হোক।

—দায় পড়েছে!

আপন মনে এটুকু উচ্চারণ করেই হেসে ওঠে রাধারানী।

'চক্কোত্তি কুলের বৌয়ের' ওপর দরদ উথলে উঠলো এতোদিনে। দায়ে পড়ে 'রায়মশাই'। কই তোর বিয়েতে ডাকতে আসিসনি তো?...বাপের শ্রাদ্ধর ভোজে তো বলিসনি? রাধারানী এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর ভাতজলে ভাগ বসাচ্ছে কি না, জানিস সে খবর?...এখন ওনার মা মরছে—লোকাভাব, তাই 'কন্না' করতে ডাকতে মনে পড়েছে!

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় রাধারানী।

মেঘলা দুপুরে—বেলা বোঝা যায় না। চারুলতা যে রাগ করে না খেয়ে শুয়ে আছে তাও মনে পড়ে না! সময়ের এমন অলস অপব্যয় রাধারানীর

জীবনে বোধ করি প্রথম। অন্যদিন হলে—কিছু না হোক ভাঁড়ারের হাঁড়িকুড়িগুলোও পেড়ে ঝাড়ামোছা করতো।

আজ মনে হচ্ছে কোনোদিন বুঝি ছাতে ওঠেনি।…মেঘলা দুপুরে নির্জন ছাতের কেমন যেন একটা মাদকতা আছে।

অনেকখানি শূন্যতা।

তবু যেন একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগানো শরীরী স্পর্শ!

ষোলো, আঠারো, বাইশ সমস্ত বয়সগুলো পার করে এসে, ছাব্বিশ বছর বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো রাধারানী নির্জন ছাতের একটা রহস্যময় আত্মা আছে!…তার স্পর্শ পাওয়া যায়। সে স্পর্শ মনকে অকারণ উচাটন করে তোলে।

জীবনভোরই তো ছাতে আসছে। বড়ি আচার আমসত্বের প্রয়োজন বাদেও, ভিজে চ্যালাকাঠ ছড়িয়ে শুকোতে দিতে, সারাবছরের জন্যে কেনা মুগ কলাইয়ে পোকা লাগলে রোদে দিতে, ভাইপো ভাইঝির অকর্মজনিত ভিজে লেপ তোশক বিছিয়ে দিতে, প্রায়ই তো আসতে হয়।…শুধু আসতে হয়নি—মেঘলা দুপুরে। নাঃ কোনোদিন আসেনি।

তাই এই অদ্ভুত রহস্যটা অনাবিষ্কৃত ছিলো রাধার কাছে।

না কি নিজেরই অনাবিষ্কৃত রহস্যময় আত্মাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললো রাধারানী?

—পিসি, তুমি এখানে?…'রক্ষে' এসে গালে হাত দিয়ে দাঁড়ায়!

সাত বছরের মেয়ে হলে কি হবে, চলনে 'বলনে' সতেরো বছরের ধাক্কা ধরে। রঙটা ময়লা, মাজা-ঘসা করলে হয়তো উজ্জ্বল শ্যামে দাঁড়াতো, তবু পিসি সোজাসুজি 'রক্ষেকালী'ই বলে।…'রক্ষেকালী' একটু দম নিয়ে বলে—আমি তোমাকে সাত রাজ্য খুঁজে বেড়াচ্ছি!

রাধারানীর আবার হৃদয়রহস্য! রাধারানীর আবার আত্মা!

হাসি রাখবার জায়গা কোথায়!

এলো চুলগুলো আঁট করে জড়াতে জড়াতে কটু কষায় তিক্ত—এই ত্রিরসজারিত কণ্ঠে ভাইঝির কথার উত্তর দেয় রাধারানী—কেন? আমাকে তোর কি দরকার পড়েছে? এখুনি জঠরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলে উঠেছে? পেট তো নয়,

রাবণের 'চিলু'! জ্বলেই আছে! হবে না কেন? যেমন মা তেমনি ছাঁ।

'রক্ষে' পিসির স্টাইলেই হাত মুখ নেড়ে বলে—আমি আবার কখন খেতে চাইলাম? মার যে খিদেয় হাতে পায়ে খিল ধরছে! ইস্কুলবাড়ীতে ছুপুর-ঘণ্টা বেজে গেলো!

ওঃ চারুলতা খায় নি!

মুহূর্তে মনটা 'আহা' করে উঠলেও, হৃদয়ের সে 'আহা' রাধারানীর কথায় ধরা পড়ে না। মুখটা বাঁকিয়ে বলে—শুধু খিল কেন, শেকল ছিট্‌কিনি সব পড়ে যাক না তোর মার হাতে পায়ে জিভে।...ঠ্যাকার করে বিছানায় অঙ্গ ঢেলে পড়ে থাকতে পারেন মহারানী, হাঁড়ি থেকে ভাত ঢেলে নিয়ে গিলতে পারেন না?

—আমি ওসব জানি না বাবা, মা বললে তাই বলতে এসেছি—বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় রক্ষেকালী।

বাপ বলে—'ছোট রাধি'।

খুব মিথ্যে বলে না।

নিচে নেমে চিঠিখানা নিজের ঘরে উঁচু তাকে ফেলে রেখে ভাত বাড়তে বসে রাধারানী, ভাজের আর নিজের।

ঠিকানার জন্যে চিঠিটা রাখা, নইলে ও চিঠি আগুনে পোড়ালে রাগ মেটে না।

* * * *

কিন্তু উত্তর দেবার জন্যে যে ঠিকানার আর দরকার হবে না, পরদিনই যে লেখক নিজেই সশরীরে এসে হাজির হবে—একথা কে ভেবেছিলো।

বিনয় ভট্‌চায্‌ আবার চটি চটপট করতে করতে এসে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে চাপা গর্জনে ফেটে পড়েন—রাধি, এই রাধি, কি আমার 'ছেরাদ্দ'র পিণ্ডি রাঁধছিস? বেরিয়ে আয় ঘর থেকে!

—আবার আজ কি হলো? চেঁচাচ্ছো যে রাক্ষসের মতন?

—না চেঁচাবো কেন, আশাবরী সুর ভাঁজবো! 'পই' 'পই' করে বললাম কাল, ছু'কলম লিখে ফেলে দে ডাকে—কানেই নেওয়া হলো না। নাও এখন ঠ্যালা সামলাও!

রাধা অবাক্ হয়ে বলে—কিসের ঠ্যালা ?

—কেন, তোমার সাত কালের শ্বাওর একেবারে এসে হাজির হয়েছেন ! চিঠিটা লিখে দিলে আর এই বিপদটি হয় না—

রাধারানী স্থির আত্মস্থ ভাবে বলে—কাল বিকেলের ডাকে চিঠি দিলে আজ সকালে ওর আসা রদ হতো, একথা গোপ্লাকে বোঝাও গে মেজদা ! আমাকে বোঝাতে এসো না।

কথাটা বিনয় ভট্চাযেরও যে জানা নয় তা নয়, তবু 'বিপদ' 'মুশকিল' 'লোকসান' এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারগুলো ঘটে গেলে একটা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলেই যেন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

—আচ্ছা আচ্ছা জানি—বলে বোনকে এক তাড়া লাগিয়ে ভট্চায্ প্রশ্ন করেন—এখন ও যে বলছে রোগা মাকে একলা রেখে এসেছে—ছুটো পঁয়তাল্লিশের গাড়ীতে যাবে।

রাধা অবহেলাভরে বলে—তা' যাক না। বারোটার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে আমার।

—ধেত্তারি তোর রান্নার নিকুচি করেছে ! রান্নার জন্যে, কি আমার ছেরাদ্দ আটকাচ্ছে শুনি ? কথা হচ্ছে তোর যাবার—

—সে কথাও হচ্ছে নাকি ? বিদ্রূপের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে রাধারানীর চোখে মুখে।

বিনয় ভট্চায্ অবাক্ভাবে বলেন—তবে আর ও এসেছে কি করতে ? তোকে নিয়ে যাবে বলেই তো—

—যাবে বুঝি ? ওঃ ! ভেবেছে বোধ হয় বেওয়ারিশ মাল বৈ তো নয়, রাস্তায় পড়ে আছে, কুড়িয়ে নিলেই হলো।

হঠাৎ যেন সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে ভট্চাযের। তেড়ে উঠে বলেন—বোধ হয় তাই ! রোসো আমি গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি বাছাধনকে—বিনয় ভট্চাযের বোন অতো ফেলনা নয় ! সে কারুর বাড়ীতে পা ধুতেও যায় না। নিয়ে যাবে ! আবদার !···নেহাত নাকি কুটুম্ব, তাই এতোক্ষণ কিছু বলিনি, এবারে এমন শুনিয়ে দেবো, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। 'চক্কোত্তি বংশে'র বৌ বলে 'দাওয়া' করতে এসেছিস ! ভারি আমার সম্পর্ক রে—মরেছে কি বেঁচেছে খোঁজ নিয়েছিস কখনো ?···এখন 'কারে' পড়ে সম্পর্ক বার করতে এসেছিস ! বার করাচ্ছি—

রাধারানী ভ্রূকুটি করে বলে—অসভ্যর মতন চেঁচাচ্ছো কেন মেজদা? চল্লিশ হতেই বায়াত্তুরে ধরতে—এই তোমারই দেখছি! যা বলবে সামনে গিয়ে বলোনা—

—আচ্ছা তাই যাই।

—হয়েছে! খুব বীরত্ব দেখিয়েছো! সে বলা—দু'দণ্ড পরে বললেও চলবে। এখন কুটুম্বুর ভোগের ব্যবস্থাটি কি হবে বলে যাও দিকিন?

বিনয় ভট্চায্ একটু দরাজ হাতের লোক, অতিথ আত্মীয় এলে গেলে খাওয়ান ভালো। সুকুমার আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের ইসারায় আট-বছরের ছেলেটাকে ময়রার দোকানে পাঠিয়েছেন! মাছের খোঁজে নিজে যাবেন এটা নিশ্চিত।

মাঝখান থেকে রাধার প্রশ্নে চারুলতা একটা আপসোসের ভঙ্গীতে ফোড়ন কেটে ওঠে—ও মা, সে কি! ক্ষীর দই মাছের মুড়োর বায়না দেওয়া হয়নি এখনো? কতো ভাগ্যে কুটুমের পায়ের ধূলো পড়েছে!

রাধা মুচকে হেসে বলে—হয়নি তাই তো দেখছি। বোধ হয় শ্বশুরবাড়ীর ধারা শিখছে মেজদা।

চারুলতা আর সহ্য করতে পারে না। অনেক আশা করেছিলো দু'দশ-দিনের জন্যেও যদি বিদেয় হয় রাধা, হাত পা মেলিয়ে বাঁচবে!

ভাইবোন মিলে তো সে আশায় ছাই দিচ্ছেন।

রেগে লাল হয়ে বলে ওঠে—যখন তখন আমার বাপের বাড়ীর খোঁটা তুলো না ঠাকুরঝি, ভালো হবে না। ভাইয়ের ভাতে এতো অহঙ্কার কিসে তাও বুঝি না। এতো মিষ্টি ভাত যে, দু'দিনের জন্যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। কেন, গেলেই হতো?

বিনয় ভট্চায্ 'হাঁ হাঁ' করে বৌকে থামাতেই যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু রাধা দু'জনকেই অবাক্ করে দিয়ে, খুন্তিখানা হাত থেকে নামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে শান্ত নরম গলায় বলে—আচ্ছা, তুমি তা'হলে রান্নাটা দেখো বৌ! ডালে এখনো নুন পড়েনি, মোচায় মসলা মাখা আছে।...গোপ্‌লাটা কোথায় কোথায় ঘুরছে, খাবার খায়নি, ডেকে খাইও।...সুকুমারকে বলে দাও মেজদা, তৈরী হয়ে নিচ্ছি আমি।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে ভট্চায্ বলে ওঠেন—

পাগলটার কথায় তুইও পাগল হবি রাধি? ওর কথা আবার মানুষে ধরে?

—কথা ধরাধরির কথা নয় মেজদা, ভেবে দেখলাম আমার যাওয়াই উচিত। সত্যিই তো আর সম্পর্ক হাত দিয়ে মুছে ফেলবার নয়। আর চিরকালই কি তোমার গলায় পাথর হয়ে বসে থাকবো? বলছে—ভালোই, সেধে তো যাচ্ছি না?

মেজদা বিমূঢ়ভাবে বলেন—আপনার শ্বশুরবাড়ীর লোক বলতো—সে আলাদা, এ একেবারে নিষ্পর বললেই হলো! তোর নিজের দ্যাওর-ভাসুরই বা বলবে কি?

রাধা অল্প হেসে বলে—মুখ থাকলেই লোকে বলে মেজদা? বলবার 'মুখ' না থাকলেও বলে।...আচ্ছা দেখি তোমার দু'খানা ফর্সা থানটান যোগাড় করে বেঁধে নিই। পেড়ে ধুতি দেখলেও আবার লোকে কিছু বলতে পারে।

বিনয় ভট্চায্ বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে থাকেন। চারুলতাকে শাসন করবার কথাও মনে পড়ে না। রাধারানীর কথার যে আর নড়চড় হবে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ট্রেনে তুলে দিয়ে মেয়েমানুষের মতো কাপড়ে চোখ মুছে বিনয় বোনের মাথায় হাত রেখে ধরা গলায় বলেন—জেদ্ করে চললি মুখপুড়ী, বেশী দিন থাকিসনি। তুই বিনে বাড়ীতে টেকা ভার হবে।

—কি যে বলো মেজদা—মুখে হাসি টেনে আর একবার ভাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে রাধা বলে—রক্ষু রইলো, গোপ্লা রইলো—আদরের গিন্নী রইলো তোমার—

আর যে মুহূর্তে ট্রেন চলতে শুরু করে, চির দুর্দান্ত মেজদার অপরাধী-অপরাধী মলিন মুখখানা অদৃশ্য হয়ে যায়, গাড়ীর দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে রাধার!...মন-কেমনের জন্যে নয়, নিজের মনের চেহারা দেখে শিউরে উঠে'।

এ কী সর্বনাশ সে করে বসলো!

কী দুর্মতি হলো তা'র।

নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেই ক্ষান্ত হয় নি শুধু, সরল স্নেহময় বেচারা মেজদাকে অপদস্থের একশেষ করে এলো মিথ্যে ছলনায়!

ছলনাই তো!

চারুলতার ওপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে অভিমানের ভানে ঘর ছেড়ে এলেও নিজেকে কি এখনও বোঝাবে রাধা, কূল ছেড়ে অকূলে পা দিয়েছে সে তুচ্ছ অভিমানের বশে!

চারুলতার ওপর অভিমানে ঘর ছাড়বে রাধা?

চারুলতা তো তার কাছে তৃণ মাত্র!

চিঠিখানা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মন তার উগ্র আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠেনি কি বেরিয়ে পড়বার জন্যে? উন্মুখ হয়ে ওঠেনি এই চিরপরিচিত আবেষ্টনের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে? সেই থেকেই তো মনের মধ্যে চলছিলো—বিদায়ের প্রস্তুতি!

অথচ ক্রমাগতই ঠকিয়েছে ভাই-ভাজকে।

হয়তো—শুধুই ভাই-ভাজকেও নয়—

রাধা কি অকৃতজ্ঞ? রাধা কি হৃদয়হীন?

একটা অজানা অচেনা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তির মোটাস্বার্থের প্রয়োজনের ডাক, এতো প্রবল হয়ে উঠলো তার কাছে, যে বিনা বিচারে মুহূর্তে ত্যাগ করে বসলো চিরদিনের স্নেহাশ্রয়?

কিন্তু—

প্রয়োজনের তাগিদেই বা কে কবে ডেকেছে রাধাকে? কে কবে ডাকবে? কে কোন্‌দিন বলেছে—'রাধাকে তার চাই।'

আবেদনের কারণটা যতোই তুচ্ছ হোক, স্থূল হোক, রাধার চিরক্ষুধার্ত চিত্তদুয়ারে যে এই প্রথম ধ্বনিত হলো—পুরুষ-কণ্ঠের আবেদন!

এ বস্তুকে উপেক্ষা করবে—এতো ঐশ্বর্য রাধার ভাঁড়ারে কই?

ভাড়াটে বাড়ী

অবশেষে বাড়ী মিলেছে !

মনের মতো বাড়ী !

ভাড়াটে বাড়ী যে আজকাল আর পাওয়া যায় না এ কথা কচিছেলেটাও জানে, তবু দীর্ঘকাল ধরে কচিছেলের বাড়া বায়না করে এসেছে রমলা। এ বাড়ী থেকে সে উঠে যাবেই যাবে।

এই অসাধ্য সাধনের সাধনায় একদিন একতিল স্বস্তি দেয়নি স্থরেশকে, উঠতে-বসতে খেতে-শুতে 'বাড়ী বাড়ী' করে পাগল করেছে তাকে।

এ বাড়ীটার—যে কি কি অস্থবিধে, এ শুনতে শুনতে মূল তালিকাটা মুখস্থ হয়ে গেছে স্থরেশের। তা'ছাড়া ছোটো-খাটো অস্থবিধের নতুন নতুন ফিরিস্তি রোজই প্রায় যোগ হচ্ছে।

বললে কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, গত দু'বছরের মধ্যে স্থরেশ একটা ছুটির দিনে একটা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যায়নি, একদিন মাছ ধরতে ছোটেনি, তাস খেলেনি, দাবা খেলেনি, সিনেমা থিয়েটার দেখেনি, এমন কি দুপুরবেলা বিছানায় একটু গা গড়ায়নি।

সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, দুপুর নেই, শুধু বাড়ী খুঁজতে বেরিয়েছে।

অর্থাৎ রমলা বার করে ছেড়েছে !

রমলার কাজ হচ্ছে অবিরত খবরের কাগজের 'বাড়ীভাড়ার' বিজ্ঞাপন কেটে জড়ো করা, আর তার নির্দেশে স্থরেশকে ঠেলে ঠেলে পাঠানো।

স্থরেশের লাভের মধ্যে এই ছুতোয় বৃহত্তর কলিকাতার প্রায় সমস্ত পথ ঘাট মুখস্থ হয়ে গিয়েছে তার। কারণ বাড়ী সম্বন্ধে রমলার দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। যে কোনো দিকে হোক, বাড়ীর 'ভালোত্ব'টাই তার প্রধান লক্ষ্য।

ভালো বাড়ী চাই।

এ বাড়ী ছেড়ে ভালো বাড়ী !

বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এই পনেরো বছর ধরে খাঁচার মতো এই বাড়ীখানায় বাস করে এলো রমলা। জীবনের সমস্ত ভালো বয়েসগুলো গেলো খসে। এখনো পড়ে থাকবে এই হতচ্ছাড়া খাঁচাখানায়? কক্ষনো না!

অসাধ্য সাধনাই করতে হবে সুরেশকে।

খবরের কাগজের 'কর্মখালি' আর 'বাড়ীভাড়া' যে কিছু নয়, ওযে শুধু লোক ধাঁধানো ভাঁওতা, একথা স্ত্রীকে বোঝাতে বোঝাতে কাহিল হয়ে গিয়েছে ভদ্রলোক, বচসা হয়েছে, মনান্তর হয়েছে, দু'চারদিন কথা বন্ধর পালা পর্যন্ত চলে গেছে, তবু হাল ছাড়েনি রমলা।

তাই না এতোদিনে হালে পানি পেয়েছে?

পেয়েছে মনের মতো বাড়ী! ঠিক যেমনটি খুঁজেছিল। ভাড়া অবশ্য এ বাড়ীর চারগুণ। কিন্তু কি করা যাবে, ভালো জিনিসের ভালো দাম দিতেই হয়।

দেবে নাই বা কেন? এখন সুরেশের অবস্থা ফিরেছে যখন। আগে তো এতো জোর করেনি রমলা? কারণ আগে সুরেশের আয় ছিলো কম, দায় ছিল বেশী। এখন পালাটা উল্টেছে।

এখন সুরেশের পর পর দু'টি আইবুড়ো বোনের বিয়ে দিয়ে ফেলে দায়টা গেছে, কর্মজগতে এক আকস্মিক উন্নতিতে আয়টা বেড়েছে। রমলারই বা তবে দাবী বাড়বে না কেন?

আজই সন্ধ্যাবেলায় যেতে হবে! আজকের দিনটা শুভ। আজ আর একতিল সময় নেই রমলার। কতো গোছ, কতো ব্যবস্থা, কতো আয়োজন। সুরেশের মায়ের আমলের সংসার!

পরে এসেছে রমলার হাতে।

কতোদিনের কতো সঞ্চয় জমা হয়ে আছে এখানে-সেখানে। ভাঁড়ার ঘরে, রান্নাঘরে, শোবার ঘরে, তাকে, কুলুঙ্গিতে, ঘুলঘুলির মধ্যে! জিনিসের চাইতে জঞ্জাল বেশী, আবশ্যকের চাইতে আবর্জনা!

এ বাড়ীতে যেসব কুলো ডালা ঝুড়ি চুপড়ি, প্যাকিং কাঠের বাক্স, চটের পর্দা বেমালুম খাপ খেয়ে দিব্যি মানানসই হয়ে বাস করেছিল, তারা হঠাৎ বাস্তহারা হয়ে পড়ছে। ওদের ত্যাগ করো। ওরা বাতিল! ওরা ও-বাড়ীতে 'অচল'!

আরো কতকগুলো জিনিস আছে, যেমন রংচটা আসবাব, ধোঁয়াধরা ফটো, ডালাভাঙা ক্যাসবাক্স—এগুলো নিয়ে যে কি করবে সেই সমস্যা।

এ সবই কি চালানো যাবে ও-বাড়ীতে ?

সে বাড়ীতে মোজাইক্ করা মেঝে, সিনেমা স্টাইলের জানলা, রাস্তার ওপর ঘর পিছু আলাদা আলাদা ঝুল বারান্দা।

এই সবের জন্যেই আরো খাটুনি আর চিন্তার অন্ত নেই।

ভাবী বাড়ীর জানলা দরজার জন্যে অনেকদিন থেকে বাহারি বাহারি পর্দা করে রেখেছে রমলা, বাহারি টেবিলঢাকা। কিন্তু আসবাব-পত্রতো সত্যি কিনে রাখতে পারেনি এক সেট ?

যাক্, আস্তে আস্তে সবই কিনবে।

ঘোড়া যখন হয়েছে চাবুকও হবে। এখন শুধু বর্জনের নির্বাচন।

সকালবেলাটা আবার ছোটো ননদ এসে খানিকটা সময় খরচ করিয়ে দিয়ে গেল। কাছেই থাকে, পাড়ার মধ্যেই শ্বশুরবাড়ী। ইচ্ছে হলেই বেড়াতে আসে। এরা দূরে চলে যাচ্ছে বলে ম্রিয়মাণ মুখে দেখা করতে এলো।

ম্রিয়মাণ হবে বৈকি, মস্ত একটা সুখ চলে গেলো তো ওর। মন কেমন করলেই বাপের বাড়ী বেড়াতে আসতে পাওয়া কি সোজা সুখ ? ওর ধরন ধারণ দেখে, রমলা মনে একটু রাগ আনতে চেষ্টা করলে, ভাবলে—জগৎটা কি স্বার্থপর! এই যে আমরা এখানে কতো কষ্ট পোহাচ্ছিলাম,—এখন কতো ভালো বাড়ীতে থাকতে যাচ্ছি, তা' একটু আনন্দ নেই। নিজের সুবিধেটুকু চলে যাচ্ছে, সেই দুঃখেই কাতর।…কেন রে বাপু, রমলারা তো আর কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে না? পায়ে হেঁটে আসতিস, না হয় দু' আনা ট্রামভাড়া খরচা করে যাবি ?

কিন্তু রাগটায় তেমন জোর পেলো না।

সেই যে মেয়েটা খাবার টাবার সব ঠেলে সরিয়ে রেখে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে কেমন যেন শুকনো শুকনো মুখে উঠে গেলো, সে মুখটা যেন কিছুতেই চোখের সামনে থেকে সরতে চাইছে না।

শাশুড়ী মারা যাবার সময় নেহাত ছেলেমানুষ ছিল মেয়েটা, রমলাকে অনেক আবদার পোহাতে হয়েছে ওর। এই তো সবে দুটি বছর বিয়ে হয়েছে।

যাবার সময় এঘর ওঘর ঘুরে গেলো।

ফেলে দেওয়া জঞ্জালের স্তূপ থেকে বেছে বেছে নিজের ছেলেবেলাকার তুচ্ছ কি দু' একটা সঞ্চয় নিলো আচলে বেঁধে, আরো কিছু যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ালো। দেখে একটু হাসিই পাচ্ছিলো রমলার।

নে বাপু যা খুসি। রমলার অতো ছোটো দিকে নজর নেই।

শেষ পরে—হেঁট হয়ে নমস্কার করলো রমলাকে, আর ফিকে হাসি হেসে বলে গেলো—আমার বিয়ের 'বসুধারা'টা রয়ে গেলো এ বাড়ীর দেওয়ালে!

ওকে বিদায় দিয়ে অনেকক্ষণ খোলা দরজাটায় দাঁড়িয়ে থাকলো রমলা পথের দিকে তাকিয়ে।...ছেলেরা ইস্কুলে গেছে, সুরেশ অফিসে, ছোট ছেলে-মেয়ে দুটো কেঁদে কেঁদে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাকবার মধ্যে—রমলা তো একাই রয়েছে শুধু। থাকলোই না হয় দুদণ্ড দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই মনে পড়ে গেলো—কাজের পাহাড় আছে পড়ে।

অলসতার সময় নয়। ছেলে মেয়ে উঠে পড়লে রক্ষে নেই।

ও বাড়ীতে গিয়েই ছোট ননদটিকে নিয়ে গিয়ে দু'চার দিন রাখবে, এই সাধু সংকল্প করে জোর তলবে কাজে লেগে গেলো রমলা। আচ্ছা ওর তো বাপু ভালোই হলো! পাড়ায় শ্বশুরবাড়ী হয়ে, বাপের বাড়ী এসে থাকার ব্যাপারটা তো মোটেই ছিল না। বেড়িয়ে চলে যেতো।

এতো তবু দু'পাঁচ দিন থাকা হবে!

না না, এ বেশ ভালোই হয়েছে।

'বসুধারা'র কথায় ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে নতুন করে চোখ পড়লো ভুলে যাওয়া দেওয়ালের দিকে! ভুলে যাবারই কথা, ধোঁয়ায় ধুলোয় কুৎসিত বিবর্ণ ওই দেওয়ালগুলোকে দেওয়াল বলে মনেই হয় না।

পথ আর ঘর এই দুটোকে আলাদা করবার একটা আড়াল মাত্র!

বসুধারা একটা কেন গোটা তিন চারই তো রয়েছে।

সদ্য টাটকা ধারাটা এই ছোটো ননদের বিয়ের! তার আগেরটা মেজ ননদের।...সব থেকে পুরনো ওই মেটে বিবর্ণ দাগটা তো শুনেছে সুরেশেরই বিয়ের নান্দীমুখের!

আর—কোণের দেওয়ালের ওটা?

ওটা—বিয়ের নয়!

অন্নপ্রাশনের!

বসুধারার চিহ্নটা রয়েছে! আর কিছু না!

এটা রয়েছে—অথচ কোনোদিন লক্ষ্য পড়েনি রমলার! সারা বেলা ভাঁড়ার ঘরে বসে কাজ করেছে কতোদিন, তবুও না!

কিন্তু দেওয়ালের এই চিহ্নটা ছাড়া আর কোথাও কোনো চিহ্নই তো নেই!

কি করেই বা থাকবে?

বারো তেরো বছর ধরে একটা সাতমাসের ক্ষুদ্র শিশুর কোন্ চিহ্নটুকুই বা জীইয়ে রাখতে পারে মানুষ? তারপরে আরো দু'চারটি সন্তান যার কোলে এসেছে?

মুখে ভাত খাওয়া বাসনগুলো—তাই কবে কখন ভেঙে চুরে ক্ষয়ে হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রয়েছে শুধু মেটে সিঁদুর গোলা এই অনুজ্জ্বল চিহ্নটা!

ছোট্ট টোপর-পরা ছোট্ট মুখটা মনে করতে চেষ্টা করলে রমলা, পারলোনা! টোপরটা মনে পড়লো, মুখটা মনে পড়লোনা।

রমলার প্রথম সন্তানের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই, রমলার মনেও নয়! আছে শুধু এই ভাড়াটে বাড়ীর কোণের একটা দেওয়ালে!

শোবার ঘর থেকে চীৎকার ভেসে এলো—প্রচণ্ড কান্নার!

এই সর্বনাশ! খুকী উঠেছে!

মেয়ের গলা তো নয়—কাঁসর। আর চেঁচাতে যদি শুরু করলো, থামায় কার সাধ্যি!

ভাঁড়ারের দরজাটা টেনে শেকল তুলে দিয়ে ছুটে চলে গেলো রমলা। মরতে আবার চৌকীর ওপর শুইয়ে এসেছে! পড়লে বাঁচবে না!

স্মৃতির ভাঁড়ারেও তো এমনি করেই দরজা টেনে শেকল তুলে দিতে হয়! নইলে বর্তমানের চাহিদা মেটানো যাবে কি করে?

কাজের পরে কাজ!

নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

আর পেরে উঠছেনা রমলা! এতো শেকড় কাটতে হবে তা কি আগে ভেবেছিল? জোর গলায় সুরেশকে বলেছিল—"তোমাকে কিছু করতে

হবে না, সব আমি করবো। তুমি ও বাড়ী গিয়েই পিঁড়ি পেতে খেতে বসতে পাবে।"

টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি তরকারি ভরে নেবার মতলবটা আর ফাঁস করেনি।

সুরেশ বলেছিল—"হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলা গিয়েই আবার তক্ষুণি রাঁধতে বসবে না কি? পাগল! কিছু কিনে টিনে খেলেই হবে।" রমলা মিটিমিটি হেসেছিলো!

তাক লাগিয়ে দেবে সে সুরেশকে।

কিন্তু তেমন পারলোনা!

'লেপের চালিটা' ছাদের সীলিঙে ঝুলছে, ওটা খুলে নিতে সুরেশের সাহায্য চাই। ওটা নাকি সুরেশের বাবার হাতে টাঙানো। শ্বশুরকে রমলা দেখেনি! দেখেছে শ্বশুরের হাতের এই কাজটা।

ওটা নামাতে পারেনি, আর খুলতে পারেনি এই ব্র্যাকেট আলনাটা।

দেওয়ালের মায়া বিসর্জন দিয়ে বালি ভেঙে তচনচ করেও পারেনি। মোক্ষম পুঁতে আছে!

আর কিচ্ছু না করে চুপচাপ ওই আলনাটার দিকেই চেয়ে বসে আছে রমলা!

ঠিক ওর কাছেই যেন একটা হাস্যোজ্জ্বল কিশোর মুখ দেখতে পাচ্ছে! গোল গোল পুরন্ত মুখ, চোখে চশমা! হাতে হাতুড়ীটা উচানো।

আলনাটা পুঁতে ফেলে বাঁহাতে বেশ নেড়ে চেড়ে কাজের স্থায়িত্বটা দেখে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছে—"এতে কেবল মাত্র আমার জামা কাপড় থাকবে, বুঝলেন বৌদি মহাশয়া? আপনার শাড়ী ব্লাউস চাপিয়েছেন কি—এ-ই!"

হাতুড়ীটা রমলার মাথায় বসিয়ে দেবার ইঙ্গিত করে 'হো হো' হাসি! —বাড়াবাড়ি রকমের হাসতো! হাসির জন্যে সময় সময় ধমক খেতো সুরেশের কাছে।

সুরেশের ছোটো ভাই দেবেন।

রমলারই সমবয়সী ছিল।

থার্ড ইয়ারে উঠেই টাইফয়েড হলো!...

অফিস-ফেরতই একেবারে ঠেলাগাড়ী আর মুটের পাল নিয়ে হৈ হৈ করে বাড়ী ঢুকলো সুরেশ। পঞ্জিকায় নাকি শুভক্ষণের আয়ুটা স্বল্প হয়ে আসছে। দেরী করলে চলবে না!

ছেলেমেয়েরা ফরসা জামা পরে তৈরি হয়ে আছে। স্ফূর্তির শেষ নেই তাদের! শুধু রমলার ভঙ্গীতেই কেমন শিথিলতা।

প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে ওঠে সুরেশ—একী? এখনো তৈরি হওনি যে? ব্যাপার কি? আটটা দশ মিনিট পর্যন্ত ভালো সময় আছে বলেছিলে না? সাতটা তো বেজেই গেছে।

রমলা মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে চায়!

ক্লান্তস্বরে বলে—"ভাবছি গিয়ে আর কি হবে? থেকেই যাই না?"

"—সচিবঃ"

রাতের অন্ধকারের মেয়াদ সবটা শেষ হয়নি, বাইরের দরজায় সজোরে কড়া নড়ে উঠলো। এতো ভোরে ঝি আসে না, অসময়ে আচমকা কে এ-রকম অভব্যের মতো?

বিরক্ত চিত্তে ঘুমচোখে এসে দোর খুলে দিয়েই 'থ' হয়ে গেলো বিভূতি। বন্ধুর ভাগ্নে ডাকতে এসেছে, শ্মশানে যেতে হবে। সুখেন্দুর দাদা হঠাৎ হার্টফেল করেছেন রাত্রে।

বিভূতির মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। কাল রাত্তির দশটা পর্যন্ত সুখেন্দুর বাড়ী বসে তাস খেলে এসেছে সে, তখন দেখেছে দাদাকে, পরিপাটি কোঁচানো ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে কোথা থেকে যেন নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরলেন। রাত বারোটায় সে মানুষ ফরসা?

একমিনিট দাঁড়াতে বলে ছেলেটাকে, চোখে মুখে জল দিয়ে আর চায়ের বদলে ঠাণ্ডা জল এক গ্লাস খেয়ে স্ত্রীকে খবরটা জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো বিভূতি। সুখেন্দু ওর প্রাণের বন্ধু।

যেতে যেতে বকবক করছে নিতাই—"নেমন্তন্ন খেয়ে তো আর আজকাল পেট ভরে না মানুষের। বাড়ী এসে বললেন—ছু'খানা রুটি দিতে। খেলেনও দিব্য—খান ছুত্তিন রুটি—পটল ভাজা—একবাটি ছুধ। তখন কিছু না।... শুয়ে পড়ে তারপর বুঝি জল চেয়েছেন বড়োমামীর কাছে, কাচের গেলাসে করে জল দিলেন বড়োমামী। জল খেতে গিয়েই শরীর কেমন করেছে—সকলকে ডাকতে বলেছেন—বাস্ আধঘণ্টার মধ্যে সব ফিনিস্।"

শুনতে শুনতে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে বিভূতির। বিশ্রী লাগছে নিতাইয়ের বকবকানি। ঘুমভেঙেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসছে বলে? না-কি জীবনের নশ্বরতার দিকটা ছোকরা বড়ো বেশী স্পষ্ট ক'রে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বলে?

বিশ্রী লাগছে—অথচ বারণ করাও যায় না, মুখের বিরাম নেই ছোকরার। আকাট মুখ্যু বলেই বোধ হয়, নইলে এতো কথা কয়? একটা লোক

কাল ছিল—আজ নেই—এইটাই তো যথেষ্ট খবর, একমাত্র খবর; সে লোকটা 'নেই' হয়ে যাবার আগে পটলভাজা দিয়ে রুটি খেয়েছিল—কি কাচের গেলাসে জল খেয়েছিল—এটাই কি একটা জানবার মতো তথ্য? কাল রাত্রে বিভূতি নিজেই তো খেয়েছে রুটির সঙ্গে পটলভাজা। এই তো—এইমাত্র কাচের গেলাসে জল খেয়ে এলো! সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাগুলো এতো ফেনিয়ে বলবার কি দরকার নিতাইয়ের? মানুষের বুকের ছমছমানি বাড়াবার জন্যে?

আরো একবার মনে হয় বিভূতির, ছেলেটা একেবারে মুখ্যু গেঁয়ো। নইলে এইভাবে ঘরের কথা বলে? "—ইদানীং তো ছোটমামাতে বড়োমামাতে মোটে বনাবনি ছিল না? ইনি যান পুবে, তো—উনি দক্ষিণে। নেহাত নাকি দিদিমা বুড়ি এখনো বেঁচে, তাই ভেন্নহাঁড়ী হয়নি, নইলে এতোদিনে উঠোনে পাঁচীল পড়তো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিভূতি মামা, কালকের ওই দুর্ঘটনার পর—ছোটমামা যেন একেবারে পাগল। সামলে রাখা যায় না। যতোই হোক বাবা—সহোদর ভাই, রক্তের টান যাবে কোথায়? সেই যে পড়েছিলাম—'দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ'—সেইটা বোধ হয় মনে পড়েছে ছোটমামার, তাই আপসোসের সীমা নেই।"

আঃ কী বিটকেল ডেঁপো ছেলেটা!

না আজকেই যেন ডেঁপোমিটা বড্ডো বেড়েছে?

কই এতোদিন সুখেন্দুর বাড়ী যায় আসে বিভূতি, এতো কথা কইবার সাহস তো হয় না ওর।

অবশ্য বিচারে একটু ভুল করে বিভূতি, আকস্মিক এই দুর্ঘটনাটা ওকেও তো কম বিচলিত করেনি; এটা তারই প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু বিভূতির মনে হচ্ছে—পথটাই বা ফুরোচ্ছে না কেন? তা'হলেই তো নিতাইয়ের কথা ফুরোয়। প্রায় রোজই তো সুখেন্দুর বাড়ী যায় সে তাস খেলতে—কই কোনো দিন তো মনে হয় না তার বাড়ীর দূরত্বটা এত বেশী।

নিতাই ব'লে চলে—"এইতো বাবা, এইতো জীবন! মুনিঋষিরা সাধে বলে গেছে—'পদ্মপত্রে জল'! আমার কি মনে হয় জানেন বিভূতিমামা, ওই যে রবারের বেলুনগুলো—ওগুলো যেন মানুষের জীবনের মতন, এতো রংচং,

এতো বাহার,—আকাশে উড়ছে—যতো ইচ্ছে ফুলছে ফাঁপছে—একটি ছিদ্দির হলো—ব্যস্ !"

আঃ এ হতভাগা ছেলেটা কি রাস্তার মাঝখানে এখন জীবনদর্শন আলোচনা করতে চায়? কি মুশকিলেই পড়া গেছে! বাধ্য হয়েই এবার বলতে হয় বিভূতিকে—"পা চালিয়ে চলো নিতাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

একটু সমঝে চুপ করে যায় ছোকরা।

মৃত্যুকে তো কতোবারই দেখলো বিভূতি, কিন্তু এমনভাবে কবে দেখেছে? কবে এমন গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে?··· কবে এতো স্পষ্ট করে অনুভব করেছে—জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে ব্যবধান মাত্র একটি রুদ্ধদ্বার কপাটের। যে কোনো মুহূর্তে খুলে পড়তে পারে সেই অর্গলহীন কপাটখানা।

কালকের সেই নিমন্ত্রণফেরত আদ্দির পাঞ্জাবিটাই বোধহয় আবার চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুভেন্দুবাবুর গায়ে, পরিয়ে দেওয়া হয়েছে চুনোটকরা ধুতি, গিলে-কোঁচানো উড়ুনি।···বেজায় নাকি বাবু ছিলেন ভদ্রলোক, তাই শেষসজ্জায় এমন সমারোহ।

সুখেন্দুর মা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছেন—'ও বাবা, তুই কি মালাচন্দন পরে বর সেজে বিয়ে করতে যাচ্ছিস? তোর মুখে যে মরণের কোনো চিহ্ন নেই বাবা, লোকে কেন তবে মিছে করে এমন সব্বনেশে কথা বলছে?···ও বাবা তুই যে হাসিমুখে ঘুমোচ্ছিস বাবা—"

একটানা সুরে বারে বারে একই কথা বলে যাচ্ছে বুড়ী, গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডের মতো।

বিভূতিও অবাক্ হয়ে দেখে—সত্যিই তো, কে বলবে মৃত্যু হয়েছে শুভেন্দুবাবুর! পরিষ্কার ধপধপে কপাল, টিকলো নাকের নীচে শৌখিন করে ছাঁটা গোঁফ, প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ।

এতো ভাল দেখতে ছিলেন ভদ্রলোক? কই কোনোদিন তো খেয়াল করেনি বিভূতি! সুখেন্দুর মুখে ক্রমাগত দাদার বিরুদ্ধে টিটকিরি ও বিষোদ্গার

শুনে শুনে বিভূতির মনেও অকারণ কেমন একটা তাচ্ছিল্য ও বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হয়েছিল ভদ্রলোকের উপর। ভালো করে তাকিয়ে দেখেওনি কোনোদিন!

দেখতে দেখতে হঠাৎ কি যে হয়—সমস্ত শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে বিভূতির…এতো লোকজন…চীৎকার কান্না…সব ঝাপ্‌সা হয়ে আসে…মনে হয় পায়ের তলায় যেন কোনো কঠিন জিনিস নেই তার।…এ কার মুখ? সুখেন্দুর দাদা শুভেন্দুবাবুর?…না তো! এ মুখ যে বিভূতির দাদার!… আলাভোলা সাজ, মোটা মোটা গোঁফ আর দাড়িবহুল মুখওয়ালা ভূপতিবাবুর সঙ্গে শুভেন্দুর কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পাবার কথা নয়, তবু যেন বুদ্ধিবৃত্তি সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যায় বিভূতির।…পা থেকে মাথা অবধি ক্রমাগত বিদ্যুৎ-চমকের মতো চমক লাগে।…অকারণে বারবার সেই কাল্পনিক সাদৃশ্যটাই চোখে পড়তে থাকে। সুখেন্দুর বাড়ীর দালানের সঙ্গে নিজের বাড়ীর দালানটার পার্থক্য ঘুচে যায়…কেন? বিভূতির দাদার মুখটাও এমনি প্রশান্ত আর প্রসন্ন বলে?

কিন্তু কবে দেখেছে সে? কতোদিন আগে?

দাদার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখছে—এ দৃশ্যটা তো কই কিছুতেই মনে পড়ছে না বিভূতির! বক্রোক্তি আর বঙ্কিম কটাক্ষ…এই দিয়েই তো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে।

ছেলেবেলায় দেখা মুখটাই কি তা'হলে বারবার এসে ছায়া ফেলছে শুভেন্দু-বাবুর ফরসা ধপধপে মুখের ওপর?…জোর করে চোখটা সরিয়ে নিলে বিভূতি, অকারণ আতঙ্ককে প্রশ্রয় দেবে না সে, কিছুতেই না। তার চেয়ে সুখেন্দুকে সান্ত্বনা দেওয়া যাক।

সুখেন্দুর চেহারা দেখেও চমকাতে হলো! এক রাত্রের মধ্যে এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে সুখেন্দুর! চোখদুটো মাতালের মতো লাল টকটকে ফুলো-ফুলো, কালি-মাড়া মুখ, পাগলের মতো এলোমেলো চুল। কাল রাত্রেও তাসের আড্ডায় কে একজন বলছিল—"তোমার কেন বয়েস বাড়ছে না হে সুখেন্দু? পাকা হত্তুকি-টত্তুকি খেয়েছো—না কি—বলো তো?" আজ বুড়ো দেখাচ্ছে সুখেন্দুকে।

বিভূতি গিয়ে সুখেন্দুর কাছে বসে। ছেঁদো কথা ছাড়া এ ক্ষেত্রে আর

কোনো কথাই জোগায় না মানুষের, বিভূতিও সেই ছেঁদো কথাই বলে—"কি করবে ভাই, মানুষ তো চিরদিনের নয়? যার যেদিন নিয়তি শেষ হবে"—

সহসা ছেলেমানুষের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সুখেন্দু, বিভূতির হাতটা সজোরে চেপে ধরে বলে—"দাদা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই বিভূতি।" আচ্ছা বিভূতিরই বা কে আছে? দাদা ভিন্ন?

তবু তো মা রয়েছেন সুখেন্দুর। কিন্তু শোকের সময় মার কথা ভুলে গিয়ে ওই কথাই বারবার বলতে থাকে সুখেন্দু—"মাথার ওপর থেকে আমার ছাতা গেলো বিভূতি। পর্বতের আড়াল চলে গেলো আমার! ছেলেবেলায় বাবা গেছেন—দাদা নিজে না খেয়ে আমায় খাইয়েছে, দাদা ভিন্ন আমার আর কেউ ছিল না ভাই।"

মেয়েমানুষের মতো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে সুখেন্দু, এখন আর মনে পড়ছে না—এই বিভূতির কাছেই হাজার দিন ও দাদার সঙ্কীর্ণতা আর স্বার্থপরতার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়ে দিয়ে নিন্দে করে এসেছে।

সে কথা বিভূতিরও এখন তেমন স্পষ্ট মনে পড়ছে না, ঘুরে ফিরে কেবলি মনে পড়ছে তারই বা আর কে আছে? সুখেন্দুর তো তবু মা আছেন।

কিন্তু আর তো বসে বসে বিলাপ করবার সময় নেই, বহিরাগত আত্মীয়-বন্ধুরা তাগাদা দিয়ে ওঠায় সবাইকে, নির্বিকার কঠিন মুখে প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য করে যায়। মনুষ্যজীবনের সব চেয়ে কঠোর, সব চেয়ে রূঢ় কুৎসিত কর্তব্য! কর্তব্যের অভিশাপ!

বড়ো আকস্মিক মারা গেলো যে শুভেন্দু, ধাতস্থ হতে সময় লাগছে, তা নয় তো হিন্দুশাস্ত্রে শবদেহ বাসী করবার আইন নেই। আর বেশী বেআইনি করা চলে না। শাস্ত্রের আইনে বাঁধা মানুষ। যে যতো সংস্কারমুক্তই হোক—আগুন না ছুঁয়ে আর নিমপাতা দাঁতে না কেটে নিজের নিজের বাড়ী ফিরুক দিকিনি কেউ?

যথারীতি কর্তব্য সেরে ফিরতে বেলা দুটো-আড়াইটে বাজলো। ভিজে কাপড়ে ফিরতে হয়েছে। আজকের বাজারে শ্মশান-বন্ধুদের জন্যে 'ঘাটে' ধোপদস্ত ধুতির বোঝা পাঠাবার ক্ষমতা কোনো গৃহস্থেরই নেই, সে আশা কেউ করেও না। রিকৃশ চড়ে বাড়ী ফিরলো বিভূতি। আর হাঁটবার ক্ষমতা হচ্ছিল

না বলেও নয়, বর্ষার দিনে ভিজে ধুতিটা যেন কামড় দিয়ে দিয়ে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল—জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা।

ফিরে দেখলো বাইরের ঘরে বসে দাদার ছেলে নন্তু বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারম খেলছে। কেন? নন্তু বাড়ী বসে কেন? কলেজ যায় নি?…ওঃ আজ রবিবার, না?

হঠাৎ যেন সুখেন্দুর দাদার একটা অদ্ভুত সদ্বিবেচনার পরিচয় পেয়ে সকাল থেকে খিঁচড়োনো মনটা একটু ভালো হয়ে গেলো বিভূতির। যাক, অফিসটা কামাই হয়নি তাহলে!

বাড়ীর ভেতরটা চারিদিক নিঃঝুম, আকাশটা মেঘলা, বাতাসটা জোলো… কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, উঠোনটা ভিজে ভিজে। …কেমন যেন নিরানন্দ ভাব।

সুখেন্দুর বাড়ীর হাওয়া এ বাড়ীতে এসে লেগেছে নাকি? না বিভূতির নিজের মানসিক অবস্থারই ছায়া?

একখানা শুকনো কাপড়ের জন্যে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে গিয়ে ভিজে কাপড়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বিভূতি।…এ কি?

নীচের দালানে পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন স্নেহলতা! বিভূতির বৌদি। মুখের ভাবটা কেমন যেন ক্লান্ত করুণ, হস্তচ্যুত হাতপাখাখানা সাক্ষ্য দিচ্ছে—ক্লান্তির, অবসন্নতার।

—বৌদি!

উচ্চারণ করেই নিজের কানে কেমন অদ্ভুত লাগলো বিভূতির। 'বৌদি' বলে কতোকাল ডেকে কথা কয়নি সে! তাই এমন অশ্রুতপূর্ব ঠেকলো! কই? দেওর-ভাজের মধ্যে কেউ কাউকে ডেকে কথা বলা—মনেই পড়ে না তো?

—এখানে ঘুমোচ্ছো যে?

ধড়মড় করে উঠে বসলেন স্নেহলতা। দেখলেন প্রশ্নকর্তা বিভূতি।

স্নেহলতার মুখের দিকে ভালো করে চাইলে ধরা পড়তো সে-মুখ কৃত-কৃতার্থের।

—ঠাকুরপো! এসেছো? সারা হলো সব?

—হলো। কী কাণ্ডই যে হয়ে গেলো! সে দেখলে আর—

বিভূতির কণ্ঠে এমন অন্তরঙ্গতার সুর? এখনো আছে?...কৃতার্থম্মন্যের মতোই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন স্নেহলতা—"সব শুনবো ভাই, কিন্তু তুমি কি গঙ্গা থেকে এতোটা পথ ভিজে কাপড়ে এলে? সর্বনাশ! এই বাদলার দিন!..." তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছ বরাবর উঠে ডাক দেন—"ছোট বৌ, অ ছোট বৌ, শীগ্‌গির একখানা ধুতি নিয়ে নেমে আয়—ঠাকুরপো ফিরেছে—"

অনেকদিন পরে ছোট বৌকে 'তুই' বলেন স্নেহলতা।

—থাক থাক, আমিই যাই—

স্নেহলতা থামান,—"না ভাই, ও কাপড়ে ছেলেপুলের ঘরে ঢুকতে নেই।... বাণী, অ বাণী, চট করে তোর কাকার একখানা ধুতি নিয়ে আয় দিকিন?"

ব্যাপারটা বুঝে বাণী তার পক্ষে যতোটা শীগ্‌গির সম্ভব একখানা ধুতি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। উৎকণ্ঠিত স্নেহলতা মাথা ভিজে আছে কি না বিভূতির, বারবার প্রশ্ন করেন। যেমন করতেন অনেকদিন আগে—বিভূতি যখন খেলার মাঠ থেকে ভিজে কাদা মেখে বাড়ী আসতো। যখন—বিভূতি সেই কাদামাখা অবস্থাতেই হামাটানা বাণীটাকে টপ্‌ করে তুলে নিয়ে বলের মতোই লোফালুফি শুরু করতো!

এতোক্ষণে চোখে পড়ে বিভূতির—দালানের এক পাশে লোহার ঢাকা চাপানো কার যেন ভাত বাড়া রয়েছে।...হ্যাঁ ভাতই হবে, আসন আর জলের গ্লাসটা নিশ্চিত সাক্ষ্য দিচ্ছে কাছের গোড়ায় বসে।

—দাদা এখনো খাননি নাকি?

বিভূতির আশ্চর্য প্রশ্নে বিগলিত স্নেহলতা তাড়াতাড়ি যে একগাড়ী কথা বলে যান তার তাৎপর্য এই—মেয়ের বিয়ের 'সম্বন্ধ' করতে বেহালা না বালী কোথায় যেন যেতে হয়েছে ভূপতিকে। সেই দশটার সময় বেরিয়েছেন, এখনো ফেরার নাম নেই।...একেই শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না ক'দিন, তার ওপর শুভেন্দুবাবুর খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ ছিল।...কেন যে এতো দেরী হচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভূতি অনুযোগ করে—শরীর ভালো ছিল না তো যেতে নিষেধ করেননি কেন স্নেহলতা! স্নেহলতা তৎক্ষণাৎ নিজের দোষ স্বীকার করেন অকপটে, তিনিই একরকম জোর করে পাঠিয়েছেন, রবিবার ছাড়া তো সময় হয় না। মেয়ের বিয়ে যে বড়ো দুর্দান্ত জিনিস!

বিভূতি দাদার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঘোরতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। অতঃপর বিভূতির খাওয়ার কথা ওঠে। স্নেহলতা বাণীকে পাঠাতে চান খুড়ীর ঘুম ভাঙাতে—কারণ বিভূতির ভাত স্নেহলতার হাঁড়িতে নেই।

মা মারা গেছেন, তাই 'ভেন্নহাঁড়ি' হতে বাধা হয়নি।

বিভূতি কিন্তু অবেলায় ভাত খেতে চায় না, বলে—বরং একটু চা পেলে মন্দ হতো না।

—ওমা, তার আবার 'যদি'র কি আছে?…এই বাণী, শীগ্‌গির স্টোভটা ধরিয়ে জল চড়া দিকিন একটু!

বিভূতি ঈষৎ অস্বস্তি প্রকাশ করে—"থাক থাক, ওকে আর এখন কষ্ট দেওয়া কেন, যাচ্ছি আমি ওপরে—"

স্নেহলতা কান দেন না সে আপত্তিতে।—বুড়োধাড়ী মেয়ের এক পেয়ালা চা করতে আবার কষ্ট কি, শ্বশুরঘরে যেতে হবে না আজ বাদে কাল!…

যেন রোজই বিভূতি 'এদিকে' চা খায়।…যেন বড়োমাছটা কিনে খবরের কাগজ জড়িয়ে একেবারে বৌয়ের রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দেয় না বিভূতি, যেন বিভূতির বৌ রান্নাঘরের দোর ভেজিয়ে কোটে না সে মাছ।

চা খেতে খেতে—বৌয়ের সঙ্গে নয়—বৌদির সঙ্গে গল্প করে বিভূতি সুখেন্দুর বাড়ীর শোচনীয় অবস্থার কথা, সুখেন্দুর মার বুড়োবয়সে দুর্গতির কথা!

ওদিকে—ঘুম থেকে উঠে ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে দেখে মাথা ঘুরে যায় ছোট বৌয়ের। অভুক্ত স্বামীর কথা ভেবে ধড়ফড়িয়ে ওঠে মনটা। কি করবে? চাকরটাকে পাঠাবে নাকি সুখেন্দুর বাড়ী?

নিচে নামতে গিয়ে থমকে গেলো, গলা পাওয়া যাচ্ছে না বিভূতির? বাবু এসেছেন তা'হলে? আটঘণ্টা পরে বাড়ী ফিরে এতো গল্পর ধূম কার সঙ্গে? 'ও বাড়ীতে'—বাক্যালাপ বলতে তো বাণী, নেহাৎ 'কাকা কাকা' করে গায়ে পড়ে আদর কাড়ায় বলেই। কিন্তু এইটাই কি বাণীর সঙ্গে গল্প করবার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়? মাধুরী যখন ছটফট করছে স্বামীর আসার আশায়!

কিন্তু একা বাণী কি? না তো।…এহেন—দোদুল্যমান হৃদয়ে উঁকি মেরে না দেখে তো আর থাকা যায় না সত্যি? ওকে কেউ দেখতে পায় না অবিশ্যি, ও-ই দেখে।…স্নেহলতার সামনে বসে চা খাচ্ছে বিভূতি, আর বলছে—

"তোমার কিন্তু একদিন সুখেন্দুর মা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত বৌদি, সেবারে অতো আলাপ হলো—"

ওঃ, তাই না কি? বিভূতির বন্ধুর বাড়ী শোক প্রকাশের কর্তব্যপালন করতে যাওয়া বিভূতির স্ত্রীর উচিত নয়, 'উচিত' বৌদির! হঠাৎ ভালোবাসা উথলে উঠলো যে একেবারে।

নিচে না নেমে ঘরেই ফিরে যায় মাধুরী, আর যথেষ্ট বাদলা হাওয়া সত্ত্বেও পাখার নিয়ামক যন্ত্রটাকে শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে হুম্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

কিন্তু শুয়ে কতোক্ষণ থাকা সম্ভব?

ধৈর্যের একটা মাত্রা আছে তো? যথাসর্বস্ব চুরি যাচ্ছে—দেখে কে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে চোরের ওপর রাগ করে?

ওঃ ভাসুর ঠাকুরও এসে জমিয়ে বসেছেন? ভালো। সিঁড়ির মাঝখানেই তা'হলে স্থিতি হতে হয়। যে যাই বলুক মাধুরীকে, ভাসুরের সামনে বেরিয়ে কথা বলেছে সে, বলুক দিকি কেউ?...তবে হাঁ—হাঁড়িই আলাদা, বাড়ী তো আর আলাদা নয়? গলা সামলে কে কতো থাকতে পারে? আগে আগে বড়োগিন্নী যে খুব শাসাতেন ভাসুরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিয়ে, গলাখাটো করবার উপদেশ দিতেন—একদিন এমন একটা বচন ঝেড়েছে মাধুরী, একেবারে চীট হয়ে গেছেন।...সত্যিই তো—বাড়ীতে যদি দু'ঘর ভাড়াটে থাকতো—তাদের ওপর সমীহ দেখাতে গলাখাটো করে চলতো নাকি স্নেহলতা?...তবে? মাধুরীই বা তা করতে যাবে কেন? হাঁড়ি যখন আলাদা তখন আলাদা দু'ঘর ভাড়াটের সঙ্গে প্রভেদটা কি? তবু যে ঘোমটা দেয় মাধুরী, সে মাধুরী বলেই।

ভারী ভারী গম্ভীর গলার আওয়াজ আসছে—"পাগল হয়েছিস বিভূতি, ওখানেই চেষ্টা দেখবো কি! পাত্রটি যেমন উৎকৃষ্ট, 'খাঁই'টিও তো তেমনি অনাসৃষ্টি? বলে কিনা, তিন হাজার টাকা নগদ! আমায় কাটলে বেরোবে?"

দাদার চাইতে অনেক হাল্কা পাতলা স্বর বিভূতির—"তা' টাকা না খরচ করে আর ভালো বিয়ে কোথায় হচ্ছে? বরং পাত্রটি যদি মোটা কিছু টাকা হাতে পেয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তোমারই লাভ।"

ভারী গলার হাসিটাও ভারী—"লাভ তো বুঝলাম, কিন্তু আসবে কোথা থেকে?"

—"সে যা হয় করে হয়ে যাবে অখন"—এমন ব্যস্ত শোনায় বিভূতির গলা, যেন লগ্নভ্রষ্ট হতে বসেছে বাণীর বিয়ের, তাই তাগাদা দিচ্ছে তার কাকা—"বাণী তো তোমার একার নয়! টাকার অভাবে এমন ভালো পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে যাবে—এটা তো সম্ভব নয়! না না, তুমি মোটেই অমন গা ঢিলে দিয়ো না দাদা, আমি বলছি টাকার জন্যে আটকাবে না।"

"—তা তোমারও তো মেয়েটি ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে"—স্নেহলতার সকৌতুক কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—"এই তো আজ মায়ের হাঁড়িকুড়ি টানাটানি শুরু করে দিয়েছিল—তোমারও তো একটি জামাই খুঁজলে ভালো হয় ঠাকুরপো? জমানো টাকা খয়রাত করে বসলে মেয়ের উপায়?"

—"তা ওটাকেও না হয় সেদিন শিলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে—এক খরচে হয়ে যাবে।"

বিভূতির ধাতেও তা'হলে—পরিহাস রহস্যের স্থান আছে? গোমড়ামুখের চাষ কেবল মাধুরীর কাছে? বটে!

আবার ভারী গলা—"কিন্তু এটাও তো ন্যায্য হয় না বিভূ, সকলের সব ঘুচিয়ে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া?"

—"আচ্ছা আচ্ছা, সে আমরা বুঝবো, কি বলো বৌদি? টাকা গেলে আবার হবে—কিন্তু যা তা একটা বিয়ে হয়ে গেলে তো আর ফিরবে না—"

নাঃ ধৈর্যের ওপর এতো অত্যাচার সহ্য করা যায় না। নিরুপায় হয়েই মাধুরী উঠে ঘরে গিয়ে তিন বছরের ঘুমন্ত মেয়েটাকে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলে মেজেয় বসিয়ে দিয়ে 'কষকষ' করে কান দুটো মলে দেয় তার। আকস্মিক এ হেন অত্যাচারে সে যা প্রতিশোধ নেবার নেয়।

ছুটে আসে বিভূতি, আসে বাণী, আসেন স্নেহলতা, শুধু ভূপতিই নিরুপায় —সেইমাত্র আসনে বসে পড়েছেন তিনি।

কিন্তু হঠাৎ মেয়েটার কি হলো? ঘুমোচ্ছিলো না?

ঘুমন্ত পড়ে গেলো খাট থেকে?…অনেকগুলো প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। প্রশ্নের উত্তরে মাধুরী মুখ বাঁকিয়ে নিরীহ ক'টি প্রশ্নই করে—চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছে মাধুরী, যে চোখের সামনে খাট থেকে মেয়ে পড়ে

যাবে ? কেন, মেয়ে কি কোনো সময়ে কাঁদে না ? হঠাৎ এমন কি ভাগ্যি ফিরলো তার যে, তিন বাড়ীর লোক ছুটে এসেছে দরদ দেখাতে ?

'তিন বাড়ীর লোক, তিন ঠাঁই হয়।'

বাণী চলে যায় নিজের পড়ার ঘরে, স্নেহলতা স্বামীর আহারস্থলে। বিভূতি বসে থাকে—এসেই যেখানে বসে পড়েছিল।···অপরাধ-বোধের ভাবে মুখ দিয়ে আর বাক্যি সরে না তার। এতোক্ষণে খেয়াল হয়—পাগলের মতো কী আবোল-তাবোল বকে এসেছে! কে জানে—ওই নেহাত 'কথার কথা' টুকুর সুযোগ নিয়ে না আবার বিভূতিকে ফ্যাসাদে ফেলেন ওঁরা। বলা যায় না—ওঁরা সব পারেন! পাকা ঝানু তো!

অসময়ে ঘুম ভেঙে আর সারাদিন নানা রকম 'রপটানি' করে বুদ্ধিটা কেমন ঘোলাই হয়ে গিয়েছিল সত্যি! তা নয় তো ওঁদের সঙ্গে অতো মৌখিক ভদ্রতা করবারই বা দরকার কি ছিল ?···

হাতের ঢিল আর মুখের কথা! ছুঁড়লে তো নিরুপায়।

এখন ভরসা মাধুরী।

বুদ্ধি খাটিয়ে বার করুক কি ভাবে গুছিয়ে কথা বলে ওঁদের মন থেকে ওই অসঙ্গত আশাটাকে দূর করা যায়। জমানো টাকাগুলো বাণীর বিয়েতে খরচ করবে ? সত্যি তো আর পাগল নয় বিভূতি!

বেহুঁশ

'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' না কি মাথামুণ্ডুর জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছিল ছেলেগুলো। ডেঁপোর শিরোমণি, 'প্রায় গুণ্ডা', পাড়ার এই দলটিকে দু'চক্ষের বিষ দেখেন শশাঙ্কমোহন। 'রক্ষীবাহিনী' না ঘোড়ার ডিম! গুণ্ডামি আর হুল্লোড় করবার এ এক নতুন ফন্দি।

যখন তখন নিজেদের মধ্যেই হাতাহাতি মাথা ফাটাফাটি লেগে আছে।

উনিশ শো ছে'চল্লিশের টগবগে রক্তগুলো যেন আর ঠাণ্ডা হলো না এদের। দিন নেই রাত নেই যা হোক একটা ধুয়ো তুলে দিয়ে বীরবিক্রমে হাতিয়ার নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেই হলো।

দু'চক্ষের বিষ, তবু একেবারে তাড়িয়ে দেননি শশাঙ্কমোহন, মনের বিরক্তি চেপে দিয়েছিলেন একটা টাকা। হয়তো বা ভয়েই। তা সে তো পছন্দই হলো না বাবুদের। মুখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হেসেই উঠলো।

একজন একথাও বললো—খাবার লোক নেই, টাকায় অতো মায়া কেন মশাই? টাকার আণ্ডিল বেঁধে বসে আছেন, এখনো সরকারের পয়সা ধ্বংস করে খাচ্ছেন, তবু হাত দিয়ে জল গলে না? টাকা নিয়ে করবেন কি? সৎকাজে ব্যয় করুন না কিছু?

তা বলে—শুনে লজ্জায় লাল হয়ে আবার পকেটে হাত দেবেন এতো বোকা শশাঙ্কমোহন নয়, বরং বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন তার সারার্থ এই—সৎকাজের সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে পৃথিবীতে যে, চার পয়সা হিসেবে চাঁদা দিলেও রাজভাণ্ডার ফতুর হতে দেরী লাগে না। আর—'টাকা নিয়ে করবো কি' এ দুশ্চিন্তা এখনো আসেনি বরং ভাত কাপড়ের ক্রমবর্ধমান অগ্নি-মূল্যের বিষয় বিবেচনা করে হাত আরো ছোটো করা উচিত, এই চিন্তাটাই মাঝে মাঝে কামড় দেয়।

শুনিয়ে দিয়ে বেশ কিছু আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন শশাঙ্কমোহন, কিন্তু

ছোঁড়াগুলো চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা মন্তব্য প্রকাশ করে গেল যে শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

এ আবার কি অপবাদ!

মানে কি এর?

বেহেড় ছেলেগুলো রাগের মাথায় যদি 'শালা ফালা' বলে গালমন্দ করে যেতো, বরং তার মানে পাওয়া যেতো, কিন্তু অহেতুক একটা অপবাদ দিয়ে গেলো কি করে? অথচ শুনে মনে হলো আক্রোশের বশে হঠাৎ বলা নয়—যেন বহুজন আলোচিত বহুকণ্ঠ ঘোষিত নিশ্চিত সত্যটাই বক্রোক্তি করে শুনিয়ে দিয়ে গেল মাত্র।

তবে?

পাড়ার লোকে এই তবে ভাবে শশাঙ্কমোহন আর সারদার সম্বন্ধে?

কেন? কবে কি দেখেছে তারা যে এতোবড়ো গর্হিত ধারণাটা পোষণ করছে মনে মনে? একসঙ্গে এক বাড়ীতে সুদীর্ঘকাল তৃতীয় ব্যক্তিহীন সংসারে কাটিয়ে এসেছেন তাঁরা, তবু এতোটুকু বেচাল হয়নি কোনোদিন, আর অনায়াসে এই নির্লজ্জ কুৎসিত ধারণা করে বসে রইল লোকে? প্রমাণের দরকার হলো না?

তবে কি শুনতে বা বুঝতে ভুল করলেন শশাঙ্কমোহন?

না ভুল কিসের?……ছোঁড়াগুলোর আর যাই হোক—বুদ্ধি এতো মার্জিত যে গালাগালির ভাষার উপর কিছু আবরণ রাখতে জানে।………যা বললো স্পষ্টই।……

"—কঞ্জুষ বুড়োর কথা শুনলি? 'হাত খাটো করা উচিত', হুঁঃ বাবা উচিত বৈকি খুব উচিত, ভাত কাপড় তো একলার যোগাড় করলে হবে না, 'বাড়ীউলির' জন্যেও যে চাই! হি হি হি………হা হা হা। বেহায়া বুড়োর রস কম নয়।………মাগীরও ঢং কতো, গঙ্গা নেয়ে আসে যেন কতোই ধর্মিষ্ঠি! ………মনে করে ডুবে ডুবে জল খাই, শিবের বাবাও টের পায় না, হুঁঃ বাবা! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এই ভণ্ড বুড়োবুড়ীগুলো না সরলে আর—"

শশাঙ্কমোহনকে শোনাবার জন্যই বোধহয় বেশ চড়া গলাতেই বলে গেল।… শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শশাঙ্কমোহন।

এতোকাল পরে এই কথা বলছে লোকে?

তিরিশ বচ্ছর ?

হ্যাঁ তিরিশ বচ্ছর ধরে এ বাড়ীতে বাস করছেন তিনি। তিরিশ বচ্ছর ধরে এই চৌকিটায় শুচ্ছেন—পুবের জানলার দিকে মাথা করে। চটি জোড়াটা রাখছেন দরজার পাশের কোণে। এইখানে রাখছেন কাপড়-চোপড়, ওইখানে —তামাকের সরঞ্জাম।……

তিরিশ বচ্ছর ধরে এ ঘরের আর কোনো পরিবর্তন হয়নি।

শুধু প্রথম দিকে কয়েকটা দিনের রং ছিল আলাদা।

আলনার কাপড়গুলোর উপর ছিল সেই রঙের ছাপ……

সে রং কবে ঝাপসা হয়ে গেছে।……

এখনকার পরিচিত অনেকেরই ধারণা শশাঙ্কমোহন চিরকুমার। অথচ তিরিশ বছর আগে—এ বাড়ীতে প্রথম এসেছিলেন শশাঙ্কমোহন বৌ নিয়ে নতুন সংসার পাততেই।

'বাসায়' থাকার ভারী শখ ছিল নিভাননীর।

সব স্মৃতি প্রায় ঝাপসা হয়ে এলেও প্রথম দিনটির কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে, কে জানে কেন!……শশাঙ্কমোহন ঢুকলেন, পিছন পিছন আবক্ষ ঘোমটা-টানা নিভাননী, সঙ্গে একটা মাত্র ট্রাঙ্ক, একটা বিছানা, একটা বালতি, আর বাজারের কেনা প্রকাণ্ড এক তোলা উনুন।

এই সম্পত্তি।

শশাঙ্কমোহনের গৃহস্থালীর উপকরণ দেখে বেজায় হেসেছিল সেদিন সারদা।

হয়তো সেই হাসিটার জন্যে মনে আছে।

কতো দিন এলো গেলো, বাড়ীওয়ালী সারদাময়ীর হাসি-অশ্রু, রাগ-ঝাল, অনেক কিছুই দেখতে হলো, তবু সেই প্রথম দিনের হাসির শব্দটা আজো মনে পড়লেই যেন কানে বাজে।

সামনের সারির দুটো দাঁত পড়া আজকের এই সারদার হাস্যোদ্রেককারী হাসি নয়—সত্যিকার হাসি।…বাচাল বিধবা যুবতীর উচ্ছ্বসিত হাসি।

হেসে উঠে বলেছিল—এই নিয়ে সংসার পাততে এসেছেন? অবাক্

করলেন যে? বাসনের নাম নেই, দস্যি এক উন্থন! রান্না হবে কি দিয়ে? হাতের তেলোয়? না মাথার খুলিতে?

শুনে শশাঙ্কমোহন কুমোরের দোকানের ভরসা জানিয়েছিলেন মনে আছে। ······বোধহয় দোকানের সন্ধানও চেয়েছিলেন।

তখন সারদার আবার সেই হাসি।

বেশ! বেশ! মাটির হাঁড়ি, কলার পাত, এর চাইতে ভালো জিনিস আর কি আছে! তা' আজকের রাতটা আর উন্থন নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না, এই গরীবের ঘরে নেমন্তন্ন রইল কত্তাগিন্নীর। খুব ভাগ্যি আমার যে, চারখানা হাত-পা-ওলা আস্ত একটা বৌ তবু এনেছেন সঙ্গে।

মনে মনে কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেও মুখে একটু গররাজী ভাব না দেখালে চলে না। 'সেধো'র মতো এক কথায় নেমন্তন্ন নেওয়া যায় কখনো? গুন গুন করে সামান্য আপত্তি দেখাতে গিয়েছিলেন, সারদার হাসির তোড়ে ভেসেই গেল সেটুকু।

—আচ্ছা আচ্ছা খুব লৌকিকতা হয়েছে, এখন আস্থন তো মুখ ধুয়ে। চায়ের জল চড়াচ্ছি।······ভয় নেই জাত যাবে না, সারদাবামনী মুখুয্যের মেয়ে—গোঁসাই বাড়ীর বৌ—বুঝলেন?······কিগো বৌদি, মুখটুখ দেখতে দেবে না নাকি? অতো ঘোমটা কিসের? বাব্‌বাঃ দেখেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে যে।

ভাবতে গিয়ে প্রত্যেকটি কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

হয়তো এমনিই হয়—কিছুই ভুলিনা আমরা, শুধু—অবহেলার ধুলোয় ঢাকা পড়ে থাকে মাত্র।······কোনো অলস অবসর ক্ষণে সেই ধুলোর আবরণ সরিয়ে যদি চোখ মেলে দেখতে চাই—দেখি ঠিকই আছে, কিছুই হারায়নি।······ সামান্য ভঙ্গীটুকু, অতি সাধারণ কথাটি পর্যন্ত মনের পর্দায় ফুটে ওঠে তাজা চেহারা নিয়ে।

নিভাননীর কথাটাও তো স্পষ্ট মনে পড়ছে।

'চারখানা হাত-পা' একখানা মাত্র শাড়ীর মধ্যে বেমালুম লুকিয়ে প্রায় একটি পুঁটলিমূর্তিতেই যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, সে হঠাৎ সারদা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবক্ষ ঘোমটার একাংশ ছুই আঙ্গুলের সাহায্যে তুলে ধরে বলে ওঠে—অসভ্যের মতো হাসছে দেখো! বিধবা মান্থষের অতো হাসি কেন? দেখলে গা জ্বলে যায়।

শুনে শশাঙ্কমোহন চমকে উঠেছিলেন।

চমকে উঠেছিলেন—ছেলেমানুষ নিভাননীর মুখে এরকম একটা পাকা কথা শুনে নয়। চমকেছিলেন কথাটা তাঁর নিজের মনে পড়েনি বলে। সত্যিই তো বিধবা মানুষের পক্ষে এরকম বাচালতা বে-আইনি বৈকি! গা জ্বলে যাওয়াই উচিত ছিল।

কিন্তু মুহুর্মুহুঃ গা জ্বলে গেলেও সারদার হাসি সহ্য করা ভিন্ন উপায় ছিল না শশাঙ্ক-দম্পতির। সংসার পরিচালনা সম্বন্ধে দু'জনেই তাঁরা এমন আনাড়ি যে করিতকর্মা সারদার সাহায্য না পেলে এতোদিনে 'বাসার' শখ ঘুচিয়ে দেশের বাড়ীতে বৌ রেখে এসে আবার সেই মেসের ভাতই খেতে হতো শশাঙ্কমোহনকে।

একেই তো মা বাপের অভাবে বিয়ে করতেই বয়েস বুড়িয়ে গেছে শশাঙ্কর। ……হাসির কিছু নেই, তখনকার আমলে ছাব্বিশ বছরের বর প্রায় বুড়োবরের পর্যায়ে পড়তো।

পনের বছরের নিভাননীও অবশ্য 'ডাগর মেয়ের' পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু হলে হবে কি—বাপমার আদুরে মেয়ে ডাগর হয়েছে শুধু পাকা পাকা কথায়, কাজে অষ্টরম্ভা।

অতএব হরদমই সারদাকে আসতে হতো নিজের এলাকা থেকে। আসতে হতো—উনুন ধরিয়ে দিতে, ভাতের ফেন গালতে, কই-মাগুর মাছ কুটে দিতে, নিভাননীর কাটা আঙ্গুলে জলপটি বেঁধে দিতে আর পোড়া ফোস্কায় আলু-বাটার প্রলেপ লাগাতে।

হামেশাই ওসব বিপদ ঘটতো নিভাননীর।

'নিটপিটে' নিভাননীর দু'বেলা দুটো ঝোল-ভাত রাঁধতেই দম ছুটে যেতো, নতুন বিয়ে আর 'কলকাতার বাসার' রোমাঞ্চকর সুখ অনুভব করবার সময়ই হতোনা তার।

এদিকে দুর্দান্ত গতরওয়ালা বিধবা সারদার সারাদিনই প্রচুর অবসর। বৈধব্যের আনুষঙ্গিক রোগ শুচিবাইগিরি সত্ত্বেও অবসর।

তবু হাবাকালা একটা ভাই আছে গলায় গাঁথা।

এই ভাইটার জন্যেই নাকি শ্বশুরঘর করা হলো না সারদার। নইলে কপাল পোড়ার পরও—জা-ভাসুর নিয়ে যেতে চেয়েছিল, শোনা যায়।

সারদার মুখেই শোনা।

এক একদিন হুমদাম করে এসে নিভাননীর চুলটা নিয়ে পড়তো সে। ভালো করে মোছার অভাবে আধভিজে চুলের গাদায় কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ নিভাননীর।

জট ছাড়াতে ছাড়াতে সারদা বলতো—বরকে বলিস দিকিন গন্ধতেল এনে দিতে। চুলের গন্ধে ভূত পালায়, বর কি করে কাছে বসে লা?

মুখের আগল নেই সারদার।

সামনের দালানে যে স্বয়ং বরটিই বসে আছে সে গ্রাহ্যও নেই।

আচ্ছা, বেছে বেছে কি ছুটির দিনেই আসতো সারদা?

নিভাননী বাধ্য হয়ে চুল বাঁধতো বটে কিন্তু এসব রসিকতা তার ধাতস্থ হতোনা। ......তাই কথার মোড় ঘোরাতে ফিতের ডগাটা দাঁতে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতো—আচ্ছা, সারদা দিদি, তোমার শ্বশুরবাড়ীতে বুঝি কেউ নেই?

এমন কি হাসির কথা এটা?

তবু সারদার হাসা চাই।......নিভাননীর হাড় জ্বলিয়ে দেওয়া হাসি। নেই কি লা? বালাই ষাট! সোনার বিন্দাবন, চাঁদের হাটবাজার। আমার শ্বশুরের ছয় ব্যাটা। শুধু আমার পোড়াকপালের আগুনে একটি খসেছে।

নিভাননী মুখের সামনে হাত আয়নাটা ধরে কেশবিন্যাসের বাহারটা আন্দাজ করতে করতে ভারীমুখে বলতো—এতো সব আছে তো যাওনা কেন সাত জন্মে? নিয়ে যায় না বুঝি?

সারদা খোঁপার ওপর থাবড়া মারতে মারতে বলতো—মিছে কথা বললে নরকে যাবো বাবা, যাবার জন্যে ঢের বলেছে। যাবো কি করে? কেষ্টর কি হবে? ওকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উঠলে কি আর ঠাঁই দেবে কেউ?

কাজে খাটো হলেও তো কথায় খাটো নয় নিভাননী, তাই বেজার ভাবে বলতো—তা আর কে কবে দেয় ভাই? বিধবা ভাদ্দরবৌকে যদি ভাত দেয় তাই ঢের।......তা কেষ্টর জন্যে একটা ভালোমতন ঝি রেখে দিলেই পারো? ...তোমার বাবার এই সব ঘরবাড়ী টাকাকড়ি সবই তো কেষ্টর। নয় কি না?

সারদা গম্ভীর হয়ে যেতো কি না কে জানে। তবে হাসিটা আর শোনা

যেতো না, বলতো—তাই ভাবছি, ঝি-ই একটা রাখবো। হাবা-কালার ভাষা বোঝে এমন একটা ঝি। বলিস না বরকে, একটু খুঁজে দেখতে।

নিভাননী বিরক্ত হয়ে উঠবে এ কিছু অন্যায় নয়। কে না হয় এমন কথায়?

—ও আবার কোথায় পাবে? আর খুঁজতেই বা যাবে কেন?

—খুঁজে দেখবে। কেন দেখবে না? গরজ যখন তোরই বেশী—বলে উঠে যেতো সারদা।

এই ধরনের কথাবার্তা।

এই ভাবেই চলছিল কিছুদিন। হঠাৎ একদিন সংসার ভাঙলো। বসন্ত হয়ে মারা গেল নিভাননী। সারদা বিস্তর খাটলো, বিস্তর সেবা করলো, লাভ হলো না কিছু।

শশাঙ্কমোহন ঘর ছেড়ে দিয়ে পুরোনো মেসে ফিরে যাবার ঠিক করলেন, বাক্স বিছানা বাঁধা প্রায় তৈরী, বেঁকে বসলো সারদা। বললে—রুগীর সঙ্গে রুগী হয়ে শরীরের কী হাল করেছেন দেখুন। এই শরীরে মেসের ভাত খেলে আর বাঁচতে হবে না, আর দুদিন থেকে যান। আমাকে তো রাঁধতে বাড়তে হচ্ছেই, আপনার জন্যে বাড়তি করতে হবে না।......মানে যা লাগে—চাল-ডাল কিনেই দেবেন না হয়।

সত্যি কথা বলতে কি—শুনে হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন শশাঙ্কমোহন।

মেসের জীবন অনেকদিনের অনভ্যাসে যেন ভীতিকর হয়ে উঠেছিল। নেহাত নাকি সারদা একলা থাকে তাই এতোটা অস্বস্তি। কিন্তু সারদা সে অস্বস্তিটা এমন উড়িয়ে দিলে, যেন সেটা একটা চিন্তনীয় বিষয় বলে ধর্তব্যই নয়।

সেই—'দুটোদিন থেকে যাওয়ার' অনুরোধ। আজ এই তিরিশ বছর চলছে সেই অনুরোধের জের।

আশ্চর্য! এতোগুলো দিন মাস বচ্ছর কোথা দিয়ে কাটলো?

কি ভাবে?

প্রথম দিকে উঠে যাবার সংকল্প অনেকবারই করেছেন শশাঙ্কমোহন, আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু সময় আর হলো কবে?

পর পর তুবার ভারী ভারী অসুখ করলো শশাঙ্কমোহনের। চার বছর ধরে 'যায় যায়' অবস্থায় কাটিয়ে কেষ্ট গেল মারা।......সারদার সেই তুঃসময়ে যাওয়াই বা যায় কি করে? একবার তীর্থে গেল সারদা, বাড়ী আগলাতে রেখে গেল শশাঙ্কমোহনকে। অনন্ত চতুর্দশীর ব্রত করলো সেবার, বিস্তর ঘটা করলো উদ্‌যাপনে, তার জন্যেও থেকে যেতে হলো।......কে আছে সারদার উদ্‌যোগ আয়োজন করে দেবার?......

নিত্য সাহচর্যে প্রায় আপনার লোকের মতোই দাবী দাওয়া হয়ে গেছে সারদার। কবে যে 'আপনি' পরিণত হয়েছে 'তুমি'তে, অনুরোধের ভাষা গিয়ে ঠেকেছে হুকুমের ভাষায়, সে আর মনে নেই এখন।

কিন্তু তার বেশী আর কি?

তার বাইরে আর কিচ্ছুই তো নয়! অদৃশ্য একটা গণ্ডি কি তু'জনকেই আপন আপন সীমানায় আবদ্ধ করে রাখেনি? ভেবেচিন্তে কই কিছুই তো করেন নি তাঁরা? লোকে যে কিছু বলতে পারে এ খেয়ালও তো হয় নি কখনো?

সকালবেলা চা দিয়ে যায় সারদা, আর ফিরিস্তি দিয়ে যায় বাজারের।...... টাকা দেয় আঁচল থেকে। বাজার করে ফিরলে গুণে গুণে পয়সা ফেরত নেয় হিসেব করে। ভালোমন্দ জিনিসের সমালোচনা করে নির্ভীকভাবে, তুলনামূলক সমালোচনাও করে—আগের দামের সঙ্গে বর্তমানের। তারপর ব্যস্ত হয়ে লেগে যায় কোটা-বাছা-রান্নায়।

আগে তাড়াতাড়ি খেয়ে অফিস যেতেন শশাঙ্কমোহন, বছর তিনেক সে কাজটাও নেই। সরকারের হিসেবে 'বসে খাবার' অবস্থা হয়েছে তাঁর।... এখন খাওয়ার পর নিটোল একটি ঘুম। ঘুম ভেঙে—বেলের পানা কি মিছরীর সরবৎ খেয়ে একটু গড়িমসি করে একবার পার্কে বেড়াতে যাওয়া।...বেড়িয়ে এসে বাইরের জগতের খবরাখবর নিয়ে খানিক আলোচনা।...সারদা হরিনামের মালাগাছটা নিয়ে দালানের বাইরে রোয়াকে বসে এক টুকরো কম্বলের আসন পেতে, শশাঙ্কমোহন বসেন দালানের ভেতর মাতুরে।

খানিক পরে খেয়ে শুয়ে পড়েন শশাঙ্কমোহন, হয়তো বা একখানা বই টেনে নিয়ে পড়েন কোনোদিন—খুচরো কোনো মাসিকপত্র, কি সস্তার একখানা সাপ্তাহিক।......

সারদা মাঝে মাঝে বলে—"ঠাকুর দেবতার বই পড়লেই হয় একখানা? দুদণ্ড বরং শুনতে পারি বসে।"……ভাগবত একখানা 'কিনবো কিনবো' করছেন শশাঙ্কমোহন, হয়ে উঠছে না।……

পয়সার অভাবে নয়—আলস্যে।

কেউ বেড়াতে আসে না তাঁর বাড়ী, তিনিও বড় একটা যান না কোথাও। তার জন্যেও কোনো অভাব তো কই অনুভব হয়নি কোনোদিন। অভাব? কিছুরইতো কই মনে পড়ে না। একটা দিনের পর একটা দিন আসে…… এইটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। দিনের শেষে রাত্রি আসে এ খেয়াল তো হয়নি কখনো।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! কতোদিন গেছে নিভাননী? আটাশ বচ্ছর না?

এই আটাশ বচ্ছরের মধ্যে একদিনও খেয়াল হয়নি শশাঙ্কমোহনের, জীবনটা তাঁর শুধুই দিনের সমষ্টি? রাত্রির বালাই নেই?

কেন? কেন?

শশাঙ্কমোহন কি পাগল? শশাঙ্কমোহন কি ইটকাঠ? অন্ধের মতো এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এলেন কি চোখ বুজে? কে বারণ করেছিল সারদার সঙ্গে নিবিড়তম কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে?…কে ফাঁসি দিতো মরুভূমির মতো রুক্ষধূসর এই পথটাকে একটু সরস করে নিলে?

ধর্ম? বিবেক? সমাজ?

কই কিছুই তো তেমন জোরালো ঠেকছেনা!

তবে? তবে কি সারদাকেই ভয়?……ভেতরকার সূক্ষ্ম আর সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠলো হঠাৎ।……সারদাকে ভয়?

শশাঙ্কমোহন যদি সর্বনাশের পথ বেছে নিতেন, ঠেকাতে পারতো সারদা?

স্বভাব বহির্ভূত চঞ্চল পায়ে বাইরের ঘর থেকে ভেতরে এলেন শশাঙ্কমোহন।

রান্নাঘরের রোয়াকে বসে বড়ির ডাল ফেনাচ্ছে সারদা।……

—সারদা!

সারদা মুখ না তুলেই বললে—এই যে দিই, ডাল বাটার হাতটা ধুয়ে নিয়ে, দিচ্ছি।

—দেবে? কি দেবে?

—কেন, তেলের টিন? বললে যে তেল আনবে?

—তেল? বলেছি বুঝি?……শশাঙ্কমোহন একবার উঠোনটায় এক চক্কর ঘুরে নেন—তেলের কথা হচ্ছে না। অন্যকথা বলছি—

—অন্যকথা? কিসের কথা? বাজার বেলায়—

—আঃ নিকুচি করেছে বাজার বেলায়—সোজা কথা বলছি—ওসব কিছু নয়।……বলছি—আমার টাইফয়েডের সময়কার কথা মনে আছে তোমার?

সারদা অবাক্ হয়ে তাকায়।—কোন্ সময়কার কথা বলছো বলতো? তোমার সেই ছোটবেলার কথা? বৌ মারা যাবার পরেই—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। বলছি—বাড়ীতে আর কেউ ছিল তখন?

—ওমা! থাকবে আবার কে?……সারদা আবার অবাক্ হয়।

—তবে?……শশাঙ্কমোহন আবার একপাক ঘুরে আসেন।

—তবে? ধরো—তুমি যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে—আমি যদি তখন আটকাতাম তোমায়? কষ্ট করে দাঁড়িয়ে না থেকে বিছানায় বসতে বলতাম? কি করতে?

সারদা ডাল বাটার হাতটা ধুতে ধুতে বলে—সকালবেলা কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কি বকছো যা তা?

—যা তা নয়, যা তা নয়। দাঁড়াও যেও না। শুনে যাও—বলছি—তুমি আটকাতে পারতে? যদি—যদি—বলতাম—পালালে চলবে না সারদা, রাত্রেই রুগীর সেবার দরকার বেশী—কি করতে? থাকতে না?

সারদা এবারে যেন বুঝতে পারে শশাঙ্কমোহনের বক্তব্য। তাই মুচকে হেসে বলে—বোধহয় থাকতাম।

—অ্যাঁ? থাকতে? রাগ করতে না?

—বোধহয় না।

—অ্যাঁ?……অথচ আমি? আমি কি পাগল? আচ্ছা সারদা আমি কতোদিন এ বাড়ীতে আছি?

—বছর তিরিশ।

—ওঃ।……আচ্ছা এর মধ্যে কোনোদিন কোনো বেচাল দেখেছো আমার?

—উহুঁ!

সারদা হাসে।

—তবে ?······তবে কেন ওরা অতো বড়ো কথা বলে গেল ?

রাগে দুঃখে কথা ভারী হয়ে আসে শশাঙ্কমোহনের।

—কি বললে ? কি বলে গেল ? কারা ?

—পাড়ার ছেলেরা। বললে—বলে গেল—তুমি আর আমি—মানে—তোমার সঙ্গে আমার—মানে আমরা নাকি খারাপ।

—এই কথা !

হঠাৎ ঝর ঝর করে হেসে ওঠে সারদা। হাসি শুনে বোঝা যায় না সামনের দাঁত দুটো ফোকলা সারদার।······অদ্ভুত মাজাগলায় বলে—এই কথা ?······কে না বলে ? সবাই বলে। চিরকালই বলে আসছে।

—অ্যাঁ !······কি বললে, সবাই বলে ? চিরকাল বলে ?

—বলবে না কেন ? সবাই তো তোমার মতো হাঁদা নয়। তুমি যে এতো নিরেট কে বিশ্বাস করবে ? চোখকানওলা আস্ত একটা পুরুষ মানুষ যে এতোকাল······রোদটা ছাড়ো, বড়িতে ছায়া পড়ছে।

অভ্যাসের বশেই প্রথমটা সরে যান শশাঙ্কমোহন, সারদার হুকুম মানার চির অভ্যাসে।···বেশীক্ষণের জন্যে নয়, আবার সরে আসেন পায়চারি করতে করতে।

—সারদা !

—উঁ।

—ও কী ছাইপাঁশ হচ্ছে ? রেখে দাও, শোনো একটা কথা।

সারদা একটা ভ্রূকুটি করে বলে—যা বলবে ঠিকই শুনতে পাবো, কান দিয়ে তো বড়ি দিচ্ছি না।······দেখো কাঁসিটায় পা ঠেকিও না।

—ধেত্তরি তোমার কাঁসি।······বলছি আমরা কেন এতোকাল এ রকম বোকামী করেছি ?

সারদা আর একবার মুচকে হেসে বলে—আমিও তো তাই ভাবি।

—ঈস্ !······দ্রুত পায়চারি করতে থাকেন শশাঙ্কমোহন······অথচ দেখো —ইচ্ছে করলেই তো আমরা—অ্যাঁ ?······কী আশ্চর্য ! ভেবে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি সারদা, আমরা কেন সত্যি খারাপ হইনি।

—তা সত্যি—সারদা যেন ঝোলে নুন দিতে ভুলে গেছে—এমনি আপসোসের ভঙ্গীতে বলে—বড্ডো ভুল হয়ে গেছে, তাইতো—

—এদিকে দেখো—লোকে কি অপবাদ দিতে ছাড়লো? শুধু শুধুই তো দিচ্ছে! তবে? কী হলো এতোকাল সাধুতা করে?

—সাধুতা!……

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সারদা, বড়ির ডালমাখা হাতটা শশাঙ্কর মুখের সামনে নেড়ে বেখাপ্পা হেসে ওঠে—সাধুতা! খুব যে বড়ো বড়ো কথা শুনতে পাচ্ছি, সাধুতা কথার মানে জানো? বেহুঁশ বোকা কোথাকার!

চমকে ওঠেন শশাঙ্কমোহন, আর একবার চমকে ওঠেন। একটু আগে—আচম্‌কা—সারদার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্বন্ধের ইঙ্গিত পেয়েও এতো চমক খাননি।

বেহুঁশ!

তাই তো বটে! ঠিকই তো। 'সাধুতা করছি' এ হুঁশই বা ছিল কবে? কৃচ্ছ্রসাধনের আত্মপ্রসাদটাই তো গেছে মাঠে মারা। সাধুতা না করলেও যে পৃথিবী রসাতলে যেতোনা, চন্দ্রস্থর্য নিজের নিয়মে ঠিক থাকতো এ খেয়াল কেন হয়নি এতোকাল?

নিছক অন্যমনস্কতার জন্যে আস্ত আস্ত দুটো জীবন স্রেফ বাজে খরচ!

উঃ কী সাংঘাতিক লোকসান।……সারদাকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব বলেই যে বাড়ীটা ছাড়বার সুযোগ সুবিধে আর হলো না কোনদিন, সে চৈতন্য ছিল কই?

—সারদা—কাতর স্বর শশাঙ্কর কণ্ঠে—তুমি তো সব বুঝতে সারদা, তবে তুমি কেন—

—কী? কী—'আমি কেন'?……পায়ে ধরিনি কেন তাই শুধোচ্ছো? বলি গঙ্গায় কি জল ছিল না?……নাও সরো দিকিন এখন। যে রকম 'ঘুরঘুর' করছো—ঠিক আমার বড়িগুলো ছুঁয়ে দেবে তুমি।

মুখ চুন করে সরে যান শশাঙ্কমোহন, অভ্যাসের বশেই যান।

অথচ—সারদাই কি কম বেহুঁশ? চিরদিন এই স্পর্শদোষের আতঙ্কটাই কি বোকা বানিয়ে রাখেনি শশাঙ্ককে? বড়ি, আচার, আমসত্ব, আর হাঁড়ি-কলসীর মতো নেহাত নির্জীব বস্তুতেও যেখানে স্পর্শদোষের এই বিষম বিভীষিকা, সেখানে—জলজ্যান্ত মানুষটাকে নাগালের মধ্যে পাবার স্বপ্নই বা দেখবে শশাঙ্ক কোন্ সাহসে?

বন্দিনী

কপালে 'সিঁথি ঝাঁপ্টা', নাকে নোলক, গলায় সাতনরী হার। সর্বাঙ্গেই নতুন গিনিসোনার ছটা। পায়ে—ঘুঙুর-গাঁথা মলের নীচে আবার ভারী ভারী 'পানকল্কা' বসানো 'চরণপদ্ম'।

সভ্যদেশের লোকের চোখে পড়লে বলতো—'অত্যাচার'।

তবে আমরা এখনো প্রায় সভ্য হয়েও এসব বস্তুকে অলঙ্কারই বলি। ……তা' সে যাই হোক—অলঙ্কারের ঘটা যতোই থাক, গায়ে জামা সেমিজের বালাইমাত্র নেই।…সোনালি জরির তেরছা ডুরে টানা একখানা ঘোর বেগুনী বেনারসী শাড়ী পরনে।

অবশ্য 'পরনে' না বলে জড়ানো বললেই বেশী ঠিক বলা হয়।

আট বছরের মেয়ের পক্ষে—সাঁচ্চা জরির ভারে ভারাক্রান্ত পুরোপুরি একখানা শাড়ী সত্যিই কি আর পরা সম্ভব? তাই ঝকঝকে আর মটমটে আঁচলাটা মমতালেশহীন-চিত্তে গুটিয়ে সুটিয়ে কোলের উপর জড়ো করে ধরে নববধূ ঊর্ধ্বমুখে আর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঠাকুর-দালানের উচ্চতা নিরূপণ করতে থাকে।

উঃ কতো মোটা মোটা আর কি ভয়ঙ্কর উঁচু উঁচু থাম। থামের গায়েও আবার কতো বাহার, চিত্তির বিচিত্তির করা! কার্নিশগুলোর বাহার দেখলে তো তাক লেগে যায়!……

অতো উঁচুতে উঠে অতো লতাপাতা আঁকলো কে? মিস্তিরি? কিন্তু কি করে?…খিলেনের পর খিলেন……দালানের ভিতর আবার দালান, ঠাকুরের বেদীটা কতো দূরে—ঈস্!……

দেওয়ালগুলোই বা এমন চকচকে হলো কি জন্যে?

স্বর্ণকুমারীর নিজের বাপের বাড়ীতে না হয় মাটির দেওয়াল, কিন্তু পাকা দেওয়াল কি দেখেনি? কেন ঠাকুর-দালানই তো দেখেছে মুখুয্যেদের। …মুখুয্যেদের তো চাষাভুষোরা 'রাজাবাবু' বলে। …উঃ কী জোর ঘটা হয় তাঁদের বাড়ীতে পূজোর সময়।

সব পূজোতেই হয়—কিন্তু সব থেকে বেশী ছুর্গা পূজোয় পূরো চারদিন ধরে খালি বাজনা বাজে।……বাজনার আওয়াজে সব সময় যেন বুকের মধ্যে গুমগুম শব্দ হ'তে থাকে।…ঠিক ভয় করার মতো।…সেই কেমন এক আতঙ্ক-মিশ্রিত আনন্দময় মানসিক অবস্থা নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পূজোর দালানের আশে পাশে ছেলে বুড়ো, ইতর ভদ্র, সাধু ফকির, ঢাকী ঢুলী, অনেকের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে শুধু ঘুরে বেড়ানো…কী অদ্ভুত মজা লাগে সেই চারটি দিন।

'পেসাদের' ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটার স্মৃতিটাও কম হৃদয়গ্রাহী নয়।…আঃ মনে করলেই যেন 'তিলপিটুলী বেগুন ভাজার' গন্ধ নাকে এসে লাগে। বুকের মধ্যে বাজনার শব্দ 'গুমগুম' করে ওঠে।… সকলেই জানে 'রাজাই' কাণ্ড মুখুয্যেদের।

কিন্তু তা'ও এরকম চকচকে দেওয়াল তো নেই তাঁদের? একটু হাত ঘসে দেখবার লোভ অনেক কষ্টেই সংবরণ করে স্বর্ণকুমারী। নেহাত নববধূ এবং সঙ্গে মেজননদ শ্যামা রয়েছে বলে। কি জানি কি বলে বসে দেখলে! বিয়ের আগে তাকে উঠতে বসতে যতো সাবধান করা হয়েছে, তা'র কোনো কথাটাই স্পষ্ট মনে না থাকলেও একটা অপরাধী আর আতঙ্কিতভাব শেকড় গেড়ে গেছে মনের মধ্যে। কোনো কিছু—নির্দোষ কিছু করতে গেলেও ভয় করছে কাল এদের বাড়ী আসা থেকে।

শুধুই তো শ্বশুরবাড়ী নয়—বড়লোক শ্বশুরবাড়ী যে।

স্বর্ণকুমারী শুনেছে সব কত কথা—পিসিমা আর মা'তে যতো গল্প হচ্ছিল সেদিন।…খুব নাকি বড়লোক এরা।…মুখুয্যেদের চাইতেও অনেক—অনেক বেশী; ধেৎ তাই কি আর হয়? কে জানে হবেও বা!…এই তো গয়না আর চকচকে সব কতো কাপড় দিয়েছে এরা স্বর্ণকুমারীকে।…

স্বর্ণকুমারী ফরসা বলে আর অনেক বেশী চুল আছে বলেই নাকি বৌ করলো এরা। নইলে করতো না কি? স্বর্ণদের তো তিনটে মোটে মাটির ঘর।…যাকগে মরুকগে…দৈত্যপুরীর মতো বড়ো একটা বাড়ী আর গাদা গাদা লোক দেখে তো হাঁপিয়েই উঠেছে স্বর্ণ কাল থেকে।…কোথায় ঘর, কোন্‌দিকে দালান, ক'টা সিঁড়ি বুঝতেই পারা যায় না।

তার থেকে এই পূজোর দালানই ভালো।

ভালোর মতো ভালো। দেখলে সমস্ত শরীর যেন আনন্দে অবশ হয়ে আসে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে বটে বড়োলোক !

মুখুয্যেদের চাইতে অনেক বেশীই বড়োলোক !

—ঠাকুরঝি শোনো ভাই—নববধূ-জনোচিত ফিসফিস স্বরে সোৎসুক প্রশ্ন করে স্বর্ণ—ওপরে ছাতে সারি সারি অতো লোহার বালা ঝুলছে কেন ?

'ঠাকুরঝি' না বলে উপায়ও নেই, কাল আসামাত্রই শাসিয়ে রেখেছে শ্যামা—খবরদার নামটাম করো না বলছি, আমি তোমার চেয়ে এক বছরের বড়ো হই বুঝলে ? 'ঠাকুরঝি' বলবে।

—বালা কি গো বৌ ? শ্যামা হেসে ওঠে—ঝাড়-লণ্ঠনের আঙটা ওগুলো। ...ঝাড়ের আলো দেখোনি বুঝি কখনো ? ...দেখেছো ? তবে ? একশো বাতির সব ঝাড় ঝুলিয়ে দিতে হয় ওখানে। আর এই সামনে যে ছুটো দেখছো—টানাপাখা ঝোলায় ওতে।...টানাপাখা দেখেছো তো ?

ঝাড় লণ্ঠন ! ওঃ।

মুখুয্যেবাড়ীতে জ্বলে বটে—একটা।...

যাত্রার আসরের ঠিক সামনে নাটমন্দিরে। কিন্তু—দালানে এতো আলো ! উঃ সবগুলো একসঙ্গে জ্বেলে দিলে কী মজাই হয় ! লোকে বুঝতেই পারবে না নিশ্চয় দিন না রাত্তির।

এদের কি সবই অদ্ভুত ?

দেউড়ীর মাথায় দিব্যি একখানা ঘর বানিয়ে রেখে দিয়েছে, নহবতওলারা নাকি ওর উপর চড়ে বসে সানাই বাজাবে। শোনো দিকিন কথা ? উঠবে কি করে ? মই দিয়ে ?......

নাঃ, দালান বটে !

পায়ের পাতাটা মেঝেয় চেপে চেপে শ্বেতপাথরের শীতলত্বটুকু অনুভব করবার চেষ্টা করে স্বর্ণ।

অভিভাবিকা শ্যামা এসব ভাববিলাসের ধার ধারেনা, সে নববধূর একটা

হাতে টান মেরে রীতিমত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে—হাঁ ক'রে ওপরমুখো হয়ে দেখছো কি? বেদীতে পেন্নাম করে, চলে যাই চলো তাড়াতাড়ি। মা বকবেন যে দেরী হলে।

খিলেনের পর খিলেন গাঁথা…থামের সারির পর থামের সারি…চারখানা দালান পার হয়ে শেষেরটায় দেবীর আসন গাঁথা।…প্রায় দু'হাত উঁচু প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া মার্বেল পাথরে গড়া বেদী……তার ওপর চড়ানো রয়েছে বহু কারুকার্যখচিত কাঠের 'কাঠরা'।

কী বিরাট! কী প্রাণভরা! উঃ! এই কাঠরায় যখন প্রতিমা সাজানো হয়?

শ্যামা নিজেই তাড়াতাড়ি বেদীর গায়ে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে নিয়ে তাড়া দিয়ে ওঠে—নাও—করো পেন্নাম?

—কাঠরাখানাও দেখতে হবে হা করে? আদেখলে ঘরের মেয়ে কি না!

ন'বছরের মেয়ের মুখে এই কথা! না, অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। শ্যামার মাত্র ন'বছর বয়স বলে সংসারের কোনো কথা কেউ তার সামনে রেখে ঢেকে বলবে তা তো নয়?

তা' স্বর্ণ অবশ্য এতোবড় অপমানেও বিশেষ বিচলিত হয় না। তেমনি উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল স্বরে বলে—এ কী কাণ্ড ঠাকুরঝি? কতো বড়ো 'পিরতিমে' হয় ভাই? দালানের ছাতে ঠেকে যায় না তো?

শ্যামা ঠোঁট উল্টে বলে—পূজোই হয় না তা' পিরতিমে।

পূজোই হয় না!

সে আবার কেমন কথা! শ্যামার কি মাথার ঠিক নেই?

স্বর্ণ একটা মানে ঠিক করে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—ছি ঠাকুরঝি, ওরকম ঠাট্টা করতে আছে নাকি?

—ওমা ঠাট্টা আবার কি? জিগ্যেস কর গিয়ে সবাইকে। হাঁ, আগে পূজো হতো শুনেছি, খুব ধুমধাম করেই হতো। সাত গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন খেতে আসতো। বাজনাবাদ্যির শব্দে নাকি কালা হয়ে যেতো অনেকে।… …সে তখন আমি জন্মাইনি।……এখন উঠে গেছে।

—পূজো উঠে যায়?

বিস্ফারিত দৃষ্টি আর রুদ্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্ন করে স্বর্ণ।

—তা' উঠে যাবেনা? খুঁত হয়ে গেলো যে!

—খুঁত? সে কি ঠাকুরঝি?

—আঃ তা'ও জানো না নেকি। কেউ মরে গেলেই খুঁত হয়ে যায়।...... আমি জন্মাবার আগের বছরই অষ্টমী পূজোর দিন সক্কালবেলা নাকি সব্বাই এসে দেখলে আমার যে বড়ো ভাই ছিল—কেষ্টগোপাল—সে ওই দালানে ঠাকুরের সামনে মরে রয়েছে!

—অ্যাঁ! সে কি ঠাকুরঝি? কি করে হলো?

—তবে আর বলছি কি।......কি করে হলো তা কে জানে। কবরেজে নাকি বলেছিল 'সন্নিসী রোগ' না কি। মা কেঁদে কেঁদে বললেন, 'পূজোয় অপরাধ হয়েছে—আর কখনো পূজো করবো না।

জন্মাবধি শতাধিকবার শোনা কাহিনী স্বচ্ছন্দেই বলে যায় শ্যামা। কোনো ভাবলক্ষণই প্রকাশ পায় না তার মুখে। কিন্তু স্বর্ণ? শুনে স্বর্ণরই যে সন্ন্যাস রোগ হবার যোগাড়!

—মরে গেল ছেলেটা! তাইতো। কিন্তু 'প্রমাই' ফুরোলেই তো মানুষ মরে যায় ঠাকুরঝি, তাই বলে 'পূজো করবোনা' বলতে আছে? অ্যাঁ! তাতে বুঝি পাপ হয় না?

—কে জানে বাবা পাপ-পুণ্যি বুঝিনা। যা শুনেছি তাই বলছি। ......পূজোর চারদিন ধরে শুধু কাঠরার ওপর একটা 'ঘি-র পিদ্‌দিম' জ্বলে রাতদিন ভোর।......আর কিছু না।

বেনারসীর আঁচল জড়ো হতে হতে ক্রমশ কোল আঁচলে টান ধরে...অতো খেয়াল নেই স্বর্ণর, নিতান্ত শূন্য মনে সে আবার ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিক তাকিয়ে দেখে।......কিন্তু সে আনন্দ, সে ঔৎসুক্য কই...

পূজো হয় না! পিরতিমেই আসে না!

প্রতিমাহীন এই শূন্য বেদীখানা খাড়া করে রাখার অর্থ কি তবে?

হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকা একটা কাণ্ড করে বসে—কাঠরায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে—রীতিমত জোরের সঙ্গে বলে ওঠে—আমি বড়ো হয়ে আবার পিরতিমে আনবো—পূজো করবো। করবো করবো করবো —তিন সত্যি।

—বৌ!...

ক্ষুদে শ্যামার কণ্ঠেও যেন আগুন ঝরে পড়ে—কী সর্বনাশ করলি? অ্যা? …বেদী ছুঁয়ে তিন সত্যি করলি? পাপে ডুবে নরকে যাবি যে।

স্বর্ণর স্বরটা এবারে একটু দুর্বল শোনায়—বাঃ, 'তিন সত্যি' করে না রাখলেই তো নরকে যায় মানুষ! রাখলে পরে দোষ হবে কেন?

—রাখবি কি করে শুনি? এ দালানে আর পূজো হবে না কি কখনো?

—বাঃ কেন হবে না? মানুষ বুঝি মরে যায় না? ঠাকুরের কি দোষ হলো?

—দোষগুণ বুঝিনা বাবা—চলো তোমার কীর্তি বলে দিচ্ছি সবাইকে।—অ্যা! নতুন ক'নের আস্পদ্দা দেখো! উনি বড়ো হবেন—হয়ে পূজো করবেন! গিন্নী হবার শখ এখুনি।—কী ঘেন্নার কথা বাবা।……এই জন্যেই বলে ছোটোঘরের মেয়ে আনতে নেই।

স্বর্ণ এবারে একটু আহত হয়; বোধকরি 'ছোটঘর' কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় বলেই।…কিছুক্ষণ পূর্বের ভীতভাব ছেড়ে দৃপ্তভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে বলে—বেশ আমরা গরীব আছি—আছি। আমাকে বৌ করবার কি দরকার ছিল তোমাদের শুনি?……ভারী তো বড়োলোক! দুগ্‌গা পূজো হয় না, আবার বড়োলোক!……

'শ্বশুরবাড়ী' নামক ভীতিকর স্থানটি সম্বন্ধে বহু হিতৈষিণীর বহু উপদেশ আর শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে স্বর্ণকুমারী বধূজীবনের প্রারম্ভেই একটি রেকর্ড রেখে বসে থাকে।

আটবছরের মেয়ের পক্ষে অপরের মুখের পাকা কথাগুলো আয়ত্ত করা যতো সহজ—ততো সহজ নয় সদুপদেশগুলো।

শ্যামাও রাগে গরগর করে দালান থেকে নেমে পড়ে—বেশ বেশ, আমি এই চল্লাম বলে দিতে।……ওমা ওমা কাণ্ড দেখো—কাপড়টা খুলে যাচ্ছে কোমর থেকে।…হি হি হি।…ভালো করে কাপড় পরতে পারে না, এখুনি গিন্নী হওয়ার শখ!

'বলে দেওয়ার' নামে ভয়ে বুক দুড়দুড় করে উঠলেও তেজস্বিনী নববধূ অনুনয় করতে যায় না।…আরক্ত মুখে সেই দশহাত শাড়ীখানা সামলে পরবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে তা'র পিছন পিছন ছোটে।……

জনশূন্য এই বিরাট দালানে—শূন্যবেদীর সামনে একলা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস তা'বলে তার নেই।

সত্যবন্ধের ইতিহাস এই।

বিয়েবাড়ীতে অজস্র লোকের মুখে মুখে সেদিন যা ঝড় উঠেছিল ছোট্ট এই মেয়েটার ঔদ্ধত্যের পরিচয়ে, সেকথা আজও মনে আছে স্বর্ণকুমারীর।··· বধূর শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তার আমন্ত্রিত পিতাকেও কম গঞ্জনা খেতে হয়নি। ···রূপের জন্যে ছোটোঘরের মেয়ে এনে যে কতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন সে কথা বাড়ীর কর্তাকেও ধিক্কার দিয়ে জানানো হয়েছিল।······

নতুন ক'নের এতোবড় কথা! এতো দুঃসাহস!!

স্বর্ণকুমারীর বয়েস যে মাত্র আট এই কথাটাই শুধু মনে পড়েনি কারুর।

অনেক কাণ্ড, অনেক কথা, অনেক 'ছিছি'কারের পর শ্বশুর ভগবতীচরণ এক সময় বৌকে ডেকে বলেছিলেন—শোন বৌমা, ঠাকুরের বেদী ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছো তুমি, তা' পালন তোমাকে করতেই হবে—কখনো না কখনো। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে এ-দালানে পূজো হবার উপায় নেই। তবে তোমাকে অনুমতি দিয়ে যাবো—আমরা দু'জনে মরে গেলে—প্রতিমা এনে পূজো কোরো। না করলে অনন্ত নরক।

সেই আট বছর থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত 'অনন্ত নরক ভোগের' আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে কাটিয়ে এসেছেন স্বর্ণকুমারী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শাশুড়ী মারা গেলেন বৈশাখে—সেই শ্রাবণেই শ্বশুর গেলেন রক্তাতিসারে ভুগে।

আটচল্লিশ বছর বয়েস তখন স্বর্ণকুমারীর।

তখন স্বর্ণকুমারীর সাত আট ছেলে মেয়ে···কারুর বিয়ে হয়েছে, কারুর হয়নি।···মেয়ে জামাই নাতি নাতনীতে এলাহী কাণ্ডর সংসার। ব্রতকথার মতো—'ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনুন জ্বলন্ত।'···

জীবনের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বইছে রাত্রিদিন!

শ্বশুর-শাশুড়ীর কালাশৌচের বছর পার করে—প্রতিমা এনে পূজো করবার দৃঢ় সংকল্প ভেস্তে দিয়ে গেল মেজছেলে নবীন···ভাদ্রের শেষে হঠাৎ মারা গিয়ে।···বিয়ে হয়েছিল বছর দুই।

এদিকে অবস্থায় ভাঙন ধরেছে আস্তে আস্তে।

অপদার্থ স্বামী······অনেক রকম নেশার তাড়নায় অলক্ষিতে স্বর্ণকুমারীর

ভাগ্যের ঘরে সিঁদ কেটে কেটে সংসারের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছেন ধীরে ধীরে।

যখন ধরা পড়লো তখন বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই।

জমিদারী নেই, নাম আছে।

শূন্যগহ্বর লোহার সিন্দুকের মতো অন্তঃসারহীন সেই নামের ভার বহন করে করে দীর্ঘপথ এগিয়ে চলা কী কষ্টকর! কী সেই দিন স্বর্ণকুমারীর!... সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত রুক্ষ-কঠোর হৃদয়! তবু ওপরে আনতে হবে কোমলতার আবরণ, রাখতে হবে চাকচিক্য!

প্রজারা আসে...কুটুম্বসাক্ষাৎ আসে...আসে দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়বর্গ —আগের মতোই আশা নিয়ে।...কেবলমাত্র মুখের কথা, কেবলমাত্র হাসির প্রলেপে, কেবলমাত্র অদূরভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে কতোদিন আর ভোলানো চলে তা'দের?...

অবশেষে...নামও গেল।

রইল শুধু...নিতান্ত অভাবগ্রস্ত বিরাট একটি সংসার, পতনোন্মুখ বিরাট এই অট্টালিকা আর অসাধ্যসাধনের দুশ্চর তপস্যা।

একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে টাকায় পরিণত করতে কম দিন লাগে কি?

সাত গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন করে হাজার বাতির ঝাড় ঝুলিয়ে পূজো করবার দুর্দমনীয় সাধ আর নেই...কিন্তু একবার যেমন তেমন করে পূজো করবার মতো অবস্থাই বা এলো কই স্বর্ণকুমারীর জীবনে?

কি করবেন স্বর্ণকুমারী? কি করবেন?

প্রায় শৈশবের পরিণামহীন নির্বুদ্ধিতার বশে একদা যে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে তিনসত্যি করে বসেছিলেন—আর তিনহাজার বার সেই পাষাণে মাথা ঠুকলেও কি কিছু ফল হবে?

দেবতা এমনিই কঠিন? এমনি একচোখো?

বুদ্ধিহীন বালিকার অর্থহীন প্রতিজ্ঞার অর্থ আছে তাঁর কাছে—নেই সারা-জীবনের প্রার্থনার? তবে কি এ স্বর্ণকুমারীর অনধিকার চর্চা? অসঙ্গত সাধ? তাই বারেবারেই তাঁর সাজানো ব্যবস্থা চূর্ণ হয়ে যায়...? তা নয়তো কেন

—প্রতিটি বছর এই একই নাটকের অভিনয় দেখে আসছেন স্বর্ণকুমারী।…

যেই শরতের হাওয়া ওঠে, মনের মধ্যে বেজে ওঠে আগমনীর বাঁশী…সেই ঘটতে থাকে অভাবিত সব ঘটনা।…

রোগ শোক…অর্থাভাব…আকস্মিক বিপদ।…

একটি দুটি করে জমানো অর্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যেতে দেরী লাগে না।

কিন্তু এততেও সংকল্পই বা ছাড়েন না কেন স্বর্ণকুমারী?

কিসের এই বন্ধন?—সংস্কারের? প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপের?…না প্রায় আজন্মের উগ্র আকাজ্ক্ষার? এই বিরাট শূন্য বেদীতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করলে কেমন দেখায় একবার চোখ ভরে দেখবার সাধই কি অবিরত খোঁচা দিয়ে আসছে না স্বর্ণকুমারীকে?

কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন! নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারই বা কবে করলেন তিনি?

হায়! স্বর্ণকুমারীর শরীরটা যে ভেঙে পড়ছে ক্রমশ।

আর কি পারবেন তিনি দুর্গোৎসবের ধাক্কা সামলাতে? ঘটা না থাক—ল্যাঠা তো থাকবেই?…লোকবল নেই, নেই অর্থবল। সেজছেলে—সুরেশ, কেবলমাত্র যে ছেলে—মোটা মাইনের চাকরী করে; সেই তো আজ দশ বছর বাড়ীছাড়া। কেউই থাকে না কাছে। অন্য ছেলেরা ছুটিছাটায় আসে যায়।

প্রতিবছর পূজোর আগে চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে যান স্বর্ণকুমারী।… নিজের ক্ষমতা নেই লেখবার—তাই প্রত্যেকবার একই লোককে দিয়ে লেখাতে লজ্জা করে…বারে বারে লেখক বদলান—পাড়ার ছেলেদের খোসামোদ করে করে।

এবারে অনেক বলা-কওয়ায় পাঁচশো টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিল সুরেশ… সেটাকা খরচ হয়ে গেল তাদের পিতৃশ্রাদ্ধে।—তবে? সুরেশেরই বা অপরাধ কি?

এবারেও হলো না।

সাদা ধবধবে নতুন থানপরা স্বর্ণকুমারী সপ্তমীর সকালে বেদীতে সিঁদুর চন্দনের ফোঁটা আর প্রদীপ জ্বেলে দিতে এলেন।

পুরনো আমলের প্রকাণ্ড ভারী পিতলের প্রদীপ—ভর্তি করে ঘি দেবার অবস্থা আর নেই এখন।...হাতে করে বয়ে উঁচুতে তুলে দেবার ক্ষমতাই কি আছে আর?

বার্ধক্যের সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কোমরটাও যে একেবারে ভেঙে গেছে।

নতুন থানের খসখসে আঁচলটা দিয়ে চোক মুছতে গিয়ে হঠাৎ একখানা নতুন বেনারসী শাড়ীর খসখসে আঁচলের ঝলক যেন বিদ্যুতের মতন খেলে গেল চোখের সামনে।...

না, চোখের সামনে নয়—মনের সামনে।...

সেই শাড়ীপরা ছোট্ট মেয়েটাকে হাতে পেলে ধরে একবার আছাড় মারেন না কি স্বর্ণকুমারী?...যে হরণ করেছে স্বর্ণকুমারীর দীর্ঘ জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি! অহরহ দংশন করছে মনের মধ্যে! যে আজ অতি-আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকেও ডাকতে দিচ্ছে না সাহস করে!

চারদিক তাকিয়ে দেখলেন স্বর্ণকুমারী।

স্বর্ণকুমারীর দেহের মতো—দালানেও ঘুণ ধরেছে।...

সামনের দুখানা দালানের একটা দিক খসে পড়ে ইটের স্তূপ জমা হয়ে পড়ে আছে ওদিকে। নহবতখানার চিহ্ন মাত্র নেই, দেউড়ীর ইটগুলো স্তূপ হয়ে পড়ে থাকার কুদৃশ্য দেখতে না পেরেই বোধহয় প্রতিবেশীরা দয়া করে ইটগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে গিয়ে সাফ করে ফেলেছে। ...উঠোনে আগাছার ঘাস!... থামগুলো দাঁত বার-করা...ঝাড়লণ্ঠন টাঙাবার সেই আঙটাগুলো—বালির আস্তর আর ছাদের টালিগুলো সুদ্ধ নিয়ে খসে পড়েছে অনেকেই...মরচে-ধরা এক-আধটা এখনো আছে আটকে।

শ্বেতপাথরের মেজেটা বিবর্ণ খসখসে...পঙ্খের কাজ-করা চকচকে সেই দেয়ালগুলো পুরনো পালিশের কিছু চিহ্ন আর বিবর্ণ রঙ নিয়ে যেন কোনো-রকমে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

চিত্রবিচিত্র-করা কাঠের কাঠরাখানা ইঁদুরে কেটে কুটিকুটি করেছিল সেবছর

—এবারে দেখা যাচ্ছে ঘুণে আর রাখেনি কিছু। দেয়ালের কার্নিশের প্রত্যেকটি খোপে খোপে পায়রার বাসা, চামচিকের আস্তানা।

অথচ আজও সত্যরক্ষা হয়নি স্বর্ণকুমারীর।

প্রতিমাহীন শূন্যবেদী আজও অপেক্ষা করছে সার্থক হবার আশায়। অপেক্ষা করছে ঐশ্বর্যময়ী মহাশক্তির আবির্ভাবের।

পরের বছর বৈশাখ থেকেই শয্যা নিলেন স্বর্ণকুমারী।

আর দিন নেই—আর দিন নেই।

সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় ছাপিয়ে ভারী হয়ে উঠছে সেই কণ্টকিত আশঙ্কা। এই দীর্ঘদিন এতো পরিশ্রম, এতো সংগ্রামের শেষে স্বর্ণকুমারীর জন্যে কিনা তোলা আছে অনন্ত নরক ?

ভাদ্রের শেষে ছেলেমেয়ে সকলেই দেখতে এলো।

উনসত্তর বছরের হিসাব নিকাশ শেষ করে এবার তা'হলে চললেন স্বর্ণকুমারী !

—কিন্তু মরেও যে আমার শান্তি নেই বাবা।···

ছেলেদের হাত ধরে ধরে কাতর প্রার্থনা করলেন স্বর্ণকুমারী—আর একটা মাস টায়ে টোয়ে বেঁচে থাকবো বাবা—শেষ অনুরোধ রাখ বাবা আমার। একবার 'পিরতিমে' এনে পূজো কর ওই দালানে, নিজের চক্ষে দেখে যাই আমি।

ছেলেরা উড়িয়ে দিয়ে বললে—ক্ষেপেছো।

জানছে বড়োজোর আর এক সপ্তাহ টিকবে বুড়ী।

—পেটের ছেলে হয়ে আমার পরকালের সদ্‌গতির চিন্তা করবি না তোরা ? চিরদিন তোদের জন্যে জীবনপাত করলাম।

—সে তো সকলেই করে থাকে মা, কিন্তু সে কথা নয়! —কথা হচ্ছে পরকালে স্বর্গ তোমার আটকায় কে ?···অনর্থক বাজে একটা কুসংস্কার নিয়ে—

—থাক বাবা, ও কথা বোলোনা। আচ্ছা আমি মা, আমার হুকুম বলেই করো তবে ?···কখনো তো কোনো হুকুম করিনি।

—বুঝলাম তো করোনি—কিন্তু দেশের অবস্থা জানো এখন! খবর রাখো কিছু?···একখানা কাপড় পাওয়া যায় না—একমুঠো চাল মেলেনা।···চার পয়সার জিনিস চার টাকায় কিনতে হয়।···

—যেমন তেমন করে কর! চিরদিনের আকিঞ্চে আমার।

—যেমন তেমনও সোজা নয় মা—মেজবৌ টানাটানা সুরে বলে—ভালো সময়েই বা আপনি নিজে পেরে উঠেছিলেন কই?

স্বর্ণকুমারীর কোটরগত চক্ষুতেও একবার পূর্বকালের আগুনের আভা ঝলসে ওঠে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, থাক মেজবৌমা, তোমাকে সাউখুরি করতে বলিনি, আমি বলছি—আমার ছেলেদের। তোমরা পারবে কি না বলো?···সুরেশ? দীনেশ? জগদীশ? খোকা?···পারবে না? আচ্ছা বেশ।···

ছেলেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন স্বর্ণকুমারী! আশ্চর্য! সপ্তাহের মধ্যে টেঁসে যাওয়া তো দূরের কথা—বরং একটু ভালোই হয়ে উঠলেন! অগত্যা যে যার কর্মস্থলে যাবে না কি করবে?···

স্বর্ণকুমারীকে কে দেখবে?

সে তো পুরনো আমলের নাপিতবৌ রয়েইছে।

পূজো পর্যন্ত—স্বর্ণকুমারী বেঁচেই রইলেন।

বোধনের বাজনা বেজে উঠলো চারদিকে···কিন্তু বিসর্জনের যে আর দেরী নেই সেটা হৃদয়যন্ত্রের বৈকল্যে অনুভব করছেন ক'দিন।

কি হবে? কি হবে?

হে মা দুগ্‌গা কি করলে!

আবার সুদিনের আশায় একটি বছর অপেক্ষা করার সময় কই? হঠাৎ মহালয়ার পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে নাপিতবৌকে ডেকে বললেন—রতন কুমোরকে ডাকতে পারিস মা?

—রতন কুমোর? কেন মা?

—আছে কাজ, তুই ঝট্‌ করে যা। কোনো ওজর শুনিস না।

তা' কুমোর এলো, বিনা ওজরেই এলো। পুরনো দিনের প্রজা। ছেলেবেলায় কতো খেয়েছে এ বাড়ীতে।

কিন্তু প্রস্তাব শুনে তার চোখ কপালে উঠে গেছে।···

অবাক্ হয়ে বলে—তাই কি হয় মাঠাকরুণ ? বোধন বসে গেছে, তিন দিন বাদে পূজো, এর মধ্যে পিরতিমে গড়া হয় কখনো ?

—গড়া নেই রতন ? ছোটো খাটো একটু পিরতিমে ?

হাহাকারের মতো শোনায় স্বর্ণকুমারীর কণ্ঠস্বর।

—না মা। যে ক'খানা বায়না ছিল তাই নিয়েই হিমশিম। তা' এক কাজ করুন না…ঘটে পটে—

—না বাবা, প্রতিমা আনতেই হবে আমাকে—

রতন আর নাপিতবৌ মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে।…আহা, মাথাটা একেবারেই গেছে বুড়ীর। আশ্চর্য বা কি! সত্তর বাহাত্তর কি আর না হলো এতোদিনে ?

মুখে বলে—আচ্ছা মা সন্ধান করে দেখি—যদি কারুর ঘরে থাকে। …এ গাঁয়ে নেই, অন্য গাঁ দেখতে হয়।

আগ্রহের আতিশয্যে বিছানায় উঠে বসেন স্বর্ণকুমারী।—তাই দেখো বাবা, তাই দেখো…মরণকালে আশীর্বাদ করছি ভালো হোক তোমার।

রাত্রি কাটে দিন যায়…কোথায় বা রতন, আর কোথায় বা তার প্রতিমা। ভীমরথী বুড়ীর হাত এড়িয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে সে।…কিন্তু স্বর্ণকুমারীর যে মরবারও উপায় নেই…পঞ্চমী ষষ্ঠী…সব হয়ে গেল যে।…কি করবেন স্বর্ণকুমারী ? কি করবেন ?

……………………………

সপ্তমীর ভোরবেলা নাপিতবৌ এসে বিছানায় রুগী না দেখে অবাক্… রোজই রাত্রে থাকে সে, কালকেই শুধু বারোয়ারিতলায় নারকোল কুরে দেবার বরাত ছিল!…কী সর্বনাশ! ঠিক আজকেই শয্যাগত বুড়ী গেল কোথায়!… ভীমরথীর খেয়ালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো ? কিন্তু কি করে ? তিন পা হাঁটতে পারেন না যে স্বর্ণকুমারী!

সারা বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে নিতান্তই অন্যমনস্ক হয়ে পূজোর দালানে এসে পড়লো সে।…অবিশ্যি অকারণেই এলো! বিরাট উঠোন পার হয়ে, ষোলোটা সিঁড়ি ভেঙে ঠাকুর-দালানে উঠতে যাবেন তিনি, এ কথা ভাবেনি! তবু— দেখবে তো সর্বত্র!

কিন্তু ও কি? ভেতর দালানের মাঝখানে পড়ে কে? স্বর্ণকুমারীই না? ...চারদিকে খড়ছড়ানো আর তাল তাল ভিজে মাটি! আড়ষ্ট কঠিন দুখানা হাতেও শুকিয়ে-ওঠা কাদার চিহ্ন! কোথা থেকে এই মাটি সংগ্রহ করেছেন স্বর্ণকুমারী? কোথায় পেয়েছেন এই খড়ের বোঝা?

কী নিদারুণ ক্লেশের চিহ্ন ফুটে রয়েছে শিরাবহুল শীর্ণ মুখে!

মৃত্যুতেও সে চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেনি।

কিন্তু কেন? কেন, আজীবন একটা যুক্তিহীন অর্থহীন কল্পিত কারাগারের কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বন্দিত্বদশা ভোগ করে গেলেন স্বর্ণকুমারী? 'অনন্ত নরকের' ভয়াবহ আশঙ্কা? সে আশঙ্কাকে কি সত্যই উড়িয়ে দেওয়া যেতোনা? বুদ্ধি দিয়ে? যুক্তি দিয়ে?

কে জানে—চিরদিন সেই এক অবোধ আশঙ্কার বন্ধনে নিজেকে বন্দিনী করে রেখেছিলেন স্বর্ণকুমারী, না অবোধ এক বাসনার বন্ধনে?

স্বজাতি

এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে চট করে ছোট বৌয়ের স্নোর শিশিটা খুলে এক খাবলা তুলে নিলে মেজবৌ শিবানী। এটা হচ্ছে সংগ্রহ, এর ঘরে দাঁড়িয়ে মুখে ঘষা চলবে না। চলে যেতে হবে ছাতের সিঁড়িতে কি পশ্চিমের বারান্দায়, নিদেন পক্ষে বাথরুমে। কিন্তু এতো লুকোচুরিতেই কি স্বস্তি আছে? কি করে যে ধরে ফেলে ওরা! রগড়ে রগড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেও ধরে।

যেই ওদের সামনে যাবে, ঠিক দেখবে, তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা বাঁকা হাসছে—আর নিজেদের মধ্যে কেমন একটা ইশারা চালাচ্ছে—বড়জা, ছোটজা, আর বিধবা ননদ কনক।

স্নো পাউডার মাখা যে শিবানীর পক্ষে বে-আইনি, অনধিকার চর্চা, তা' কি আর নিজে জানেনা সে? কতোদিন ভাবে—দূর ছাই দরকার নেই আর, পোড়ার মুখ পুড়ে থাকাই ভালো। কিন্তু পারেনা, কিছুতেও লোভ সামলাতে পারেনা। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে এসে সেই ঘামঘাম ভেলতেলে মুখখানা নিয়ে পাঁচজনের সামনে বেড়াতে কি বিশ্রীই যে লাগে। তাই সুবিধে পেলেই এঘর ওঘর থেকে সংগ্রহ করে নেয় পাউডার স্নো, যখন যা জোটে। বাড়ীর লোকও অবিশ্যি চালাক হয়ে গেছে, ওই লোভনীয় বস্তুগুলোকে নিত্যি নতুন জায়গা বদলে রাখে, নয়তো চাবির ভেতর তুলে ফেলে। তবে অসাবধান বলে কথা। —আজকাল আবার ছোটবৌয়ের বছর আষ্টেকের মেয়েটা শিখেছে মুখের শ্রীবৃদ্ধি সাধনা করতে, অসাবধানতাটা তারই বেশী। নিজস্ব একটা থাকলে এ চৌর্যবৃত্তির দরকার হয় না।

তুচ্ছ বস্তু!

অথচ এই তুচ্ছ বস্তুটাই শিবানীর কাছে কী দুর্লভ! সংসারে এমন উদার ব্যক্তি কেউ নেই যে, শিবানীর এই মর্মান্তিক অভাবটা বোঝে। নিজের মা রয়েছে তার, পূজোর সময় যাহোক একখানা শাড়ীওতো পাঠায় আঁচলে সিঁদুর ঠেকিয়ে! দু'একটা প্রসাধনসামগ্রী পাঠালেই কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

তা' নয়, মাও কঠোর দৃষ্টি হানবে মেয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতাটুকুর দিকে।

কবে যেন একদিন এইটুকু ধরে ফেলে মেয়ের মুখের জন্যে চুনকালির ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

সত্যিই তো স্বামী যার নিরুদ্দেশ, তার মুখে চুনকালি ছাড়া আর কি বা মানায়?

কিন্তু নির্বোধ শিবানী কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলেই দৈবাৎ কোনদিন অহেতুক একখানা ফর্সা কাপড় পাট ভেঙে পরতে নেই তাকে, তেলচিটে মুখখানায় লাগাতে নেই একটু সাবান স্নো, আর্শির সামনে দাঁড়াতে নেই দু'মিনিট।

অন্ধকার ছাতে, আন্দাজে আন্দাজে মুখটা মেজে ঘষে, চুলে একটু হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে শিবানী। ধরো এমন যদি হয় হঠাৎ 'একজন' রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ঠিক এবাড়ীর দরজায় এসেই ওপর দিকে মুখ তুলে চায়, আর সঙ্গে সঙ্গে শিবানী ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায়। লোকটা পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে, ছেলেমানুষের মতো আছড়া-আছড়ি করে, শিবানীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোথায় শিবানী? শিবানীর নিথর দেহটাকেই শুধু পায় সে।

সেই হতভাগ্য লোকটা অবশ্য শিবানীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী।

হাড়ে হাড়ে বুঝবে সে, শিবানী এমন সস্তা বস্তু নয় যে, অবহেলায় ফেলে চলে গিয়ে, বারো বছর পরে এসেও আবার তাকে ঠিকমত পাওয়া যাবে।

চোখের সামনে মরে গিয়ে উদাসীন স্বামীকে জব্দ করবার আরো নানা ছবি, নানা দৃশ্য কল্পনা করতে থাকে শিবানী।

আবার—এও ভাবে এক একসময়, দূর ছাই, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে বরবাদ দিয়ে লাভ কি? মরে গিয়ে তো দেখতে আসতে পারবে না সে, বারো বছর পরে ফিরে এসে মানুষটা "কূলে এসে তরী ডোবার" মতো শোচনীয় মর্মবেদনায় সত্যি আছড়া-আছড়ি করছে কি না।

তার চাইতে—যদি ছাত থেকে নিচে নেমেই হঠাৎ দেখে, সোরগোল পড়ে গেছে বাড়ীতে! দীর্ঘকালের হারানো মানিকটিকে ঘিরে আনন্দোচ্ছ্বাসের বান ডেকেছে, লেগেছে প্রশ্নের ঢেউ। মৃদু মৃদু হেসে নবাগত ব্যক্তি সকলের সব

কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করছে, আর অন্যমনস্কের ভানে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে !...বোকার মতো তো বলতে পারেনা—"সবাইকে দেখছি, কিন্তু কাউকে'ই দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?"...তাকাচ্ছে আর ভাবছে "তাইতো—সে মানুষটা গেলো কোথায় ? তাকে কেন দেখছি না এই আনন্দের হাটে !"

শিবানী নামতে নামতে থমকে দাঁড়াবে, চোখোচোখি হয়ে যাবে ছ'জনের। নতুন করে হবে শুভদৃষ্টি !

শিবানী ভুলে যাবে ঘোমটা টেনে দিতে, ভূপতি ভুলে যাবে অন্যের কথার উত্তর দিতে। তারপর আকস্মিক আনন্দের ধাক্কায় চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে শিবানী।...অবশ্য সে চৈতন্য ফিরে পেতে দেরী হবেনা। 'স্বামীর স্নেহস্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়ে ধীরে ধীরে'—ইত্যাদি।

কি যেন একখানা বইতে ঠিক এই রকমটি পড়েছিলো শিবানী।

বইতে যা অনায়াসে ঘটে যায়, জীবনে তা মাথা খুঁড়ে ফেললেও ঘটতে পারেনা কেন ?

কিন্তু একেবারেই যে ঘটেনা, তাই বা বলা যায় কি করে ?

ভূপতির গৃহত্যাগটাই তো তাই।

বেকার যুবক রোজগারী দাদার কাছে ভাতের খোঁটা খেয়ে—"যদি কখনো মানুষ হই তো গৃহে ফিরিব" লিখে রেখে বাড়ী ছাড়লো, এ ঘটনা তো একাধিকবার পড়েছে শিবানী—গল্পে উপন্যাসে।

সে গল্পের পরবর্তী কাহিনী অবশ্য শুধু 'মানুষ' নয়; 'অতিমানুষ' হয়ে ওঠবার চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু সেটুকু আর মিললো কই ? অমানুষ ভূপতি কোনোদিন আর ফিরলো না ! নিজস্ব বেকার মূর্তি নিয়েও না।

প্রথম কিছুদিন সবাই বলেছিলো—'হুঃ রাগ দেখিয়ে বাড়ী ছাড়লেন বাবু ! আচ্ছা, জগৎটা দু'দিন ঘুরে আসুন, বুঝুন কতো ধানে কতো চাল ! বাড়া ভাত নিয়ে কে বসে আছে রাস্তায় ? ফিরে আসতে পথ পাবেন না বাছাধন।'

সে ভবিষ্যৎবাণী যখন বিফল হলো, 'দুদিনটা' অনেক দিনে গিয়ে ঠেকলো, তখন কিছুদিন ধরে চলতে লাগলো খবরের কাগজের মাধ্যমে আবেদন নিবেদন।

'কেটে কুচি কুচি করলে রাগ যায় না'—এই মনোভাব নিয়ে ভূপতির দাদা

বাঙলা ইংরিজি। ছ'টো ভাষার মারফত নানা কাগজে মনোবেদনা জানাতে লাগলেন—"ভূপতি, ফিরে এসো। আমি অনুতপ্ত, কেউ কিছু বলবে না। তোমার প্রস্থানে মেজবৌমা শয্যাগত, যদি শেষ দেখা দেখতে চাও শীঘ্র এসো। টাকার প্রয়োজন থাকলে ঠিকানা জানাও, অবিলম্বে পাঠাচ্ছি।"

'পতিবিরহে শয্যালীনা মেজবৌমা' বিপুলগোষ্ঠীর রান্নাবান্না সেরে এসে ছপুরবেলা বসতো কাগজগুলো নিয়ে। কে যেন কোন্ ফাঁকে রেখে যেতো তার ঘরে। সে যেন না ভাবে, কিছুই করা হচ্ছেনা তার স্বামীর জন্যে।

নিরুদ্দেশের কলম থেকে চোখ চলে যেতো শিবানীর কর্মখালির কলমে। সম্ভব অসম্ভব সবগুলো দেখতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আর মনে মনে হিসেব করতো—'অনুতপ্ত দাদার' এ আবেদন যদি ভূপতির চোখে পড়ে, কর্মখালি-গুলোও পড়বে না কি? তবে? ভালোমন্দ যাই হোক একটা জোগাড় করে নিয়ে অনায়াসেই তো বড়োমুখে আবার সে ফিরতে পারে বাড়ীতে?

'মেজবৌমার সঙ্গে শেষদেখার' আবেদনটাও যখন ব্যর্থ হলো, তখন ঘরের লোক রেখে-ঢেকে বলতে লাগলো "'নিশ্চয় 'সন্ন্যাস'"! বাইরের লোক বিনা দ্বিধায় বলতে লাগলো "নিশ্চয় অপঘাত"!...অতএব পয়সা খরচ করে খোঁজাখুঁজি করবার মানে হয় না কিছু আর।

ভূপতির বড়ো থালাখানায় ভাত খেতে লাগলো—একটু বড়ো হয়ে ওঠা ভাসুরপো বলাই, ভূপতির ছেঁড়া ছাতাটা বৃষ্টির দিনে ব্যবহার করতে দেওয়া হলো—চাকর সতীশকে।

একাকিনী শিবানীকে আগলাতে কনক কিছুদিন নিজের চিলেকোঠার একফালি ঘরটুকু ছেড়ে নেমে ভূপতির ঘরে এসে শুয়েছিলো, নানা সুবিধে অসুবিধেয় শিবানীই শেষ পর্যন্ত উঠে গেছে কনকের আস্তানায়।

বাড়তি একখানা ঘর না হলে অচল হয়ে উঠেছিলো বড়ো জায়ের। ছেলেরা বড়ো হয়েছে, জামাই আসে যখন তখন।

ভূপতি থাকলে এ সমস্যার কি সমাধান হতো তাই মাঝে মাঝে ভাবে শিবানী। শুধু ভূপতির জামাকাপড়গুলো শিবানীর সম্পত্তি হিসেবে আছে এখনো। ওর সাবেক ঘরের খাটের তলায় রয়ে গেছে ট্রাঙ্কটা। কেউ যে

টেনে বার করে ফেলে দেয়নি, এটা তাদের মহত্বই মনে করে শিবানী। প্রায়ই তো ভাসুরঝি গীতা বলে "তোমাদের জামাই এসে তোমাদের বাড়ী শোবে কি? যা মশা! খাটের তলায় অতো জিনিস বোঝাই থাকলে মশা হবে না? আমার শ্বশুরবাড়ীতে ওটি হবার জো নেই। খাট চৌকীর তলা দু'বেলা মোছা চাই।"

ছাতে ঘুরতে ঘুরতে শিবানীর কি সময়ের জ্ঞান ছিলো না? কম ক্ষণ তো যায়নি। নিচে যে কতো মন্তব্য হয়ে গেছে তার সম্বন্ধে কে জানে।

নিতান্ত অন্যমনস্ক চিত্তে নেমে আসতে আসতে অবাক্ হয়ে দেখে সত্যিই সোরগোল পড়ে গেছে বাড়ীতে। দালানের, সিঁড়ির, খাবার ঘরের তিনটে আলোই জ্বলছে একসঙ্গে, ধবধব করছে বাড়ীটা। কোলাহলে মুখরিত।

না ভূপতি নয়, ভাসুরঝি গীতা বেড়াতে এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে, তিন ছেলেমেয়ে আর বর নিয়ে। খাবার ঘরে বসেছে চা জলখাবারের পাট। হাসি গল্পের ছটায় উথলে উঠেছে বাড়ী।

মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিবানী। চট্ করে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হয় না। কী অজ্ঞান হয়েছিলো সে এতোক্ষণ! ওরা এসেছে—নিশ্চয় দু'দণ্ড বসে তবে খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে, সে তো কম সময় নয়? কে চা-টা তৈরি করলো? ছোট বৌয়ের কোলের ছেলের সর্দিজ্বর, সে তো দু'দিন কুটোটি ভাঙছে না সংসারের। অবশ্যই ঠাকুরঝির ঘাড়ে পড়েছে। ...হায় হায়, কী দুর্মতি হয়েছিলো শিবানীর! আশ্চর্য! নিচেকার এতো গোলমাল, তার ছিটে বিন্দু কি ছাতে পৌঁছতে নেই? হয়তো বা ছাতে ঠিকই পৌঁছেছিল, পৌঁছয়নি শিবানীর কানে।

গীতার গলাটা যেমন শানানো তেমনি চড়া, দূরে থেকেও প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। সিঁড়ির মাঝখানের চৌতারায় বসে পড়েছে শিবানী, আর শুনতে পাচ্ছে—ছুরির মতো কেটে কেটে উচ্চারণ করছে গীতা—"খুব নিন্দে করছিলেন আমার পিসশাশুড়ী, অবাক্ হয়ে বললেন—'হ্যাঁ বৌমা, তোমার খুড়ীরও কিছু আক্কেল নেই? ভিটের অকল্যাণ হয় ওতে। মাছ-ফাছ খাচ্ছেন তো ছিষ্টি!"

খুড়ীর আক্কেল !

স্পষ্ট একটা হাসির ঢেউ খেলে গেলো ঘরে।

—আক্কেলওয়ালীর আক্কেল দেখছিস তো ? তিনঘণ্টা ছাতে গিয়ে বসে আছেন !

স্বরটা চাপা। তবে নিতান্ত পরিচিত বলেই ধরা যায় বিধবা ননদ কনকের।

আবার গীতার স্পষ্টস্বর—পিসশাশুড়ী ত বলছিলেন—বারো বচ্ছর হয়ে গেলে বৈধব্য নেওয়াই বিধি। আর সত্যি এও বলি, এখনো কি তোমরা আশা করছো ? বেঁচে থাকলে কি আর এতোকাল ধরে এমনই রাগ পুষে বসে থাকতেন মেজকাকা, যে এক আঁচড় চিঠি পর্যন্ত দিতেন না ?

চিঠির আশা তো প্রতিমুহূর্তেই করে শিবানী। একযুগ ধরে অহরহই করছে। পিয়নের আসার সময়গুলো মুখস্থ হয়ে গেছে তার। কিন্তু চিঠি আসেনা বলেই মানুষটা আর কোনোদিনই আসবে না এমন ভয়াবহ আশঙ্কা তো করেনি একদিনও ! এই এতোক্ষণ ধরে তার আসার কথাই তো ভাবছিলো।

কি বিশ্রী কথাগুলো গীতার।

গীতার মার কথাগুলোও এমন কিছু সুশ্রী নয়। তিনিও মেয়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন—মনে মনে আর কে না জানছে ? তা' ওর যদি নিজের হুঁশ না থাকে, মুখের ওপর বলবে কে ? মাছ ছাড়বে মেজবৌ ! হুঁঃ। ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা লোভ ওইটিতে !…শুধু মাছ ? ডিম পিয়াজ কি না খাচ্ছে ?

'ছি-ছি-ছি !…'

এবারে ঘরে একটা 'ছি-ছি'র ঢেউ খেলে যায়।

এতো স্পষ্ট 'ছি-ছি' ভাব বোধকরি এর আগে কারো মনে আসেনি, গীতার পিসশাশুড়ীর জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চোখ ফুটলো বলেই অনেক দিনের জমানো ধিক্কার একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো।

কথার জের টানেন বড়ো জা—খাওয়া, পরা, কিসে লোভ নেই ? ফুলকাটা ছিটের ব্লাউজগুলো দিব্যি পরছে ! শুধু তাই ? বুড়োমাগীর এখনো এমন প্রবৃত্তি, চুরি চামারি করে মুখে পাউডার ঘষে মরেন !…কিসের সুখে ফিট্‌ফাট

হয়ে বেড়াবার সাধ হয় প্রাণে, তাও জানি না।…এই তো কনক, সেই বাইশ বছর বয়েস থেকে এক বস্ত্র সার করে বসে আছে, কেউ কখনো বলতে পারবেনা একখানা সাবান নিয়ে মুখে বুলিয়েছে কোনদিন! চোখের ওপর এমন দৃষ্টান্ত দেখেও—

শিবানী অবাক্ হয়ে ভাবে কনকের সঙ্গে ওর তুলনা কেন? কনকের না হয় মাখতে নেই, বিধবা মানুষ। শিবানীকেও ওরা একেবারে কনকের পর্যায়ে ফেলছে কেন? কনকের মত সাজ করে বেড়াবে নাকি শিবানী? আর হঠাৎ যখন ভূপতি এসে হাজির হবে? বলবে কি?…এমন তো হতে পারে দরজা খুলে দিতে শিবানীই ছুটে যাবে, কে না কে ভেবে!…

বড়ো জা কথার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন—যাই ভাগ্যিস দেবতার মতন ভাসুর পেয়েছিলে তাই তরে গেলো! এখনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে সমান করে চ্যাটালো চ্যাটালো পাড়ের মিহি মিহি শাড়ীগুলো জোগাচ্ছেন! ছিঁড়তে না ছিঁড়তে সেমিজ জামা, দেখিস তো? তা' এমন আক্কেল নেই যে বলবে—"ও সবে আর দরকার নেই আমার। কেন মিথ্যে এতো খরচ—"

সিঁড়িতে বসে থেকে থেকে সিমেণ্টের মেঝের সঙ্গে যেন পুঁতে যাচ্ছিলো শিবানী, পাথর হয়ে যাচ্ছিলো। তবু শেষের কথাটায় চমকে ওঠে।

দরকার নেই!

সেমিজ ব্লাউজেও আর দরকার নেই তার! এমনিতেই তো দশ হাত শাড়ীর আঁচলের 'খাটো'তে খাটো হয়ে থাকে মনটা, রোগা পাতলা ছোট বৌয়ের, আটচল্লিশ ইঞ্চি বহর এগার হাত শাড়ীর আঁচলটা নিয়ে হিমশিম খাওয়া দেখে হিংসেয় গা জ্বলে যায়। এর পরে আবার আড়ে দীর্ঘে এতোখানি দেহটা নিয়ে, হাড়গিলে কনকের মতো খালি গায়ে আঁচল জড়িয়ে বেড়াতে হবে—ভাসুর, দেওর, চাকরবাকর সকলের সামনে?

ভাসুরের 'দেবত্বের' সুযোগ নিয়ে তা'হলে এতোদিন অনেক কিছু বাড়তি প্রাপ্য আদায় করেছে শিবানী?

শুধু সাবান স্নো নয়, সেমিজ ব্লাউজও তার অনধিকারচর্চা?

স্পষ্ট এতো কথা ভাবতে পারে না বোকা শিবানী, নিরুপায় একটা আক্রোশে চোখে জল এসে যায় হঠাৎ। বোকা বলেই জানেনা, ন্যায্যমত

দেবার লোক না থাকলে খাওয়াটাই অনধিকার-চর্চা, তা পরা! সেটা তো দ্বিতীয় প্রয়োজন।

ভাসুর 'দেবতা' বৈ কি! কে করে এতো?

কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলাবলি করছে ওরা?

কার কথা বলছে?

এ আলোচনায় শিবানীর কোনো যোগ আছে?

—মেজকাকা গেছেন বারো বছরের বেশী হয়ে গেছে বোধ হয় তাই না মা? আমি তো তখন সবে ক্লাশ 'এইটে' না 'নাইনে' পড়ি।

—না না, বারো বছর হয়ে যায়নি এখনো—এই সামনের পূজো গেলে পূরবে। মনে মনে বোধ হয় কি একটা মেয়েলি হিসেব করে নিয়ে কনক বলে—হ্যাঁ, বেশ মনে আছে কাত্তিকের প্রথম দিকে! চোত, পোষ, ভাদ্দর, কাত্তিককে যে 'অগস্ত্য মাস' বলে, তা মিথ্যে নয়। অগস্ত্যযাত্রাই হলো। ......তুমি তখন সবে আঁতুড় থেকে উঠেছো, না বড়ো বৌ? কানাই হলো তো সেবার? এই ভালো চাকরিটা হলো ছোড়দার।...

কানাইয়ের জন্মতারিখ, ছোটকর্তা বিভূতির নতুন চাকরি, কনকের জ্যেঠশ্বশুর মরার অশৌচ ইত্যাদি অনেকগুলো খুচরো সংখ্যা নিয়ে অঙ্ক কষে ভূপতির গৃহত্যাগের নীট্ তারিখটা আবিষ্কার করতে বসে ওরা।

কিছুক্ষণ ধরেই চালায় অঙ্কটা।

হতবুদ্ধি শিবানী আড়ালে বসে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

দুই আর দুইয়ে চার না করে, দেড় আর আড়াইয়ের যোগফলে চারকে দাঁড় করাবার মানেটা কি?

ওরা কি পাগল?

বাঙলার সাতচল্লিশ সালের তেসরা কার্তিক শুক্রবার; কোজাগরীর আগের দিন।...এই তো!

এমন পরিষ্কার মার্কামারা দিনটাকে ঠিক করতে সবাই মিলে গলদঘর্ম

হচ্ছে! শিবানী ওখানে থাকলে কথা পড়তেই যে বলে দিতো। কিন্তু শিবানীর পা দুটো কে বেঁধে রেখেছে? কিছুতেই যেন উঠে যেতে পারছে না?

গীতার চড়া গলাও একটু খাটো হয়ে যায়—পিসশাশুড়ীই বলছিলেন—তোমাদের কুলগুরুকে বরং আনাও একদিন, দীক্ষা দেবার ছুঁতোয় ও কাজটাও সারা হয়ে যাক।

—দেখি তাই!…তুই শুধু চা মিষ্টি খেয়ে শ্বশুরবাড়ী ফিরবি, শাশুড়ী খোঁটা দেবে দেখিস। এতো করে বললাম খাওয়া দাওয়া করে যাবি, তা' এসেই 'যাই যাই' করছিস।

—বাবা, আসা কি হয়ে ওঠে? কতো কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে এইটুকু ছুটি।…এ আর তোমাদের বাড়ীর বৌদের আয়েস নয়! কার ছেলের একটু সর্দি হয়েছে, তিনি আর ঘর থেকে বেরোবেন না, কার গরম লাগছে—তিনি তিন ঘণ্টা ধরে গায়ে ছাতের হাওয়া লাগাচ্ছেন। বাব্ বাঃ।

কতোই বা বয়েস গীতার, কথা কয় এতো পাকা পাকা!

অতঃপর গীতার ছেলেদের হৈ চৈ ওঠে, সেই ফাঁকে নেমে আসে শিবানী।

গীতা আধাআধি নিচু হয়ে একটা নমস্কারের মতো করে বলে—কি গো মেজখুড়ী? দর্শন মিললো তা'হলে? আমি তো ভাবছিলাম আজ আর সে সৌভাগ্য হলোনা, চলেই যাচ্ছিলাম।…ঘুম দিচ্ছিলে নাকি ছাতের হাওয়ায়?

শিবানী অস্ফুটে একটু যা বলে, সেটা ঘুমের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে ঠিক বোঝা যায়না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গীতা আর একটা অদ্ভুত কথা বলে বসে—তুমি মেজখুড়ী মনে কোরোনা কিছু, খুব সেরেছো আজকাল। এই তো মাস দুই আগেও এসেছিলাম, আজ তার থেকে ঢের 'ইয়ে' দেখছি। মুখের রঙটা পর্যন্ত ধবধবে ফরসা হয়ে গেছে।

কে জানে এটা গীতার একটা 'চাল্' কি না। স্নো-পাউডারের ইতিহাস শোনার অভিব্যক্তি।

অবিশ্যি বলতে বাধাই বা কি? বেওয়ারিস শিবানীকে 'মোটা হয়েছে'

বলে খুঁড়লে কিছু আর পাপে ডুববে না গীতা। নজর লেগে শিবানীও ক্ষয়ে যাবে না।

শিবানীর উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে না গীতা। বলা নিয়ে কথা। কাউকে কিছু বলবার সুযোগ পেলে কখনো সে সুযোগ নষ্ট করেনা সে। বলে নিয়েই এগিয়ে যায় পিসির দিকে, পায়ের ধুলো নিয়ে নিচুগলায় বলে—চললাম বাপু। আমার পিসশাশুড়ীর কথাটা মনে রেখো। অবিশ্যি তোমাদের প্রাণে তো লাগবেই, নতুন করে শোক জেগে উঠবে। কিন্তু, বাবা ছোটকাকার কল্যাণটাও তো দেখা উচিত ?…বারো বছর পার হয়ে গেলে, আর কিছুতেই সংসারে এই সব অনাচার করতে দেওয়া ঠিক নয়।

গীতা চলে গেলে ছোটবৌ, বড়োবৌ আর কনকের মধ্যে চলে ইশারা আর ফিসফিস।

—'ঠিক নয়', তা কি আর আমরা জানি না ? কথাটা তোলে কে ?

ছোট বৌ একটু উঁচু স্টাইলের হাসি হেসে বলে—গীতা ঘরের মেয়ে, সাহস করে বললো তাই! শুধু ওর পিসশাশুড়ী কেন, একথা তো কচি ছেলেটাও জানে। আমার সেজমাসীও তো অবাক্ হয়ে বলছিলেন সেদিনকে—'হ্যাঁরে তোর সেই জা এখনো তোদের হেঁসেলে খাওয়া মাখা করে ?' নিয়মিত দুবেলা টকটকে করে সিঁদুর পর্যন্ত পরা চাই শুনে তো হেসেই খুন।

বড়োবৌয়ের বাপের বাড়ীর দিকেও কাদের কে যেন "সোয়ামী বেবাগী" হয়ে যাওয়ার ছুতোয় 'জন্ম এয়ো' থেকে গেছলো, সেই হাস্যকর কাহিনীর ইতিবৃত্তটা আলোচিত হয়, হেসে খুন হবার সুযোগ এরাও পায় একবার।

অবশেষে—কুলগুরু ডেকে এনে বর্তমান সমস্যার সমাধানটাই সাব্যস্ত হয়।

যেন অনেকদিন ধরে সবাইকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে এসেছে শিবানী, আর নয়। আর বোকা থাকতে রাজী নয় কেউ। শুধু এখনো সাব্যস্ত হয় না ঠিক কবে কোন্ তারিখে বাড়ী ছেড়েছে ভূপতি। তিথি নক্ষত্র ধরে শ্রাদ্ধপিণ্ড দিতে হবে তো তার ? সেইটাই শাস্ত্রবিধি। বৈধব্যব্রতেরও অনুষ্ঠান আছে বৈকি।

ফস্ করে শিবানীকেই একদিন জিজ্ঞেস করে বসলো কনক—গলাটা ভার ভার আর চোখটা ছলছল করে—মেজদা কতোদিন হলো গেছে মেজবৌ ?

সাল তারিখ তিথি সবই তো শিবানীর চোখের ওপর জ্বল জ্বল করছে, তবু অমন বিমূঢ় ভাবে বললো কেন—কি জানি ঠাকুরঝি, ঠিক মনে করতে পারছি না তো।

কে জানে কি ভেবে বললো।

হয়তো কিছু ভেবেই বলেনি, অকস্মাৎ উদ্যত আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষার সহজাত বুদ্ধিতে বলে ফেলেছে মাত্র।

ও উঠে যেতেই কনক প্রায় সশব্দ মন্তব্য করে—'তা মনে থাকবে কেন? নি-রোজগেরে লোকটা, গেছে না বালাই গেছে। ভাসুরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তোমার তো চলছে ঠিকই! নিজের খাওয়া মাখা টিপ কাজল পরাটি বজায় থাকলেই হলো!'

* * * *

'বজায় থাকলেই হলো' না হয় শিবানীর ইচ্ছে বুঝলাম, কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান সংসারী ব্যক্তিরা বজায় থাকতে দেবে কেন? ভগবান যাকে মেরেছেন, মানুষ তাকে আশকারা দেবে না কি? সে যদি ধৃষ্টতার বশে রূপ রস আলো বাতাসের দিকে তার লোভের হাত বাড়ায়, সেই হাত মুচড়ে ভেঙে দেবে না নীতি নিয়মানুগত সুস্থ জীবেরা? সব সময় না হোক, কোনো কোনো সময় শাস্ত্রবাক্য মানতে হবে বৈ কি!

পিসি মাসীর শাস্ত্রে নয় বাবা, সত্যিকার শাস্ত্রে আছে, যুগ পূর্ণ হলে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত গণ্য করা বিধি। আইন পর্যন্ত সে শাস্ত্র মেনে চলে। সাল তারিখের হিসেব বেরোয়, কিছু কাঠ খড় পুড়িয়ে।

সামনের কোজাগরীতে যুগ পূর্ণ হবে।

কুলগুরুকে ডাকিয়ে এনে 'মারণ-যজ্ঞে'র বিধিব্যবস্থা নেওয়া হয়। শিবানীর মন্ত্রদীক্ষাটাও হয়ে যাক ওই সঙ্গে। অদীক্ষিত শরীর প্রেতাত্মার সমান বৈ তো নয়।

বড়ো কর্তা হাতে করে আনতে চান না, ছোট দেওরকে দিয়ে একজোড়া ধোয়া থান আনিয়ে রাখেন বড়োবৌ, আর কোজাগরের আগের দিন ঘটা করে আনান বড়ো একখানা মাছের ল্যাজা। কনক আবার আলাদা করে নিজের পয়সা দিয়ে আনায় ভেট্‌কী মাছের পেটি, আর মৌরলা চুনো।

জিনিসগুলো নাকি শিবানীর বড়ো বেশী প্রিয়। জন্মের শোধ আশা

মিটিয়ে নিক। শিবানী যে ভাবে, কনক তাকে ভালোবাসেনা, কত ভুল ধারণা সেটা।

পরিপাটি করে বেড়ে ভাতের কাঁসিটা শিবানীর সামনে বসিয়ে দিয়ে ছোটবৌ একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—তিনটি জায়ে এক সঙ্গে খেতে বসতাম, মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে যাবে!

কনক থানের আঁচলটা তুলে চোখের কোণে ঘষে।

বড়ো জা একটা খেদ-সূচক ধ্বনি করে বলেন—শাস্ত্রপালার ব্যাপার, না মেনে তো উপায় নেই। আবার দেখো—বিশ বছর পরে নিরুদ্দেশ মানুষ ফিরে এসেছে, এমন গল্পও শুনেছি।

গল্পে কি না শোনা যায়?

গল্পের গরু যে গাছে ওঠে! গোয়ালের গরু পারে তাই? না লোকে সেই ম্যাজিক দেখবার আশা করবে?

রাতটা পোহায়—

সৌভাগ্যবতীদের চোখে দেখা নিষেধ। কনক একাই যায় মেজ বৌকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে। শাস্ত্রীয় যাবতীয় দুঃসহ কর্তব্য সেরে বাড়ী ফিরে দরজার গোড়া থেকেই ডুকরে ওঠে—লক্ষ্মীপূজোর দিন, আজ ঘরের লক্ষ্মীর কি অলক্ষ্মী-বেশ করে আনলাম আমি গো!···আমার কপালে এতো সাজাও লিখেছিলো ভগবান!···

চীৎকারটা একটা ওয়ার্নিংও বটে।

গাড়ীর শব্দে কৌতূহলী ছোটবৌ পাছে ভুলে বেরিয়ে আসে ছুটে পুটে।

দূরাগত সঙ্গীতের মতো বড়োবৌয়ের মৃদুকণ্ঠের করুণ বিলাপধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে। বহুদিনবিস্মৃত 'মেজ ঠাকুরপো'কে উদ্দেশ করে করেই বোধকরি এই বিলাপবাণী।

হয়তো বা অদেখা ভাসুরের নবমৃত্যুশোকে ছোটবৌও আঁচলে চোখ মুছছে, শুধু শিবানীর চোখেই জলবিন্দু নেই।

ওরা যে বলে 'কাষ্ঠ কঠিন', মিথ্যে বলে না।

স্বামীর সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে মুছে বিসর্জন দিয়ে এলি তো! চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে না? ছিঃ!

জব্দ হবার মেয়ে নয়!

যা স্বভাব, হয়তো বা অদূরভবিষ্যতে আবারও পাঁচজনের সামনে মুখ দেখাতে হলেই ঘামঘাম তেলতেল মুখখানা থানের আঁচলের কোণটা দিয়েও রগড়ে মুছে চকচকে করতে বসবে!···বিশ্বাস কি!

এখন তো—শুকনো দুটো চোখে আগাগোড়া এমন বোকার মতো ফ্যাল্‌-ফেলিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, যেন চোখের সামনে কি একটা দুর্বোধ্য থিয়েটারই দেখছে!···দেখলে গা জ্বলে যায় কি না!

সোনালী মেঘ

সমীর শুয়েছিল বিছানায়।

শুয়েই থাকে সে, এগারো মাস ধ'রে শুয়ে আছে ওই বিছানাটায়, একই জায়গায়।

চৌকিটা একেবারে দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে পাতা। এখান থেকে আকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।

যে জানালাটা সামনে পড়ে, তার থেকে বাইরে তাকালে চোখে পড়বে মজুমদারদের বিরাট বাড়ীখানার পিছনের দেয়ালের একাংশ। সেকেলে আমলের ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা নোনাধরা দেয়াল, চুনবালির আস্তরণ কোনোকালে ছিল এখন আর বিশ্বাস করা কঠিন।

গাঁথুনির ফাঁকে-ফাঁকে এখানে ওখানে গজিয়েছে অশ্বত্থের চারা।

এখন ওদের কেউ গ্রাহ্য করে না, উদাসীনভাবে তাকিয়ে দেখে—শ্যামল কয়েকখানি পাতার নিচে নিচে কোন ফাঁকে জন্ম নিচ্ছে আরো কোমল আরো উজ্জ্বল নতুন পাতার দল।

কে সন্দেহ করবে ওই সবুজ শোভার মধ্যে লুকানো আছে ধ্বংসের বীজ! কে বিশ্বাস করবে এই বিরাট অট্টালিকাকে ভূমিসাৎ করবার শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে ওর ওই শিশুদেহের অন্তরালে!

বহুবার দেখেছে মানুষ, বারে বারে ঠকেছে, তবু উদাসীন অবহেলায় তাকিয়ে দেখে—দেয়ালের গাঁথুনিতে ফাটল ধরিয়ে গজিয়ে ওঠা কচিপাতা দু'খানাকে।

হয়তো বা তাকিয়ে দেখেওনা।

মজুমদাররাও এখন তাকিয়ে দেখছেনা, নয়তো বা যখন তাকিয়ে দেখেছে ভেবেছে 'গাছ ক'টা কেটে ফেলা দরকার'। যেমন ভেবেছিল সমীরের মা বাপ বছর দেড়েক আগে।

"ছেলেটাকে একবার ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার"—একথা অনেকবার ভেবেছে ওর মা বিরজা, আর বাবা সুধাংশুমোহন। যতোবারই ওরা লক্ষ্য

করেছে ছেলেটা কেমন অস্বাভাবিকভাবে পা টেনে টেনে হাঁটছে, উঠতে-বসতে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছে, ততোবারই এ সাধুসঙ্কল্প জেগেছে ওদের মনে।

"না না অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়, ভালো একটা ডাক্তার দেখানো উচিত। পড়ে গেলোনা, হোঁচট খেলোনা, শুধু শুধু ছ'মাস ধরে পায়ে একটা ব্যথা আটকে থাকবে—একি আশ্চর্য কথা!" ছ'মাস ধরে এই ধরনের অনেক কথা অনেক সময় বলাবলি করেছে ওরা দুই স্বামী স্ত্রী, কিন্তু সন্দেহ করেনি—এটা মারাত্মক কিছু, সন্দেহ করেনি এই বলিষ্ঠ কিশোর দেহকে ভূমিসাৎ করবার ভূমিকা নিয়ে এসেছে—তুচ্ছ ওই ব্যথাটুকু। তাই, ভালো ডাক্তার দেখানোটা আর হয়ে ওঠেনি। গ্রামে তো আর তেমন ডাক্তার নেই। যেতে হবে সদরে। সুবিধে হবে তবে তো?

তোড়জোড় করে সদরে যাবে,—শুধু একটা কাজ সেরে আসতে হলেই বা মজুরি পোষাবে কেন? একটা বন্ধকী জমির বাকী সুদ না কি ছাই তার জন্যে পরামর্শ করবার আছে যোগীন উকিলের সঙ্গে, গায়ের একখানা র‍্যাপার কেনবার ইচ্ছে সুধাংশুর অনেকদিন থেকে—এখানকার 'হেটোমার্কা' সুতি র‍্যাপার নয়, সত্যিকার পশমের র‍্যাপার; জোড়াদুই কাপড়েরও দরকার—বিরজার আর নিজের। সমীরের একজোড়া জুতো, যেতেই যদি হয় সদরে, সেখান থেকে কেনা ভালো।

এতোগুলো 'ভালো' ইচ্ছেকে কার্যকরী করতে হলে যে ভালো জিনিসটার দরকার, সেটা বড়ো একটা একসঙ্গে বেশী থাকে না। কাজেকাজেই 'তা' না না না' করতে করতে ছ'মাস কেটে গেছে। পায়ের ব্যথা বেড়েই চলেছে। সংসারের কাজ নির্ভুলভাবে সেরে সময় পেলে, বিরজা কোন কোন দিন একটু কর্পূর তেল মালিশ করে দিয়েছে ছেলের পায়ে, কোনদিন বা বলেছে—"হেরিকেনের মাথায় কাপড়ের পুঁটুলি তাতিয়ে তাতিয়ে একটু সেঁক দে দিকিন খোকা, আরাম পাবি।"

'সমীর' এতো বড়ো নামটা তার বলতে ভালো লাগে না, 'খোকাই' সুবিধে। নামটা বিরজার পছন্দও নয়। নিজেদের রাখাও নয় নামটা। ওই—মজুমদারদের ছোট ছেলে জিতেন, ছেলেবেলায় যে বিশেষ প্রিয় ছিলো বিরজার, দিনের বেশীরভাগটা কাটতো বিরজার কাছে, তারই পছন্দ করা নাম।

এরা ঠিক করেছিল 'হিমাংশু'। সুধাংশুর ছেলে হিমাংশু ছাড়া আর কি

হবে? এই তো বিধি নামকরণের। জিতেন—যদিও মস্ত একটা মাতব্বর লোক নয় তবু—বিরজার ওপর স্নেহের দাবিতেই একেবারে নাকচ করা দিয়েছিল নামটা। বলেছিল—আরে ছ্যাঃ! ওসব নাম আবার এখন চলে না কি নতুন কাকীমা? বড় সেকেলে হয়ে গেছে, নেহাতই যদি মিলিয়ে নাম রাখতে হয়, বরং 'শুভ্রাংশু' চলতে পারে।

'শুভ্রাংশু'কে আবার বিরজা একদম বাতিল করে দিল। ছেলের নাম উচ্চারণ করতে হলে যে দাঁত কটা ভাঙতে হবে, এ তার পছন্দ নয়।

অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে এই নামটি নির্বাচন করে দিয়েছিল জিতেন। বারে বারে আর 'না' করতে পারেনি বিরজা, তবে ডাকনামটা 'খোকা'ই বাহাল আছে। যাক্, সে সব কথা তো ষোলো বছর আগের। আলোচ্য ঘটনাটা—বছর দেড়েকের।

সদরে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আনবার সঙ্কল্পটা বজায় থাকলেও—কর্তব্যের নেহাত ত্রুটি করেনি সুধাংশু, কবরেজ মশাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে ছেলেকে।

"ধমকের চোটে অর্ধেক রোগ সারাতে পারি"—এমনি একটা আত্মগরিমা আছে শিরিষ কবরেজের।...তাই দেখেই একচোট ধমক দেন—"হবেনা ব্যথা? হনুমানের মতন গাছের ডগায় ডগায় ঝুলগে যা আরো? সেরে যাবে ব্যথা। দু'বার আছাড় খেলে ব্যথার বাবা সারে, বুঝলি?"

সুধাংশু কুণ্ঠিত ভাবে বলতে চেষ্টা করেছিল—"এর মধ্যে তো—প'ড়েটড়ে কই যায়নি কবরেজ মশাই। খামোকা শুধু শুধুই—"

—"খামোকা শুধু শুধুই"—হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন শিরিষ কবরেজ—"বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিও না সুধাংশু, শুধু শুধু পায়ে ব্যথা! ছোঁড়াগুলোকে তো চেননা তুমি, সেরেফ এক একটি হনুমান। গাছের ডগাতেই বাসা ওদের। 'কেষ্টো' প্যায়রাগুলো ডাঁসাতে দেয় না হে, খেয়ে খেয়ে গাছ সাফ করে ছাড়ে! ওই প্যায়রা গাছ থেকে আছাড় খেয়ে যদি হাড় মচকে না থাকে তো আমার নাম বদলে রেখো। একেবারে মোক্ষম মচকেছে দেখতে পাচ্ছি।"

সমীরও এই অন্যায় অপবাদে আপত্তি করেছিল, কিন্তু শিরিষ কবরেজ শুনলে তো?

নুন, চুন, সোরা, তেঁতুল, ছাই পাঁশ সবকিছু মিশিয়ে একটা প্রলেপের ব্যবস্থা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি—আর এক প্রস্থ ধমক দিয়ে।

* * * *

বলাবাহুল্য শিরিষ কবরেজের মুখ রাখতে পারেনি সমীর। না ওষুধ, না ধমক, কোনোটাই কার্যকরী হলোনা। বেড়েই যেতে লাগলো।

এরপর—এগারো মাস আগে সমীর যখন সেই তুচ্ছ পায়ের ব্যথা উপলক্ষ করে বিছানা নিলে, তখন শিরিষ কবরেজ আবার দেখলেন।

রুগীর কাছে এসেই দেখতে হলো।

এবার আর ধমক দিলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন—"বাতের উপক্রম দেখছি।"

পাড়ার হিতৈষী গিন্নীরা শুনে চটলেন—"ভীমরতি হয়েছে বুড়োর। এই কচিছেলের নাকি বাতের উপক্রম! কিছু না, 'শিরটান'। বেকায়দায় কখন খ্যাঁচ করে লেগেছে—"

* * * *

পাড়ার গিন্নীদের কথা সবটা না হলেও—কিছুটা ঠিক বলা যায়। 'বে-কায়দায় খ্যাঁচ করে টান' তার সত্য পড়েছিল, কিন্তু পায়ে নয় কপালে। বিধাতা-পুরুষের কলমটা যখন চলতে শুরু করেছিল—'ষেটেরা পূজোর' রাত্রে। কলমের সেই বেকায়দা আঁচড়ের ফল ভুগছে সমীর, ষোলো থেকে সতের বছর বয়েস পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থেকে।

এরপর আর সমীরকে সদরে নিয়ে যাবার অবস্থা রইল না।

চলতেই পারে না, যাবে কি করে?

অথচ ডাক্তারকে নিয়ে আসবে—এমন অবস্থা সুধাংশুর নয়। কাপড়, র‍্যাপার, আর জুতো কেনবার টাকা, খানিকটা জমতে জমতে ভেস্তে যায়। শেষ অবধি ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে সুধাংশু।

তবে—মিথ্যে বলবোনা—এরমধ্যে 'ভালো' না হোক (ঈশ্বর জানেন 'মন্দ' কিনা) চিকিৎসা অনেক করিয়েছে সে। অনেক রকম।··· শেকড় বাকড়, মাদুলী কবচ, সাধু ফকির, একটার পর একটা। যে যা বলছে।

প্রত্যেকবারেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সমীর, এইবার বুঝি লাগলো—এইবার গুন ধরলো ওষুধের।···এতদিনে ঘুচবে বন্দীদশা, এবছরে পারবে ম্যাট্রিকটা দিতে।

পুরনো পড়ে যায় ওষুধ, অরুচি এসে যায় বিরজার একঘেয়ে ব্যবস্থা করতে করতে। ছেড়ে দেওয়া হয় সেটা, আবার ছ'দশদিন বাদে ধরা হয় অন্য আর একটা।

আবার দিন গুণতে থাকে সমীর, মনে মনে হিসেব করে আগামী পরীক্ষার তারিখ। প্রথম প্রথম আসতো স্কুলের বন্ধুরা, গল্প করতো— স্কুলের আর খেলার মাঠের।……হতাশ হয়ে বলতো—"তোর কি হলো ভাই? পুজোর ছুটি এসে গেল, কতো কি মজা হবে—কি যে শুধু শুধু বিছানায় পড়ে রইলি।"

ছলছল চোখে ম্লান হাসি হেসেছে সমীর।

ধীরে ধীরে থেমে এলো তাদের আসা-যাওয়া। কেউ পরীক্ষা দিলে, কেউ দিলে না। কেউ পাস করলে, কেউ ফেল। সবাই নিজের তালে ব্যস্ত।… কে আর কতোদিন মনে করে রাখবে—বেচারা সমীর বেরোতে পারেনা, পারেনা হাঁটতে। কে বুঝতে পারবে বাইরের জগতের একটুখানি হাওয়া বয়ে নিয়ে গেলে কতো ধন্য হয়ে যাবে সমীর।

দলের মধ্যে থেকে একা সমীরের ফাঁকটা বুজে গেল কোন্ ফাঁকে, ওদের খেয়াল রইলনা। দলহারা সমীরের মনে স্থায়ী হয়ে রইল সমস্ত দলের বিরাট ফাঁকটা।

* * * *

মজুমদার বাড়ীর পিছনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে সমীর, বাড়ীটার সামনের দরজাটা কিরকম দেখতে ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ফাটলে গজানো অশ্বত্থ চারাটায় গজালো আর ক'খানা নতুন পাতা।

এগারো মাস ধরে এই একই দৃশ্য দেখছে সমীর, বাইরের জগতের আর কোনো ছবি ওর চোখে পড়েনি।…চৌকিটাকে ঘরের এপাশে টেনে এনে পাতলে দেখতে পেতো ওই মজুমদারদেরই বারবাড়ীটার উঠোনটা। নামে উঠোন, মাঠ বললেও চলে। আগে যখন ওরা দেশের বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে যায়নি, তখন এই উঠোনে পূজোর সময় চারদিন ধরে চলতো যাত্রাগান, ম্যাজিক। কালীপূজোর রাত্রে—কালীকীর্তন আর কবির লড়াই। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়তো ওই উঠোনে।

এখন অবশ্য ভাঙা পাঁচিলের সুযোগ পেয়ে চরতে আসে রাজ্যের গরু বাছুরের দল, রাখালগুলো ঘুমোয় একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে।

তবু—সে দৃশ্যেরও তো পরিবর্তন আছে।

দেখতে পাওয়া যায় সজীব প্রাণীর নড়া-চড়া। দেখতে পাওয়া যায়—অনেকখানিটা সবুজ।......ঘরের এপাশের জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশ। আকাশ নয়—উইয়ে খাওয়া আমকাঠের ফ্রেমে আঁটা আকাশের ছবি এক-টুকরো। তবু সেই টুকরোর গায়েও তো দেখা যায় নানা রঙের খেলা, দেখা যায় চলমান মেঘ।...সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে—এই এঁদোপড়া একতলার ঘরখানাও যখন হঠাৎ একটা সোনালী আলোয় ভরে ওঠে, ঘরের তুচ্ছ জিনিসগুলো কেমন যেন সুশ্রী লাগে, অস্বাভাবিক ফর্সা দেখায় বিরজার শীর্ণ মুখখানা, তখন সমস্ত প্রাণটা যেন আছাড় খেতে চায় সমীরের—ওই সোনা ঝরানো আকাশটাকে একবার চোখ দিয়ে দেখতে।......আলো মিলিয়ে যায় নিমিষেই। ঘরটা—সেই হঠাৎ আলোর মতোই হঠাৎ অন্ধকারে ডুবে যায়। অন্ধকারাহত বন্দীআত্মা ব্যাকুল আবেগে মুক্তি পেতে চায়। মুক্তি পেতে চায় শুধু ঘরখানা থেকে নয়, বুঝি বা দেহের পিঞ্জর থেকেও।

ব্যস্—আর তো কিছু রইল না। আজকের মতো বাইরের সমস্ত সমারোহ শেষ হয়ে গেলো।

এর পরের জন্য তোলা আছে—ফাটা চিমনিতে কাগজমারা ভূষোপড়া লণ্ঠনটা, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত বিরজার কাতরোক্তি আর হা-হুতাশ, সুধাংশুর বিরস বিষণ্ণ মুখ।...আর আছে আকর্ষণ-লেশহীন অরুচিকর রাত্রির আহার্য।

খাবার দেখলে—রসনা বিদ্রোহ করে ওঠে, কিন্তু বিরজাই বা কোথায় পাবে এর চাইতে ভালো!

চৌকিটা এদিকে টেনে আনার অসুবিধে অনেক।...আচমকা বৃষ্টি এলে ছাট লাগবে রোগীর গায়ে, কোন্ ফাঁকে লেগে যাবে বেশী হাওয়া, বিরজার চলাফেরার কষ্ট হবে—শোবার জায়গা থাকবে না মেঝেয়।

সমীর আকাশ দেখতে পাবে বলে—এতগুলো বড়ো বড়ো অসুবিধে ঘটানো হবে, এমন অদ্ভুত কথা ভাবতেই পারেনা বিরজা আর সুধাংশু।

আকাশে আবার দেখবার কি আছে?

আকাশ দেখবার জন্যে কে কখন উর্ধ্বপানে চেয়ে বসে থাকে?

আকাশের বদলে আর একটা জিনিস কিছু পেলেও বর্তে যেতো সমীর, কিন্তু তাই বা কোথায়? বই! কিন্তু বই কোথায় পাবে সুধাংশু? কোথা থেকে যোগাড় করবে? সারা গ্রামটা ঝাঁট দিলেও স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া আর কিছু বেরোবে কি না সন্দেহ। তাও তো—এখান ওখান থেকে এনে দিল কতগুলো—রামায়ণ, মহাভারত, চাঁদসদাগর যাত্রাগানের পালা, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, আরো কি কি যেন।...ছেলে যদি দুদিনে একটা আস্ত বই শেষ করে ফেলে, কি করবে সুধাংশু?

এখন ইচ্ছে—একটা খবরের কাগজের। তাও আবার জেলার কাগজ নয়, কলকাতার। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমীর এতো শিখলোই বা কি করে? সুধাংশু অবশ্য তাও দিতে অরাজী নয়, কিন্তু কলকাতার কাগজের গ্রাহক হতে হলে যে কি করতে হয় সুধাংশু কি জানে ছাই?

কি নাম, কি ঠিকানা?...স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করে আসবার কথা ছিল আজ। মাসে চার পাঁচটা টাকা যাবে—যাক্! কষ্ট করে চালিয়ে নেবে সুধাংশু। ইস্কুলের মাইনেও তো লাগতো।

* * * *

খুব উৎফুল্ল হয়ে ঢুকলো সুধাংশু। আজকাল আর এমন স্ফূর্তিভাব দেখতে পাওয়া যায় না তার।

—কাগজের ঠিক করেছো বাবা?

একটু উৎফুল্ল সমীরকেও দেখাচ্ছে!

—ঠিক? কিসের ঠিক? ও—তোর সেই কাগজের? তার জন্যে আর ভাবতে হবেনা, একেবারে টাটকা কলকাতাটাকেই হাতে করে নিয়ে এলাম দেখ্। তাকিয়ে আছিস যে ফ্যালফ্যাল করে? কে এসেছে বল দিকিন? পারলিনা তো? জিতু এসেছে কলকাতা থেকে, তোর জিতেনদা।

—জিতেনদা? জিতেনদা এসেছেন?

উৎসাহে চকচক করে ওঠে শীর্ণ রুগ্ন মুখ।

—তবে আর বলছি কি? যাচ্ছিলাম—ইস্কুলের দিকে, পথে দেখা! একলাই এসেছে। এই বাড়ীঘর একবার দেখতে এলো। বললে—"মিস্তিরি লাগাবো বাড়ীতে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর ফেলে রাখা উচিত নয়।" পয়সা তো

বহুত করেছে এখন! তিন ভাই সমান, এক একটি কেষ্ট বিষ্টু। সেই আমাদের জিতু! কী চেহারা! রাস্তা দিয়ে আসছে যেন একটা সাহেব।...দেখতে ইচ্ছে করছে না? এই এলো বলে—তোর মার সঙ্গে কথা কইছে। উঃ কী ভালোই বাসতো আগে! তোকে তো কোলে পিঠে করে মানুষই করেছে বলতে গেলে। বড়লোকের ছেলে হলেও চাল নেই—এখন চলে গিয়ে আর··· এই যে জিতু, এসো বাবা।

জিতেন ঢুকলো ঘরে, পিছন পিছন বিরজাও।

* * * *

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখছে সমীর···কী অদ্ভুত ভালো দেখতে হয়েছে জিতু! এতো লম্বা! এতো ফর্সা! এতো সুন্দর পোশাক! এ কি সেই জিতু? ছেলেবেলা যার কোলে পিঠে উঠেছে সমীর? যে জিতুদা পাখী পোষবার জন্যে খাঁচা তৈরী করে দিয়েছিল সমীরকে, ঘুড়ির জন্যে লাটাই। পূজোর সময় যাত্রাগানের রাত্রে ঘুমন্ত সমীরকে ডেকে নিয়ে যেতো বাড়ী থেকে, প্রসাদ বিতরণের সময় সমীরের দিকে লক্ষ্যটা রাখতো বিশেষ করে।

সেই জিতুদা!

* * * *

কি চমৎকার কথাবার্তা হয়েছে জিতুর।

গলার আওয়াজেই যেন হেসে উঠলো ঘর। এতো পরিষ্কার এতো চটপটে কথা এ গ্রামের কারুর আছে নাকি?

—কি রে, তুই নাকি ঠ্যাং ভেঙে বিছানায় পড়ে আছিস যতো ইচ্ছে?

বহুদিন পরে সমীরের মুখে হাসি ফোটে—ভাঙলাম আবার কই?

—ওই হলো। নিজে কি আর ভেঙেছিস হাতুড়ী ঠুকে! স্বপ্নের ঘোরে মল্লযুদ্ধ করেছিলি বোধ হয় কোনো পালোয়ানের সঙ্গে, দিয়েছে ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভেঙে।

হা হা করে হেসে ওঠে সকলে, সমীরও।

—তা'পর? পরীক্ষে টরীক্ষে দিসনি তো?

—কই আর দিতে পারলো বাবা—সুধাংশু উত্তর দেয়—যে বছর দেবে—

—থাক থাক, আপনি আর ছেলের দোষ ঢাকবেন না কাকাবাবু, আসল কথা শুনবেন? সারা বছর আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছে, বইয়ের পাতা খোলেনি,

পরীক্ষার আগে ভয় ঢুকেছে প্রাণে, ব্যস—অমনি পায়ের ব্যথার ছুতো! দিব্যি আরামসে শুয়ে থাকি বাবা!

জিতু প্রত্যেক কথায় হাসাবে লোককে।

ঘরের হাওয়া কী হালকা লাগছে! মনে হচ্ছে যেন খোলা আকাশের নিচে রয়েছে সমীর।

* * * *

—তোমার এই ছেলেটির চালাকী আমি ঘোচাচ্ছি নতুনকাকীমা, অসুখ না হাতী! আরে বাবা একবার 'এক্সরে' করলেই তো ধরা পড়বে কি হয়েছে পায়ে! বেরিয়ে যাবে ফাঁকি!

—সে তো বুঝি বাবা—সুধাংশু উত্তর দেয়—কিন্তু আমাদের কাছে তো ওসব আকাশকুসুম। একটা ভালো ডাক্তার দেখানো তাই হয়ে উঠলোনা এতোদিনে।

এবার একটু গম্ভীর হয় জিতু—তা অবশ্য দেখালেও পারতেন, কিছু না হোক, মনের নিশ্চিন্ততার জন্যে। তা ভালো না হোক মন্দ কেউ দেখছে তো?

এবার কথা কয় বিরজা—নিয়ম করে আর কে দেখছে? ওই, যে যখন যা বলছে করছি, এখন তো সবাই বলছে—হাড়ে নাকি ঘুণ ধরেছে।

—লোকের তো আর বলতে পয়সা লাগেনা—ধমক দিয়ে ওঠে জিতেন—হাড়ে ঘুণ ধরেছে! বললেই হলো সাপ ব্যাঙ্ একটা কিছু। এ যেন তোমার আমকাঠের জানলা তাই ঘুণ ধরেছে! জন্মে শুনিনি এমন কথা! ও যা হয়েছে আমি বুঝেছি, বিশেষ কিছুই না, কলকাতায় এ রোগ খুব হচ্ছে আজকাল, তেমনি নতুন নতুন ইনজেক্শনও উঠেছে, একেবারে অব্যর্থ। গোটাকতক দিলেই ব্যস, উঠে গিয়ে হাডুডু খেলবি।

আনন্দে উৎসাহে বুকের ভেতরটা ধ্বক ধ্বক করে ওঠে সমীরের, জ্বলজ্বল করে ওঠে রুগ্ন শ্রীহীন মুখ।

আসবে এমন দিন!

সমীর আবার পৃথিবীর মাটিতে পা দেবে, ছুটোছুটি খেলা করবে!

—সত্যি জিতুদা? আছে এমন ওষুধ?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি? খুব ওস্তাদ ছেলে তো তুই। পৃথিবীর

সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা চব্বিশ ঘণ্টা মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে নেড়া হয়ে যাচ্ছে কেন তা হলে? তোর তো কিছুই হয়নি, সত্যিকার ভীষণ ভীষণ অসুখেরও এমন সব ইনজেক্‌শন বেরিয়েছে শুনলে হাঁ হয়ে যাবি।

—কলকাতায় ছাড়া পাওয়া যায় না জিতুদা?

আগ্রহে আর আশঙ্কায় গলাটা কেমন ধরে আসে যেন।

—তা অবিশ্যি যায় না। তাতে কি, এইতো কালই চলে যাচ্ছি আমি? গিয়েই তোর সব ব্যবস্থা করছি। এতোদিন কি জানি ছাই তুই এই রকম ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছিস! বিজ্ঞানের কতো উন্নতি হয়েছে খবর রাখিস কিছু? এই তো যুদ্ধের সময় বোমায় হাত পা উড়ে যাওয়া লোকেরা সব এখন ফুটবল খেলছে, মটর গাড়ি চালাচ্ছে। তোর পা আমি দিচ্ছি ঠিক করে।

—সত্যি বাবা—হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বিরজা—একটু চেষ্টা দেখবে ছেলেটার জন্যে? ও তোমার ছোটো ভাইয়ের মতো—

—আঃ কী জ্বালা! কান্না শুরু করে দিলে কেন? ও আমার ছোট ভাইয়ের মতন কি বড়দাদার মতন তা আর বোঝাতে হবে না আমাকে। তুমিই ভুলে গিয়েছ আমায়। নইলে—এতোদিনের মধ্যে একটা চিঠি দিতেও পারতে।

অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে বিরজা।

সত্যিই তো, জিতু যে তাদের কতো আপনার সেটা আগে ভাবা উচিত ছিল। সমীরকে তো জিতুই একরকম মানুষ করেছে। বড় লোকের ছেলে বটে, কখনো চাল অহঙ্কার ছিল না।

এরপর আরো দু একটা কথায় সমীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বিরজা ওঠে জিতেনের খাবার ব্যবস্থা করতে। সুধাংশুকেও চোখ টেপে, ব্যবস্থা তো একলা হয় না।

সুধাংশু উঠতে উঠতে বলে—ভালোকথা, তোর ওই কাগজের কথা জেনে নে জিতুদার কাছে—

—কাগজ কি?

—খবরের কাগজ জিতুদা?…সারাদিন চুপ করে শুয়ে থাকি, এতো ইচ্ছে করে বই পড়ি, কিন্তু কোথায় পাবো? শহরে কতো কি আছে, এখানে তো একটা লাইব্রেরী টাইব্রেরী কিছুই নেই ছাই! তাই ভাবি রোজ যদি একটা—খবরের কাগজ পাই—ভালো কাগজ।

—এই কথা! এর আবার জানার কি আছেরে হাঁদা? গ্রাহক হলেই হলো।

—তা'তো জানি, কিন্তু—কোথায় লিখতে হয়—কোন্ কাগজটা ভালো কিছুই জানিনে যে—সমীর অপ্রতিভ ভাবে হাসে।

—আচ্ছা! আচ্ছা! ঠিক আছে, বেশী আর কিছু জানতে হবেনা তোকে, কাগজ পেলেই তো হলো তোর? কি চাস? আনন্দবাজার? যুগান্তর?

কম্পিত কণ্ঠে সমীর বলে—তুমিই বলোনা!

—বেশ আমিই দেবো অখন একটা ঠিক করে। তোর নামেই আসবে, কেমন? বেশ মজা লাগবে। তা শুধু কাগজ কেন? মাসিক পত্র-টত্রও তো ত্থ' একটা পড়তে পারিস।

সমীর ম্লান হাসে। কথা কয় না।

পড়তে পারবে না কেন, পড়বার জন্যেই তো পাগল সে। কিন্তু পেতে পারার প্রশ্ন একটা আছে তো।

জিতু বলে চলে—আচ্ছা রোস, খান হু'তিন পত্রিকারও গ্রাহক করে দেবো তোকে, তোদের বয়সের মতো—মানে কিশোর পত্রিকা যে কতো উঠেছে আজকাল।

—সে যে অনেক টাকার ব্যাপার জিতুদা—

সমীর হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলে।

—বটে? খুব যে বিজ্ঞ হয়েছিস? আবার টাকার ভাবনাও ভাবতে শিখেছেন বাবু। পাকামী!...গিয়েই অর্ডার দিয়ে দেবো, নিশ্চিন্দি থাক।

—জিতুদা!

কৃতজ্ঞতায় দুই চোখ ছল ছল করে আসে সমীরের।

স্বয়ং ভগবান কি জিতুদার মূর্তি ধরে ছলনা করতে এলেন!

জিতু ওর মুখপানে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে!

আহা! সেই খোকা! নধরকান্তি ছেলেটি! নতুন কাকীমার একটিমাত্র সন্তান। কি হাল হয়েছে তার! কি যে হয়েছে ওর, জিতেনের সে আর বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু এখনো চেষ্টা করলে কি হয় না? প্রতীকারের বাইরে চলে গেছে একেবারে? এই কি সম্ভব? ভগবান কি নেই? এমনি করে ঘরে ঘরে অকালে শুকিয়ে যাবে আমাদের দেশের তরুণ প্রাণগুলি?

কেউ ভাববে না তাদের কথা? কেউ দেখবে না তাকিয়ে? এই অক্ষম, অসহায়, অজ্ঞতা আর অভাবে নিষ্পেষিত মানুষগুলোর জন্যে কারুর কোন দায়িত্ব নেই?…প্রত্যেকটি কৃতীলোক পারেনা একটা করে মানুষের ভার নিতে? —আইনের দায়ে নয়—মানবতার দায়ে!

কেন জিতুই কি পারেনা, এই নিরুপায় হতভাগ্যকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে আনবার চেষ্টা করতে? কতো অর্থ অপচয় হয় তার হাতে, কতো উড়ে যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায়। তার একাংশ খরচ করলেও উচিত মতো চিকিৎসা হতে পারে ছেলেটার। ফিরে পেতে পারে নতুন তাজা জীবন!

স্নেহে করুণায় সারা হৃদয় ছলছল করে ওঠে জিতুর।

মুখে কিন্তু সে তেমনি হৈ হৈ করেই কথা কয়—বই পড়তে খুব ভালোবাসিস বুঝি? কি কি পড়েছিস?

সমীর লজ্জিত মুখে বলে—কি বা আছে এখানে! রামায়ণ, মহাভারত, দুর্গেশনন্দিনী আর আনন্দমঠ।

চাঁদসদাগরের পালাগানের কথাটা আর উল্লেখ করেনা।

জিতু হতবুদ্ধি হয়ে বলে—শুধু এই? সে কি রে?

বইয়ের অভাবে বইপড়া হয় না, এটা কি আবার একটা কথা নাকি!

কলকাতার সমৃদ্ধজীবনে অভ্যস্ত জিতু, অভাবের স্বরূপটা দেখে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনা!—পারবেই বা কি করে? ছাপার কাগজে মোড়া কলকাতা শহরের বাসিন্দা যে সে! যেখানে জল-স্থল আকাশ অন্তরীক্ষ সবাই অহরহ ছাপার অক্ষরের ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসছে চোখে খোঁচা মারতে। যেখানে নিষ্ঠাসহকারে সরস্বতীপূজো পালন করতে হলে চোখে রুমাল বেঁধে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই, সেখানের লোক কি করে বিশ্বাস করবে ছাপার অক্ষরের একটি লাইনের জন্যে কতো লালায়িত হয়ে থাকে একটি তৃষিত প্রাণ!

চোখটা জ্বালা করে ওঠে জিতুর, আর হাসিখুসির ঠাঁট বজায় রাখতে পারেনা যেন, সকরুণ মমতায় বলে—তুই আর গোটা চার পাঁচ দিন চুপ করে থাক সমীর, কলকাতায় পৌঁছেই আমার প্রথম কাজ হবে তোর বইয়ের সুরাহা করা, তারপর চিকিৎসার। তোদের যুগ্যি কতো বই যে আমাদের বাড়ীতেই

পড়ে রয়েছে, তার সংখ্যা নেই। দাদার ছেলেমেয়েরা, বোধহয় প্রত্যেক পূজোয় পূজোবার্ষিকীই কেনে আট দশটা। আর তেমনি সব ডাকাত তো। সারা বাড়ীতে ছড়ানো আছে সেই বস্তা বস্তা বই। আলমারীতে তুলতে জানেনা। পড়ছে, ছিঁড়ছে, ফেলে দিচ্ছে, আবার কিনছে। সুবিধে থাকলে একেবারে বস্তা করে পাঠিয়ে দিতাম তোকে। যাক্, কিছু কিছু করে পার্শেল করবো মাঝে মাঝে, কি বলিস ?

বলবে আর কি সমীর ! কিছু বলবার ক্ষমতা কি তার আছে আর ?

চোখের কোল দিয়ে উপছে পড়ে এক ঝলক আবেগ-তপ্ত অশ্রু।

* * * *

খেতে বসে ধীরে ধীরে কথাটা ব্যক্ত করে জিতেন।

—রোগটা সত্যিই শক্ত কাকাবাবু। লোকে যা বলেছে নেহাত মিথ্যে নয়। এ একরকম হাড়ে ঘুণ ধরাই। যাক্, ভাববেন না, খুব ভালো চিকিৎসা হয়েছে আজকাল, সেরে যাবে কিছুদিনের মধ্যে।...ঠিক সেরে যাবে। আমি গিয়েই ব্যবস্থা করবো।

পাতের কাছে দুধের বাটিটা বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়ে বিরজা। চোখের জল না সামলালে চলছে না আর।

—ভগবানের আশীর্বাদের মতো তুমি এসে পড়লে জিতু, তোমাকে আর কি আশীর্বাদ করবো বাবা ! দীর্ঘজীবী হও, নীরোগ হও, এই প্রার্থনা।

* * * *

পরদিন চলে যায় জিতু। আশ্বাস দিয়ে যায় অনেক।

দীর্ঘকাল পরে নিতাই স্যাকরার তাসের আড্ডায় গিয়ে বসে সুধাংশু, বিরজা বসে বহুদিন পরে অসমাপ্ত কাঁথাখানি নিয়ে সেলাই করতে।...আর কি ? সব তো ঠিক হয়ে গেছে।

বাড়ীর আবহাওয়ায় যেন বাজছে কিসের আগমনী সুর।

যেন সমীর ভালো হয়ে গেছে। যেন ওদের জীবনে আর কিছু ভাববার নেই, দুশ্চিন্তা করবার নেই। অনেক দিনের বুকচাপা পাথরখানা বুক থেকে সরে গেছে বুঝি বা !

আর সমীর ?

হাত দিয়ে যদি দিনগুলো ঠেলে দেওয়া যেত !

বস্তা বস্তা বই! কি রকম দেখতে লাগে সে দৃশ্য! হায় ভগবান—সমীরের যদি ডানা থাকতো!

* * * *

ওষুধ···ইনজেক্‌শন···ডাক্তার···বৈজ্ঞানিক···খেলার মাঠ···ম্যাট্রিক পরীক্ষা ···এসব শব্দগুলো কি অর্থহীন? মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেন? ভালো করে ভাববার শক্তি নেই বলে?

* * * *

বইয়ের পার্শেল? গ্রাহক নম্বর লেখা কিশোর পত্রিকা? সমীরের নাম লেখা খবরের কাগজের মোড়ক?···এসেছিল নাকি? পাঁচ দিন—ছ'দিন—পঁচিশ দিন—ছাব্বিশ দিন—পাঁচ মাস ছ'মাস—আরো পরে?···নাঃ! আসেনি কিছু তো।···আর কতো প্রতীক্ষা করা যায়? এগারো মাসের সঙ্গে আরো সাত মাস যোগ করলে কতো হয় সেইটাই এখন হিসেব করে সমীর···ম্যাট্রিক পরীক্ষার তারিখের কথা আর মনে পড়ে না।

অনেক বলে কয়ে ঘরের এপাশে চৌকিটা আনিয়েছে সমীর। সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক্ হয়ে।···কতো রঙের বৈচিত্র্য! কি রকম ক্ষণস্থায়ী! এই ভরে যাচ্ছে সোনালী আলোয়, তখুনি নামছে অন্ধকার! ভোরের সোনালী মায়া মুহূর্তে প্রখর হয়ে উঠছে।

পিয়নের পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকবার ধৃষ্টতা আর নেই, কল্পনায় সম্ভব অসম্ভব সর্ববিধ বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে করে, আর সেটা মিটে যাবার মেয়াদ দিয়ে দিয়েও দিনের হিসেব আর মিলিয়ে উঠতে পারেনা এখন! ···তবু—বাইরের দরজার কড়া নড়লেই প্রাণটা ছ্যাৎ করে ওঠে। হঠাৎ যদি ভারী ভারী গলায় বলে ওঠে কেউ—"সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কে আছেন? সই করে নিতে হবে, পার্শেল আছে"—কি করবে সমীর? কি করে বইবে সেই সৌভাগ্যের ভার?

* * * *

ডাকঘরে গিয়ে খোঁজ নিতে নিতে এলে গেছে সুধাংশু, তবু এখনো পথে ঘাটে বিপিনের সাথে দেখা হয়ে গেলে প্রশ্ন করে—চিঠি আছে না কি বিপিন? কিম্বা কোনো পার্শেল টার্শেল?

বিপিন কখনো ঘাড় নেড়ে চলে যায়, কখনো ঠাট্টা করে বলে—"পার্শেল

একটা এবার আমিই আপনার নামে পাঠাবো বাঁড়ুয্যে মশাই, একটা না এলে দেখছি চলছে না আপনার।"

* * * *

বিরজার সেই কাঁথাখানা খানিকটা এগিয়ে আবার তোলা আছে সাঙায়। আজকাল আবার ছুঁচে স্থতো পরাতে পারে না সহজে। চোখটা কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে।

* * * *

মজুমদার বাড়ী মিস্তিরি লাগবার কথা ছিল। আলোর সেই কণিকাটুকুর দিকে এখনো তাকিয়ে থাকে বিরজা।

কিন্তু জিতুই কি মিথ্যাবাদী?

সবটাই তার অভিনয়?

তাই বা বলা যায় কি করে? আকাশ কি মিথ্যাবাদী? সোনালী মেঘ কি তার অভিনয়? মেঘই তো শুধু চলমান নয়? মানুষও যে প্রতিনিয়ত চলছে। অহরহ রং বদলাচ্ছে তার ঘটনার ধাক্কায়, পারিপার্শ্বিকতার আলোকে!

সোনালী রংটুকুই বা স্থায়ীত্বের দাবী করবে কেন?

না, জিতুকে আমরা দোষ দিতে পারি না। ভেবে দেখলেই ধরা পড়বে—প্রত্যেকের মনের আকাশেই এরকম অসংখ্য সদিচ্ছার রঙিন মেঘ বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে ঘটনাচক্রের প্রখর তাপে, অকারণ আলস্যের কুয়াশায়।

তবু তো জিতু খেতে শুতে, বেড়াতে, কাজ করতে, অনেক বার অনেক সময় ভেবেছে—"কী বিশ্রী দেরী হয়ে যাচ্ছে—ছি ছি! নাঃ এইবারে সত্যিই কিছু করা দরকার।...অন্ততঃ খুব কতকগুলো বই পার্শেল করে পাঠিয়ে দিলেও হয় বেচারাকে—গোটাকতক টাকা জমা দিয়ে এলেই হয় একখানা খবরের কাগজের অফিসে—"

ভান

বাসভর্তি লোকের মাঝখানে একটু জায়গা দখল করে বেশ সহজভাবেই বসেছিল লোকটা, কন্‌ডাক্‌টার এসে টিকিটের জন্যে হাত পাততেই হঠাৎ বেয়াড়া রকমের একটা হাসি হেসে উঠল।

এ হাসি চিনতে কারো ভুল হয় না।

আশপাশের লোক সভয়ে যতটা সম্ভব সরে বসবার চেষ্টা করল, এবং কন্‌ডাক্‌টার ছোকরা মুহূর্তকাল ইতিকর্তব্য চিন্তা করে লোকটাকে নির্দেশ দিল, 'নেমে যান স্যর।'

বলা বাহুল্য, নেমে যাবার কোন লক্ষণ তা'র দিক থেকে দেখা গেল না, উত্তরে শুধু দন্ত বিকশিত করে বেশ জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

কন্‌ডাক্‌টার আর কিছু বলবার উপক্রম করতেই অন্য আরোহীবর্গ উদার অভিমত প্রকাশ করেন, 'ছেড়ে দাও হে, ছেড়ে দাও। দেখাই যাচ্ছে পাগল! নাড়াচাড়া করে আর বিপদ ডেকে আনা কেন? চুপচাপ বসে আছে থাক।'

ফল হয় উল্টো।

এহেন উদার অভিমতে বোধ করি পাগলের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।… সে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করে, 'পাগল বলবেন না স্যর, পাগল বলবেন না। মনে বড়ো দাগা পাব।…চন্দ্র স্থয্যি সাক্ষী, আমার সাতপুরুষে কখনো কেউ পাগল ছিল না।…আমাকে আপনারা পাগল বলে ভুল করবেন না, দুঃখের জ্বালায় আজ আমার এই অবস্থা। নইলে আমিও মশাই খানদানী ঘরের ছেলে। আর আমার জীবনের ইতিহাস যদি শোনেন —নাঃ সত্যি কথা বললে তো বিশ্বাস করবেন না!'

একটি কৌতুকপ্রিয় ছোকরা বলে ওঠে, 'বলে যান না স্যর, অবিশ্বাসের কি আছে?'

অপর আরোহীরা একটু 'মজা'র আশায় জুত করে বসে।

বোঝা যাচ্ছে যে, লোকটা মারাত্মক টাইপের পাগল নয়। যাকে বলে ছিটগ্রস্ত। অতএব—খানিকটা সময় কাটবে ভালো।

সুস্থ মানুষদের কাছে 'পাগল' যে দস্তুরমতো একটা উপভোগ্য বস্তু, এ আর কে না জানে!···কে জানে, কেন মানুষের 'পাগলামির' প্রতি এমন দুরন্ত আকর্ষণ! পাগলের আবোল-তাবোল কথার মধ্যে কী রস পায় সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ?

হয়তো বা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই গুপ্ত হয়ে আছে পাগলামির বীজ! আবোল-তাবোল ব্যবহার করবার একটা দুরন্ত লোভ দমিত হয়ে আছে অবচেতন চেতনার অন্তরালে, পরের পাগলামিতে তা'র কিছুটা তৃপ্তি সাধন হয়। তাই 'ভাব' লাগিয়ে মূর্ছা যেতে যে নাও পারে, 'ভাব' দেখে চোখ দিয়ে অন্ততঃ আনন্দাশ্রু ঝরে তা'র।

লোকটা একবার সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইশারায় কৌতুকপ্রিয় ছোকরাটিকে কাছে ডাকে।···কাছে আসতেই গলা খাটো করে গোপন তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গীতে বলে, 'পেপার পড়েন তো দাদা? নিশ্চয় পড়েন?··· জানেন অবিশ্যিই প্রতাপগড়ের মহারাজার জামাই আজ পাঁচটি বছর নিরুদ্দেশ?'

ছোকরা হাসি লুকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'ইস্ তাই নাকি? জানি না তো—'

'বলেন কি? তবে আর কোন্ খবরটা রাখেন দাদা?···পাঁচ পাঁচটি বছর। ···সে জামাই আছে কোথায় জানেন?···জানবেন কোথা থেকে, জানবার কথাও নয়।···অবিশ্বাস না করেন তো বলি,—' গলার স্বর আরো খাটো করে মুখের চেহারায় একটি রহস্যময় ব্যঞ্জনা এনে লোকটা নিজের বুকে একটা হাত রেখে বলে, 'সে লোক—আপনাদের সামনেই বসে।'

বলা বাহুল্য, একটা হাসির তরঙ্গ খেলে যায় সকলের মধ্যে।

পাগল মাথা তুলে একবার পরিস্থিতিটা দেখে নিয়ে বলে, 'বিশ্বাস করলেন না?···করবেন না তা' জানি। চিনি তো সব শালাকেই।'

'এই খবরদার! মুখ সামলে—'

এক ভদ্রলোক তেড়ে ওঠেন।···অপর একজন তাঁর জামার কোণ ধ'রে নিবৃত্ত করেন,···বলেন, 'আপনিও যে ক্ষেপলেন মশাই। পাগলের কথা আবার ধরতে আছে?'

পাগল এবার রীতিমত চটে ওঠে।

আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে চড়া সুরে বলে, 'বার বার 'পাগল' 'পাগল' করবেন না মশাই। বলছি—কস্মিন্‌কালেও আমি পাগল নই।···সত্যি পাগল

যদি কেউ থাকে তো সে আপনারাই। নইলে সহজ মানুষকে পাগল বলে হাসেন, আর সত্যিকার পাগলকে 'নেতা' বলে মাথায় করে নাচেন, 'দেবতা' বলে তা'র পায়ে গড়াগড়ি খান! ছ্যাঃ!'

'ও বাবা এ যে দেখছি দস্তরমতো জ্ঞানী পাগল।'

একজন অস্ফুট মন্তব্য করেন।

আগের ছোকরাটি বলে ওঠে, 'ওসব কথা থাক স্যর, রাজকন্যার খবর বলুন! রাজার জামাই তো নিরুদ্দেশ, মেয়ে?'

লোকটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, যেন আচম্‌কা একটা শক্‌ পেয়েছে। মাথা হেঁট করে নিজের তালুতে কি যেন নিরীক্ষণ করে, তারপর ফিসফিস করে বলে, 'সেই তো কথা দাদা।...আটকে রেখেছে।...বন্দিনী রাজকন্যা! ও হো হো! ...আমি দাদা কোর্টে নালিশ তুলবো!...জানি, সে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছে!...বুঝতেই পারছেন—লাভ ম্যারেজের ব্যাপার? ...তাই বলছিলাম কি—আপনারা পাঁচজনে যদি ব্যাপারটাকে একটু সিমপ্যাথির চক্ষে দেখেন! কোর্ট খরচাটা তুলতে পারলেই দেখে নিই একবার। দেখুন সামান্য ক'টা টাকার অভাবে ছু'টো প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে।...ছু'টি ফুল্ল কুসুম!'

চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। হাসির ঝড় বয়। লোকটা কিন্তু এসব গ্রাহ্য করে না। এই ছোকরাকেই মুরুব্বি ধরে বলে, 'দেখুন না দাদা, বলে কয়ে পাঁচজনকে—'

সে ছোকরা তামাসার সুরে চীৎকার করে বলতে শুরু করে, 'ও মশাইরা শুনছেন? সামান্য কিছু টাকার যোগাড় হলেই একটি বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধার হন।...দেখুন আপনারা যদি কিছু—'

বলা বাহুল্য, পকেটে হাত কারোই পড়ে না। বরং ছু'চারটি বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা যায়।...'পাকা জোচ্চোর', 'এ আবার এক নতুন ট্রিক্‌স্‌'...'উঃ পথে ঘাটে চলা দায়'—ইত্যাদি।

লোকটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর পকেট থেকে একখানা আধময়লা রুমাল বার করে ছু' হাতে বিছিয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেউ নেমে যায়, নতুন কেউ ওঠে, রুমালের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। পাগলা একটু দেখেই হঠাৎ 'হা হা' শব্দে বিটকেল একটা হাসি হেসে

রুমালটা নিজের কপালে কষে বেঁ'ধে নিলে। মনে হলো, একটা কিছু বুঝি করে বসবে।

আরোহীর দল আর একবার সভয়ে সরে বসল।

কিন্তু না, কিছুই করল না। ক্ষতিকর পাগল সে সত্যিই নয়।...পরবর্তী স্টপেজটা আসতেই ধীরে ধীরে উঠে পড়ে।...দার্শনিকের ভঙ্গীতে উদাস স্বরে বলে, 'জানতাম একটা ফুটো পয়সাও কেউ খসাবে না। দুনিয়াটাকে তো দেখলাম ঢের।'

দরজার দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ যেন সকলের চোখে পড়ে যায় লোকটার দেহটা কতো শীর্ণ, আর পরন-পরিচ্ছদগুলো কতো জীর্ণ। ফালা ফালা ছেঁড়া শার্টের ফাঁক দিয়ে পিঠের হাড়গুলো নির্লজ্জভাবে উঁকি মারছে।

কেন কে জানে হঠাৎ অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পকেটের মধ্যে হাতগুলো নিসপিস করে, কিন্তু এমন পষ্টাপষ্টি ধিক্কারের পর দয়া দেখাতেও চক্ষুলজ্জায় বাধে।

তবু এক বুড়ো ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ডাক দেন, 'এই শোনো—ইয়ে সামান্য কিছু—'

পাগল লোকটা ফিরে দাঁড়ায়। বলে, 'দেবেন কিছু? দিন!...পাগলের আবার মান অভিমান!'

বুড়ো ভদ্রলোকের ব্যাপারটা যেন হঠাৎ মন্ত্রের মতো কার্যকরী হয়ে ওঠে। ঝড়াজ্ ঝড় পয়সা পড়ে।...দু' আনা চার আনা আট আনা দাক্ষিণ্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে যেন বর্তে যায় সবাই। বিরুদ্ধ মন্তব্যকারীরাও।

মানুষ কি সত্যিই হৃদয়হীন? তা' নয়! তা'দের হৃদয়কে অনবরত দোহন করা হয় ব'লেই এক এক সময় শুকিয়ে ওঠে।...

পরের স্টপেজে নেমে পড়ে উল্টো মুখে হাঁটতে শুরু করে লোকটা দ্রুত-ভঙ্গীতে।

বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'লোকটাকে জানি! আমাদের ওদিকেই থাকতো। শুনবেন ওর কাহিনী? রায়টের সময় বৌটা গেলো হারিয়ে, চোখের সামনে তিন তিনটে ছেলেকে গুণ্ডারা কেটে কুচি কুচি করে পুকুরে ভাসিয়ে দিলে। সেই থেকে লোকটা—' সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকটি চমৎকার এক গল্প ফাঁদেন।

* * * *

পাগল দ্রুতপদে হেঁটে একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়ে। শ্রীহীন অন্ধকার একটা ঘরে নড়বড়ে একটা চৌকির ওপর একটি মেয়ে বা বৌ, যাই বলা হোক, চুপচাপ শুয়েছিল, পাশে একটা জীর্ণশীর্ণ ঘুমন্ত ছেলে।

ঘরে সংসারে কোথাও কোনোখানে ভদ্রগোছের জিনিসপত্র কিছুই নেই, তবু এক নজরে দেখলেও চিনতে ভুল হয় না, এরা চিরদিন বস্তিতে ছিল না। এই ঘর, এই পরিবেশ এদের নয়। নিজের শিকড় থেকে উপড়ে ছিট্‌কে এখানে এসে পড়েছে।

তাই ব'লে 'তিন তিনটি ছেলে'র গল্পও সত্যি নয়। বৌ হারানো তো নয়ই। 'দাঙ্গা' 'দুর্ভিক্ষ' 'মহামারীর' মতো সাময়িক গল্প নয়, 'একটি মেয়ে আর একটি ছেলের' চিরন্তন গল্প!...পালিয়ে এসেছে প্রেমের দায়ে, তারপর হিতৈষী অভিভাবকদের ভয়ে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো তিনতলা দালান কোঠা থেকে পিছলোতে পিছলোতে ঠেক্ খেয়েছে এসে এই মাঠকোঠায়।

বৌ বললে বৌ, প্রিয়া বললে প্রিয়া। বিয়েটা আইনসঙ্গত করিয়ে নেবার সুযোগ জোটেনি বলেই চিরাচরিত প্রথায় কবিত্ব করে বলেছে, বিবাহের চেয়ে বড়ো বন্ধনে বন্দী রইলো তারা; তাদের বিবাহের পুরোহিত স্বয়ং ভগবান।

তা' সে সব হচ্ছে প্রথম দিকের কথা। অনেকদিন কাটলো তারপর।

এখন আর বিবাহের বৈধতা বা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে দু'জনের একজনও মাথা ঘামায় না, এখন বর্তমান কালটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে অতীতকে, ভবিষ্যৎকে। এখন জগতের সবকিছুর চাইতে যা বড়ো সেই ভাতের গ্রাসের চিন্তাটাই গ্রাস করে রেখেছে অন্য সব চিন্তাকে।

হয়তো বুঝেছে যার ভাত নেই, তার সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটাই হাস্যকর।

লোকটার নাম শঙ্কর, মেয়েটার নাম সুধা।

দারিদ্র্যের অগ্নিদাহে বাইরেটা অমন ঝলসে গেছে বলেই মনে হচ্ছে 'লোকটা'। তিনতলার সেই খোলামেলা হাওয়াদার ঘরটায় যদি থাকতো আজও, হয়তো বলা যেতো 'ছেলেটা'।

শঙ্কর ঘরে ঢুকতেই সুধা ধড়মড় করে উঠে বসল। বসে বললে, 'তোমার কাণ্ডটা কি? কখন বেরিয়েছ তা'র ঠিক আছে?'

শঙ্কর আচমকা এক অট্টহাসি হেসে বলে উঠল, 'ঠিক মানে? পাগলের কিছু ঠিক থাকে?'

'ও আবার কি কথার ছিরি?'—সুধা বকে ওঠে, 'কতো দুঃখে ঘুমিয়েছে ছেলেটা, এক্ষুণি আবার ওঠাও ওকে?…এতোক্ষণ বাইরে থাকলে ভাবনা হয় না? নাওয়া নেই খাওয়া নেই—'

'খাওয়া?…হা হা হা, তুমি যে না হাসিয়ে ছাড়ছ না সুধা, খাওয়ার ব্যবস্থা মজুত আছে নাকি তোমার ঘরে?'

'নেই তো নেই। তাই বলে তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াবে নাকি সারাদিন? …তা'তেই ভাতের ব্যবস্থা হবে?'

'হবে না মানে?'

পকেট থেকে মুঠো করে খুচরো পয়সার গাদা বার করে চৌকির ওপর ঝন্ঝন্ করে ছড়িয়ে দেয় শঙ্কর, 'এই নাও বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারের কড়ি।'

পয়সার শব্দে পাছে পাশের ঘরের বাসিন্দাদের কৌতূহল উদ্রেক হয়, তাই তাড়াতাড়ি সামলে কুড়িয়ে নিয়ে সুধা চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে, 'এসব কি?'

'চিনতে পাচ্ছো না? দীর্ঘকালের অদর্শনে একেবারে ভুলে গেছো?…ওকে বলে 'পয়সা', বুঝলে?'

'এ তুমি পেলে কোথায়?'

'পেলাম?…পাঁচজন হৃদয়বান ব্যক্তির পকেট থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে।'

পয়সা ভর্তি হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে ওঠে সুধার।…নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শঙ্করের মুখের মিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'যা বলে গেলে তাই করলে শেষ পর্যন্ত? ভিক্ষে করলে? তুমি?'

'আমি?' অলৌকিক একটা হাসি ফুটে ওঠে শঙ্করের মুখে। বলে, 'নাঃ আমি আর পারলাম কই? হাত পাততে গিয়ে ভুলে যাওয়া বংশের রক্ত চিন্ চিন্ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত একটা পাগলকে দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে নিলাম।'

সুধা উদ্বিগ্ন মুখে বলে, কি সব গোলমেলে কথা বলছ? কিছু তো বুঝতে পারছি না। পাগল আবার তুমি যোগাড় করলে কোথায়?'

শঙ্কর গায়ের ছেঁড়া শার্টটা খুলে ফেলে সেইটা ঘুরিয়েই বাতাস খেতে খেতে

বলে, 'যোগাড় করতে হয় না গো, যোগাড় করতে হয় না।...ও ব্যাটা সকলের ঘরেই মজুত থাকে, দরকার বুঝলেই উঁকি মারে।'

'নাঃ তুমি আজ দেখছি আমাকেই পাগল করে ছাড়বে।...যাক্ আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না, এখন নাইবে টাইবে?...বিকেলের কলের জলটাও তো এসে গেছে।'

'হ্যাঁ নাইব! নাওয়াটা দরকার মনে হচ্ছে বটে।...সমস্ত শরীরটা কেমন অশুচি লাগছে সুধা। ওই তো পয়সা পেয়েছ, পাশের ঘরের নিমাইটাকে দিয়ে খোকার জন্যে দুধ আর তোমার জন্যে কিছু খাবার আনিয়ে নিতে পারবে?'

'আর তোমার জন্যে?'

'আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়। আজকের দিনটা থাক।...কিছু মন খারাপ করো না সুধা, সত্যিই আজ আর আমার খিদে নেই। স্নান করে এসে একটু শোবো। যা বললাম করো গে—'

সুধা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আগে ঠিক করে বলো এ পয়সা কোথায় পেলে? ভিক্ষে করলে, না চুরি করলে?'

শঙ্কর ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে গম্ভীরভাবে বলে, 'চুরি করবো বললেই কি চট্ করে চুরি করা যায় সুধা? ওর জন্যে ট্রেনিংয়ের দরকার।... ভিক্ষে করাও সহজ নয়, জিভের দরজায় কে যেন চাবি আটকে দেয়। ...পাগলের অভিনয় করে দু' পাঁচজনকে একটু তামাসা দেখিয়ে কিছু মজুরি নিয়ে এলাম।...এখনো তোমার চোখের অবাক্ অবাক্ চাউনি ঘুচলো না? কেন বলো তো সুধা, দিন দিন এতো বোকা হয়ে যাচ্ছ?...ও কি কাঁদছো মানে?...কাঁদবার কি হলো?'

'শেষ পর্যন্ত তুমি পাগল সেজে ভিক্ষে করে আনলে?...একটা কাজকর্ম কিছুতেই জোটাতে পারলে না?'

কান্নায় ভেঙে পড়ে সুধা।

শঙ্কর কিন্তু ওকে থামাবার কোনো চেষ্টা করে না, কিছুক্ষণ কেমন হিংস্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে ওকে একটা নাড়া দিয়ে বলে ওঠে 'কাজকর্ম জোটে কিনা, সে খবর বুঝি এই সাত বছরেও টের পাওনি?... কাঁদতে হবে না শখ করে! ওঠো শিগ্গির!...যাও—নিমাইকে দিয়ে ভালো কিছু খাবার আনাও আর চা। দু'জনেই খাবো। কেন খাবো না? স্টেজে

দাঁড়িয়ে অভিনয় করলে দোষ হয় না ?···তা'ছাড়া—অন্য কি করেছি আমি ? বেশ ক'রব খাবো। খাবার খাব, চা খাব, সিগারেট খাব।'

আশ্চর্যের কথা, খোকাকে দুধ আর বিস্কুট খাইয়ে পাশের ঘরের নিতাইয়ের কাছে খেলতে দিয়ে, নিজেদের খাদ্যগুলো বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই উদরসাৎ করে এরা।···এবং আরো আশ্চর্যের কথা, খাওয়ার পরে ভাঙা তক্তাপোশে গা এলিয়ে দিব্যি জমিয়ে সুধার কাছে গল্প করে শঙ্কর, তা'র অভিনয় কৌশলের কথা। ···আর সুধা সেই 'বন্দিনী রাজকন্যা' এবং 'দু'টি ফুল্ল কুসুমের' গল্প শুনে হেসে কুটি কুটি হয়।

'অসাধ্য' বলে কোনো কথা কি সত্যিই আছে সংসারে ?

চুরির নেশা আর ভিক্ষের নেশা বোধকরি মদের নেশার চাইতে কিছু কম জোরালো নয়।

পরদিনই আবার রীতিমত মেক্ আপ্ করে বেরোতে দেখা যায় শঙ্করকে। চুলগুলো ইচ্ছে করে খানিক উস্কো করে, শার্টের পিঠের ছেঁড়াগুলো আঙুল ঢুকিয়ে আরো খানিক লম্বা করে, বেশীর ভাগ গলায় কোঁচানো উড়ুনি ঝোলানোর ভঙ্গীতে খানিকটা আধময়লা ন্যাকড়া পাক দিয়ে, ঝুলিয়ে নেয়।··· সুধাকে ডেকে ডেকে বলে, 'দেখো তো—বেশ 'পাগল পাগল' দেখাচ্ছে কিনা ?' তারপর শিয়ালদায় গিয়ে একখানা ট্রেনের থার্ড ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ে।

অতঃপর একটি মনের মতো লোক বেছে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে চুপি চুপি বলতে শুরু করে, 'পেপার পড়েন তো দাদা? প্রতাপগড়ের রাজবাড়ীর খবর রাখেন—?'

* * * *

শেয়ালদায়, হাওড়ায়···বাসে ট্রামে পথে।

* * * *

দমদমে, দক্ষিণেশ্বরে, শহরতলীর আশে পাশে।···রোজ নতুন জায়গা খুঁজে বার করতে হয়, খুঁজে বার করতে হয় নতুন নতুন কথার মারপ্যাঁচ। লোকটা যে শিক্ষিত পাগল সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না কারো। আর লোকের

কাছে পথের পাগলের চাইতে যে শিক্ষিত পাগলের আকর্ষণ বেশী সেটা বোধ করি না বললেও চলবে।

লোক বুঝে বুঝে নতুন নতুন কায়দা মাথায় খেলাতে থাকে শঙ্কর! মহিলাদের কাছে একরকম, কমবয়সীদের কাছে আর একরকম। উপার্জন নেহাত মন্দ হয় না।

দুঃখ এই—সারাদিনটাই প্রায় বাইরে বাইরে কাটে।

ভাঙা তক্তাপোশে শুয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবির স্বপ্ন দেখবার সময় পায় না। ...রাত্রে যখনই পড়ে, তখুনি মড়ার মতো ঘুমোয়! প্রথম প্রথম লোকঠকানোর ভঙ্গিমাটা নকল করে সুধাকে দেখিয়ে মজা করত, ক্রমশ পুরনো হয়ে গেছে সেটা।...বলতেও গা আসে না, সুধাও কান দিয়ে শোনে না।

শুধু বেরোবার সময় সুধার সার্টিফিকেটটি চাই।...ঘুরে ফিরে বলবে, 'আর্শি তো নেই—তুমিই আমার আর্শি।...দেখো তো—বেশ 'পাগল' 'পাগল' দেখাচ্ছে কিনা?'

এক একদিন সুধা বলে, 'দাড়ি আর কখনো কামাবে না তা বলে? আগে কি বলতে মনে আছে? বলতে না—পয়সা হলেই প্রথমে একটা ভালো শেভিং সেট্ কিনবে আর একটা বড়ো আর্শি? কি বিশ্রী দেখাচ্ছে বলো দিকি?'

শঙ্কর গালে হাত বুলিয়ে বলে, 'খুব খারাপ দেখতে লাগছে, না? আর পছন্দ হয় না কেমন?'

'আহা কি কথার ছিরিই হয়েছে তোমার আজকাল! বলছি কি—ওসব ইল্লুতেবিত্তি ছাড়ো না এবার? দাড়ি কামিয়ে, ফরসা কাপড়চোপড় পরে, চাকরি-বাকরি খোঁজো না আবার।'

শঙ্কর গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ। বলে, 'ফরসা জামাকাপড়ের ওপর বড্ডো মন পড়েছে আজকাল, কেমন? হুঁ বুঝেছি। নিজেরও তাই আজকাল সাজগোজের ঘটা দেখছি।...ব্যাপার তো ভালো নয় সুধারানী!'

সুধা বলে, 'সাজগোজ আবার দেখলে কোথায়? ওই পয়সা থেকেই বাঁচিয়ে একখানা শাড়ী কিনেছি, আর তিন আনা দিয়ে একটা মোটা চিরুনি—এতেই সাজ দেখলে?...বেশ, কাল থেকে আবার ছেঁড়া ন্যাকড়া পরেই থাকবো—।'

ভাবলে অভিমান দেখালে বোধ করি অপ্রতিভ হয়ে যাবে শঙ্কর। কিন্তু

কই ? অপ্রস্তুতির চিহ্নও নেই তার মুখে। কি হয়েছে তার কে জানে। শঙ্কর নিজেও বুঝতে পারে না, তার কি হয়েছে। বুঝতে পারে না—যে-সুধাকে কিছু দিতে পারতো না বলে শুধু মমতা দিয়েই ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে হতো, সেই সুধাকেই কেবল যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছে হয় কেন ?

নিজেই বুঝতে পারল না, কী করে তার কণ্ঠে অমন কর্কশ সুর ফুটলো। কী করে বললো 'থাকবেই তো ! আলবাত থাকবে। না তো কি আমি হতভাগা চব্বিশ ঘণ্টা ন্যাকড়া পরে পথে পথে বেড়াবো, আর তুমি রাজকন্যা সেজে ঘরে বসে পাড়ার লোকের সঙ্গে আড্ডা দেবে ?'

'পাড়ার লোকের সঙ্গে আড্ডা দিই ?'

হতবুদ্ধি সুধার মুখে আর কথা জোগায় না।

'দাওই তো, একশো বার দাও। আচ্ছা আমিও দেখে নিচ্ছি—।' বলে গমগম করে বেরিয়ে যায় শঙ্কর, আর হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুধা।......

প্রায়ই আজকাল এই ধরনের পালা চলে।—

এতোকাল পরে কি সুধাকে সন্দেহ !

এমনি বসে আছে একদিন, হঠাৎ নিতাই এসে বলে, 'সুধা কাকীমা, একজন ভদ্দরলোক আপনাকে খুঁজছেন।'

ধড়াস করে ওঠে বুকটা ! কাঁপা গলায় সুধা বলে, 'আমায় খুঁজতে যাবে কেন, যাঃ !'

'হ্যাঁ আপনাকেই তো। বাইরে আসুন একবারটি !'

কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। বাইরে এসে দাঁড়িয়েই চমকে ওঠে সুধা।......জামাইবাবু !

'হ্যাঁ সুধা, আমি ! অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি।...উঃ কম ভুগিয়েছ আমাকে।'

সুধা মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলে, 'হঠাৎ মরামানুষের ঠিকানা যোগাড় করবার কষ্ট স্বীকার করতে ইচ্ছে হলো কেন জামাইবাবু ?'

'তোমাদের ওসব কাব্যি কথাবার্তা আমি বুঝি না ভাই।......মোটকথা তোমার দিদির প্রেরিত দূত হিসেবে এসেছি, দু'টি সংবাদ দিতে।...কান্নাকাটি কোরো না,—একটি সংবাদ হচ্ছে, তোমার বাবা মারা গেছেন'—

'অ্যা ! মারা গেছেন !'

সুধা চালার খুঁটিটা শক্ত করে চেপে ধরে।

'হ্যা মারা গেছেন ! খুব একটা অস্বাভাবিক খবর নয়, বয়েস হয়েছিলো, ভুগছিলেন অনেকদিন থেকে……এই কেঁদো না খবরদার—তা'হলে কিন্তু পালাব।…—শোনো, দ্বিতীয় খবরটা ভালো।……মারা যাবার আগে বোধহয় কিছু সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল ভদ্রলোকের, তাই—তোমাকে নাকি ক্ষমা করে গেছেন এবং মোটা কিছু টাকাও রেখে গেছেন তোমার নামে।…অবশ্য একটা সর্তে—শঙ্করের সঙ্গেই যদি বিয়ে-টিয়ে করে ভদ্রভাবে ঘর করে থাকো এতোদিন এবং—'

'বিয়ে আমাদের হয়নি'—

যেন প্রেতের কণ্ঠ থেকে কথা বেরোয়।

জামাইবাবু ব্যস্তভাবে বলেন, 'আচ্ছা সে না হয় যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নিলেই হবে। আমরা উকিল মানুষ পুকুর চুরি করতে পারি, গোটাকতক বছর চুরি করব—সে এমন কিছু নয়।……কথা হচ্ছে—সে হতভাগা আছে তো টিকে ? ফেলেটেলে পালায়নি তো ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে সুধা।

'তবে আর কি ! সব ঠিকই আছে। মোট কথা তোমার দিদির ইচ্ছে আজই তোমাকে গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে যাই। শুধু তোমার বাবার ভয়েই তো এতোদিন কেউ সাহস করে খোঁজ খবর করতে পারিনি ভাই। যাক সেকথা, তিনিই যখন মাপ করে গেছেন, তখন আর ভয় কিসের ? তোমার মা তো তোমার আশায় হাঁ করে রয়েছেন।… কবে যাচ্ছ বলো ?'

সুধা মাথা নেড়ে বলে, 'আমি যাবো না।'

'যাবে না ? তার মানে ? আর এখন যেতে বাধা কি ?'

'বাধা কি কেবল বাইরেই থাকে জামাইবাবু ?'

'এই হ'লো আবার কাব্যি শুরু। আরে বাবা, না হয় ভেতর থেকেই প্রবল বাধা চাড়া দিয়ে উঠছে তোমার, তা সেটাকে মনের জোরে দমন করে ফেলো।……এই নরক থেকে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী গিয়ে তখন মান-অভিমান সব কোরো।'—

'এ মুখ আমি মাকে দিদিকে দেখাতে পারবো না জামাইবাবু !'

'এই দেখো পেটেন্ট মেয়েলিপনা। এই তো আমাকে মুখ দেখালে, কি হলো? আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো?'

'আমার খোকাকে আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন জামাইবাবু?'

জামাইবাবু বোধকরি ঈষৎ থতমত খেয়ে যান। বলেন, 'খোকা? ওঃ। তা' বেশ তো! দূর থেকে খোঁজ খবর অবশ্য তোমার কখনো কখনো রেখেছি আমি, তবে—এ খবরটা জানতাম না। বিদেশে থাকি, কতোই আর হয়ে ওঠে! ভেবেছিলাম—বুদ্ধি করে আইনসঙ্গত কিছু একটা করে রেখেছো। যাক গে, আমরা ধরে নিয়েছি বিয়েই হয়েছে তোমাদের।......কাজেই ওর জন্যে আটকাবে না। তোমার বাবা একদিন নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তুমি নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে যাচ্ছো।......কি মতি হলো,—সক্কালবেলাই উঠে বললেন— 'উইল' করবো,—আর।......খোঁজো তাকে।—সেই থেকে তোড়জোড় করে খোঁজ চলছে। তবে দুঃখের বিষয় দেখাটা হলো না। বলে গেছেন, তা'কে বলো আশীর্বাদ করে গেলাম—।'

হঠাৎ দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে সুধা। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

জামাইবাবু অবশ্য এ সবের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। বলেন, 'আচ্ছা, তুমি একটু সামলাও। আমি আবার আসছি। কখন এলে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?'

'তার সঙ্গে আর দেখা করতে হবে না জামাইবাবু, সে আর দেখা করার যোগ্য নেই।'

'কেন? নেশা ভাঙ ধরেছে বুঝি হতভাগা?'

বেশ সহজভাবেই উচ্চারণ করেন ভদ্রলোক। জগতের হাটের হাড়হদ্দ জানতে বাকী নেই এঁদের। কোন্ জীবনের কী পরিণাম, বোঝেন।

সুধা কিন্তু মাথা নাড়ে।

জামাইবাবু আরো স্বচ্ছন্দে বলেন, 'তা'হলে? কারে পড়ে—ফেরিওয়ালা-গিরিটিরি ধরেছে বুঝি? না-কি দাঁতের মাজনের ক্যানভাসিং?'

'সে আমি বলতে পারবো না জামাইবাবু।'

জামাইবাবু সহাস্যে বলেন, 'কি মুশকিল! বলতে না পারবার কি আছে? লোকের পকেট মেরে বেড়াচ্ছে শুনলেও আশ্চয্যি হবো না রে দিদি, যে বিশ্বের

যে ফল!……যাই হোক—মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হওয়াটা তো দরকার! আসবো কখন? কখন বাড়ী থাকে সে?'

স্থধা মুখ তুলে কি বলতে গিয়েই 'কাঠ' হয়ে যায়।

শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছে জামাইবাবুর পিছনে।

এসে দাঁড়িয়ে—

আগাছার জঙ্গলের মতো একমুখ দাড়ির মধ্যে থেকে বিটকেল একটা মিটিমিটি হাসি হাসছে।

জামাইবাবু বোধকরি স্থধার মুখ দেখেই পিছন দিকে তাকান। তাকিয়ে থতমত খেয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'এ আবার কে রে বাবা! কি হতচ্ছাড়া জায়গায় থাকিস, ছিঃ ছিঃ!……যাওঃ যাওঃ, তুমি কোনদিকে যাবে হে বাপু, চলে যাও।'

কাঠ হয়েই তাকিয়ে থাকে স্থধা।

প্রকাশ করতে পারে না শঙ্করের পরিচয়!

জামাইবাবুর কাছে কী অদ্ভুত বীভৎস লাগছে ওকে। ভান করতে করতে চোখের চাউনিটাও শঙ্কর অমন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল কি করে?……জামাইবাবু যদি চিনতে না পারেন, অবাক্ হবার কিছু নেই।……আর সত্যি কতোই বা দেখেছেন শঙ্করকে?…শ্বশুরবাড়ীর পাড়ার ছেলে, এই তো!

ঈশ্বর জানেন কি ভাগ্যে শঙ্করও কিছু বলে ফেলে না। বিড়বিড় করে কি বকতে বকতে উঠোন দিয়ে নেমে চলে যায়।

স্থধা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভাবে আজ যেমন করে হোক ওকে অন্ততঃ দাড়ি কামিয়ে সভ্য হ'তে বলবে। যাতে জামাইবাবু কাল এসে ধরতে না পারেন। সত্যি কি নীচেই নেমে গেছে তারা।……এতোদিন যেন এ অধঃপতনটা চোখে পড়েনি। উচ্চস্তরের সংস্পর্শে আসতেই সহসা খেয়াল হলো।

জামাইবাবু বলেন, 'দিব্যি জায়গাটিতে এনে তুলেছে বটে! এইসব রাস্কেলদের যে কী শাস্তি হওয়া উচিত! ক্ষমতা নেই এক ছটাক, প্রেম করবার শখ ষোলো আনা।……থাকগে, তোর আবার হয়তো রাগ হবে ভাই।…কিন্তু বলছিলাম কি, এখনই কেন তুই ছেলে নিয়ে চল না আমার সঙ্গে?……দু' লাইন চিঠি লিখে রেখে যাবি?'

'তাই কখনো হয় জামাইবাবু?'

'হয় না, না? তা' বটে! ওটা একটু অন্যায় প্রস্তাব হচ্ছে, না? কি জানিস ভাই, এই বিশ্রী অবস্থাটা দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারছি না। অবশ্য তোর যা হাল হয়েছে, তা'তে এর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।......এই যে এক্ষুণি গেলো—পাগলের মতো ও লোকটা কে?'

'এই বাড়ীরই ভাড়াটে!'

'উঃ! কী সাংঘাতিক!......যাক্ রাত্তিরে তো একবার ফিরবেই শঙ্কর? বলে রেখো সব কথা। কাল সক্কালেই আমি আসবো।'......

'ও কি রাজী হবে জামাইবাবু?'

'হবে না মানে?......কেউ তো তা'কে দয়া করছে না। তোমার বাপের উইলের টাকা তুমি পাবে, জোরের ওপর থাকবে।—মান খাটো হবার কিছু তো নেই?......তাছাড়া—আই. এ. পর্যন্ত পড়েও ছিলো তো ছোকরা? দেবো অখন কোথাও ঢুকিয়ে। জানাশোনা ফার্ম আছে দু' একটা। মনে রেখো, কাল এসে আর ফেরা নয়। একেবারে চাটিবাটি তুলে—বুঝলে?......সে ছোকরার সঙ্গে দেখা হলো না যে! হলে আজই আমি কাজ সেরে ফেলতাম! আসল কথাটা খুলেই বলি, যার জন্যে আরো এতো তাড়াহুড়ো! এই সামনের বুধবারেই শ্রাদ্ধ, তোমার মার আর দিদির ইচ্ছে এই গোলমালের ছুঁতোয় তোমাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা! আসলে ব্যাপারটা যে দোষের কিছুই নয়, তোমার বাবার জেদের ফলেই যে এতোটা দূর গড়িয়েছে এইটেই প্রতিপন্ন করে ছাড়বেন এই আর কি।......অবিশ্যি ব্যাপারটা তো তাই বটেই। বুড়ো ভদ্রলোককে ঢের জপিয়েছি আমরা খোঁজ-তল্লাস করে একটা মিটমাট করে নিতে। ও বাবা, তখন একেবারে মিলিটারী! স্বপ্নটা দেখলেন, দেখলেন একেবারে মরণকালে।......যাক, যতোদিন গ্রহদোষ থাকে ভুগতেই হয়।...... তা'হলে চললাম? ওই কথা থাকল।'

চলে গেলেন ভদ্রলোক।

বসবার কথা ওঠেই না। এখানে ওঁকে বসতে বলবার কথা কল্পনাও করা যায় না।...

কিন্তু উনি যা বলে গেলেন, তাই কি কল্পনার আয়ত্তে নেওয়া যায়?...সত্যিই এসেছিলেন উনি, না ও একটা স্বপ্ন? স্বপ্ন কি এতো যথাযথ হয়? স্বপ্নের মানুষ এমন নিখুঁত নিটোল পরিষ্কার কথা কয়?......কিন্তু পরিষ্কার আর থাকছে

কই ? সব যে কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে ! সুধা আবার বাড়ী ফিরতে পাবে ?…… মার সঙ্গে দিদির সঙ্গে দেখা হবে ? লোকে সহজভাবে কথা কইবে তার সঙ্গে ? কি কথা ওসব ? স্বপ্নের মানুষ ছাড়া এমন অদ্ভুত কথা কেউ বলে যায় ?

নাকি দীর্ঘ সময় ধরে একটানা একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল সুধা, যাকে সাত সাতটি বছর বলে ভুল করছে ? শেষ হয়ে গেছে রাত, মিলিয়ে যাচ্ছে দুঃস্বপ্ন !… সকালের আলোয় জেগে উঠবে সত্যিকার সুধা ?

কি আশ্চর্য ! জামাইবাবুকে তো কোনো প্রশ্নই করল না সুধা ?…'মা কেমন আছেন'—এটুকু পর্যন্ত নয়।……বাবা, বাবা, কতো স্নেহ তোমার মনের মধ্যে ছিলো, তাই তুমি শেষ সময় হতভাগী সুধাকেই স্বপ্ন দেখলে ?…ঠিকই দেখেছো অথই জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছে সুধা। উঃ কী খাঁটি স্বপ্ন !

কিন্তু সুধা কি সত্যিই যেতে পারবে ? মুখ দেখাতে পারবে সকলের কাছে ?…সেই গেটটার সামনে গাড়ী থেকে নামবে ? ঢুকে যাবে বাড়ীর মধ্যে গাড়ীবারান্দার তলা দিয়ে ? ঘুরে বেড়াবে সেই ঘরে, সেই দালানে ? সেই সিঁড়িটা দিয়ে তরতর করে উঠে যাবে একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে তেতলায় ?

কে জানে শঙ্করের মা এখনো বেঁচে আছেন কি না ? ওপাশের সেই বাড়ীতেই আছেন নাকি ?

চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে সুধা, ক্রমশই নানা কথা মনে এসে যাচ্ছে।… মনে পড়ছে না কোথায় বসে আছে সে ! মনে পড়েছে না—নিতান্ত অসময়ে এসে পড়েছে শঙ্কর। এখুনি কেন ফিরে এলো সেটা খোঁজ নেওয়া দরকার ! ও ভাবতে থাকে এতো বড়ো গ্রহবৈগুণ্যও তাহ'লে কাটে ?

বর্ষার পরে দেখা দেয় শরৎ ? রাত্রির পর সকাল ? মৃত্যুর পর জীবন ?

'সুধা কাকীমা, শিগ্‌গির দেখো এসে, কী কাণ্ড করছে শঙ্কর কাকা।'

নিতাইয়ের তীব্র চীৎকারে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় সুধা, মনে পড়ে শঙ্কর এসেছিল। কিন্তু কাণ্ড আবার কি করলো সে ?

পড়ি তো মরি করে ছুটে যায় ঘরের দিকে।

কাণ্ডই বটে, নিতাই ছেলেটা না দেখলে যে কী হতো শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর

জানেন ।···এক ঝট্‌কায় শঙ্করের গলায় মোচড় দিয়ে দিয়ে পাকখাওয়ানো উড়ুনীর ন্যাকড়াখানা খুলে নিয়ে সুধা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'কি, হচ্ছে কি ?'

হাঁফাচ্ছে শঙ্করও। শীর্ণ বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে, চোখ দুটো যেন ডেলা পাকিয়ে গেছে।

সুধা প্রায় ওর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, 'হচ্ছিল কি ?'

ক্রমশ ধাতস্থ হয়ে উঠছে শঙ্কর, বলে, 'মনের খেদে গলায় দড়ি দিচ্ছিলাম সুধারানী।'

'কেন ? কেন এতোদিন পরে আজ তুমি এই সর্বনাশ করতে বসছ ?'

'আরো আগেই দেওয়া উচিত ছিল, তাই না ? এতোদিন অপেক্ষা করাটা ঠিক হয়নি, কেমন ? নতুন ভাবের লোককে আর লুকিয়ে রাখতে পাচ্ছো না, বাড়ীতেই ডাকতে শুরু করেছ'—

'কি বলছ পাগলের মতন ? ডাকলাম আবার কা'কে ? কে এসেছিল জানো ?'

'জানি বৈ কি', প্রবল হাসি হেসে ওঠে শঙ্কর, 'এসেছিল তোমার 'ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবি' ! যার সঙ্গে পালিয়ে যাবার ঠিকঠাক চলছিল, আমি এসে পড়তেই বেঠিক হয়ে গেল।'

ক্রুদ্ধ সুধা বলে, 'আমাকে তাই ভাবো বুঝি তুমি ?'

শঙ্কর অম্লান বদনে বলে, 'যা সত্যি তাই ভাবি সুধারানী, খারাপ মেয়েরা ওই রকমই করে থাকে।—এক জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না।'

সমস্ত রক্ত মাথায় চড়তে থাকে সুধার, রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'আমি খারাপ মেয়ে ?'

'আবার কি ? যে মেয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে 'বিয়ে না করা বরে'র সঙ্গে ঘর করতে পারে, তা'কে কি বলবে লোকে ? সীতা ? সাবিত্রী ?···ও আবার কি, মূর্ছা যাচ্ছো নাকি ?···এই সেরেছে ! কি মুশকিল, ঠাট্টা বোঝো না ? একটু কড়ারকমের তামাসা করছিলাম !···এই সুধা, সুধা ! শোন আমি ঠাট্টা করছিলাম।···উঃ ভারী ভীতু তো তুমি ?'

হঠাৎ ভারী শান্ত আর স্তিমিত দেখায় শঙ্করকে।—

একখানা ভাঙা পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকে সুধাকে ম্লান মুখে বসে বসে।—

অনেক রাত্রে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে সুধা!

শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ চলে...পরদিন কিভাবে জামাইবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হবে...বেশ আত্মসম্মান বজায় রেখে কথা বলতে হবে, অবশ্য। নেহাত যেন হ্যাংলা না ভাবেন তাদের।...

সত্যি মান খুইয়ে কোনোদিন তো ওঁদের কাছে সাহায্য চাইতে যায়নি তারা?...তারপর আরো নানা কথা! সুধার মন যেন ময়ূরের মতো পেখম মেলে উঠেছে।

'সক্কাল বেলা উঠেই কিন্তু তুমি প্রথম কি করবে মনে আছে তো?'

শঙ্কর মৃদু হেসে বলে, 'আছে।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়!...জামাইবাবুর সামনে তখন এমন লজ্জা করল আমার। সক্কাল বেলা উঠে দাড়ি কামাবে, ওরই মধ্যে একটা একটু ফরসা আর কম ছেঁড়া জামা কাপড় রাখলাম দড়িতে, সেইটা পরে নেবে বুঝলে?...আর খোকনের জন্যে একটা জামা কিনে আনবে। মনে থাকবে?'

'থাকবে গো থাকবে?...ফরসা কাপড়টা পরাই চাই কি বলো? নইলে তোমার মনে ধরবে না কেমন?'

'হ্যাঁ! আর দাড়ি কামানো!...আঃ, কবে যে তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাবু সেজে অফিস যাবে, আর আমি তোমার ফেরার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব!...ভেবে যেন আর ধৈর্য ধরছে না...কখন যে রাত কাটবে, কখন সকাল হবে হ্যাঁ গো!'

রাত্রি কাটে! রাত্রির পরে আসে সকাল! মৃত্যুর পর জীবন!

কিন্তু তারও পর?

বুক ভর্তি আনন্দ নিয়ে ঘুম ভাঙে সুধার।

উঠে দেখলে শঙ্কর কাছে নেই, কখন উঠে গেছে।

ওঃ কথা রাখা হয়েছে তাহ'লে? ভোরবেলাই উঠেছেন বাবু? সত্যি ইদানীং কি রকম যে হয়ে যাচ্ছিল মানুষটা! যেন সুধার নাগালের বাইরে কোথায় চলে যাচ্ছিল!...অনেক দিন পরে কাল রাত্রে আবার যেন কাছে পাওয়া গেল।...হঠাৎ সুধাকে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ধাতস্থ হয়ে গেল আর কি!...তা অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মন্দ হয়নি। একরকম শাপে বর।...

যাক বাবা, আজ আর ওকে সকালবেলাই উঠে পাগলের সাজ সাজতে বসতে হবে না? আজ সুধা ওর আস্ত মুখটা দেখতে পাবে। দারিদ্র্যের জ্বালায় কী হতচ্ছাড়া ব্যবসাই বেছে নিতে হয়েছিল বেচারাকে। জগতে ভিক্ষে করবার এতো রকম উপায় থাকতে এমন অদ্ভুত উপায়টাই বা মাথায় এল কি করে এই আশ্চয্যি! মনকে চোখ ঠেরে যতোই চমকপ্রদ নাম আবিষ্কার করুক শঙ্কর, 'ভিক্ষে' ছাড়া আর কি?

সত্যি করবেই বা কি!

জগতের সমস্ত কাজ-কর্মের দরজা যেন শঙ্করের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুস্থ চেহারা নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ালে, পথে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যেত না?

যাক, এতদিনে বেচারার সব জ্বালার অবসান হতে চলেছে। জগতের দরজা খুলে গেছে ওর সামনে।

তা' খুব ভুলও ভাবেনি সুধা।

এক হিসেবে সকল জ্বালার অবসান বৈকি!

জেগে উঠে চৌকি থেকে নামতে গিয়েই শিউরে পা তুলে নিতে হলো সুধাকে!

চৌকির তলা থেকে গুঁড়ি মেরে শঙ্কর আসছে বেরিয়ে।

ভোরবেলা উঠে চৌকির তলায় ওর কি কাজ পড়লো?

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখে সুধা আর্তনাদ করে ওঠে না, আছড়ে পড়ে না! হয়তো সেগুলো করবার মতো ক্ষমতাও খুঁজে পায় না বলেই পারে না। ...চেয়েই থাকে।

আর সুধার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই শঙ্কর ফিক করে হেসে নিয়ে বলে, 'কোন্ কাপড়টা পরি গো? ফরসা কাপড় খুঁজে পাচ্ছি না যে!...লজ্জায় চৌকির তলায় লুকিয়ে বসে আছি!'

এ হাসি চিনতে ভুল হয় না।

ভান করবার দায় ফুরিয়েছে শঙ্করের...আর এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেছে ওর সামনে। সেখানে কাজের আকাল হবে না!

নীলকণ্ঠ

কমলাকে দেখে চট্ করে বোঝা যায় না, ও বিধবা কি কুমারী !

অবিশ্যি বেশভূষা দিয়ে মেয়েদের অবস্থার পরিচয় দেওয়ার সেকেলে প্রথাটা এখন আর নেই। এখন সধবা, কুমারী—উভয় দলই পছন্দ করে নিয়েছে বৈধব্যের বাহুল্যহীন পরিচ্ছন্নতা।

অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পদমর্যাদার বিজ্ঞাপন দেবার চেষ্টাটা এ যুগে কম। অন্ততঃ সভ্যসমাজে নেই। এমন কি, পতিগরবিনীর হাতী-পাড় শাড়ী ক্রমশ ক্ষীণতর হ'তে হ'তে…ইঞ্চি পাড়…নরুণ পাড়…চুল পাড়… অবশেষে নির্মূল পাড়ের রূপ নিয়েছে।

দোকানে গিয়ে অনায়াসেই বলা যায়—"খানকতক থান-শাড়ী বার করুন তো—"

শুনে দোকানি চমকে উঠবে না।

বিশ-বাইশ গাছা চুড়ির পরিপূরক হয়তো—কেবলমাত্র একটি ঘড়ি। কিছুদিন আগেও কর্ণভূষণটা ভূষণ হিসেবে গণ্য হতো—সভ্যসমাজেও হতো, সম্প্রতি তার জাত গিয়েছে।

লোহা-সিঁদুরের কথাটা হাস্যকর। ও বস্তু দু'টো শুধু ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি মেয়েরা, জোর আন্দোলন চালাচ্ছে—ওই বর্বর প্রথার চিহ্ন দু'টোর বিরুদ্ধে। কেন মেয়েরা অকারণ এই দুঃসহ লৌহভার বহন করবে? আর কেনই বা অনর্থক খানিকটা রং লাগাবে মাথায়?…গালে মুখে চোখে নখে যে রং মাখা হয়, তার তো তবু মানে আছে।

তবু এতো করেও সম্পূর্ণ ধোকা দেওয়া যায় কি?

পরিচ্ছদটাই তো সব নয়!

কুমারী তরুণীর নয়নকোণে অজানিত সম্ভাবনার যে বিদ্যুদ্দীপ্তি কারণে অকারণে ঝলসে ওঠে, বিবাহিতা নারীর আঁখি-প্রান্তের সৌভাগ্যগর্বিত স্থির শিখার সঙ্গে তার প্রভেদ ঢের।

আর বিধবা যুবতীর ?

তার দৃষ্টির শ্রেণী-নিরূপণ করা শক্ত। সে দৃষ্টিতে বহু কৃত্রিম বর্ণচ্ছায়া। সে দৃষ্টি কখনো সমবেদনার আশায় ছলছলিয়ে ওঠে, কখনো আবার সহানুভূতির আশঙ্কায় কঠিন হয়ে থাকে। সে দৃষ্টি আপন ভাগ্য-দেবতাকে কখনো অভিযোগ জানায়, কখনো ধিক্কার দেয়, কখনো বা ব্যঙ্গ করে, কখনো আবার দুঃসহ স্পর্ধায় অগ্রাহ্য করতে চায়।......

বিমলার মুখে চোখে সেই বহুবর্ণের আভাস !

তাই ও যখন টান্ টান্ করে চুল জড়িয়ে, সরুপাড় শাড়ীখানা পরে, সরু একগাছা চুড়ি-পরা হাত নেড়ে কঠিন মুখে একটানা সংসারের কাজ করে যায়, তখন ওকে দেখলে বিধবা ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। যেন অনেক পথ পার হয়ে, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে। মুখের রেখায় রেখায় সেই পথশ্রমের ক্লান্তি, সেই অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্য।

কিন্তু সব সময় কি ওই এক ভাব বিমলার ? বদল হয় না ?

দোতলার ভাড়াটেদের ছেলে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে ?...বাড়ীওয়ালার ভাইটা যখন বাড়ীর ভাড়া আদায় করতে আসে ?...মাঝে মাঝে আসে দূর সম্পর্কের কোনো সমবয়েসী আত্মীয় ?......কাকীমার বোনপো, কি ভাইপোরা ?

হ্যাঁ, ওরকম কেউ এলেই চোখ-মুখের চেহারাটা হঠাৎ বদলে যায় বিমলার। চুলের ভঙ্গী শিথিল হয়ে আসে, শাড়ী পরার ধরনটা মার্জিত চেহারা নেয়, চোখের কোণে জ্বলে ওঠে সেই অজ্ঞাত সম্ভাবনার বিদ্যুৎ-শিখা।

যে-ঘরে অতিথিরা আসন গ্রহণ করে, বার বার সেই ঘরের সামনে দিয়ে আনাগোনা করতে থাকে বিমলা দ্রুত ব্যস্ত ভঙ্গীতে।...হয়তো বা হঠাৎ কি যেন দরকার পড়ে যায় ওই ঘরেই।...কেন কে জানে—চায়ের কি চিনির কৌটো ভাঁড়ার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায়।...হয়তো বা ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই কাকার জামার পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে বার করতে হয়।

কাকীমা সুবর্ণলতা দাঁতে দাঁত পিষে অস্ফুট মন্তব্য করে, নয়তো বা নিজের ভাইপো-বোনপো-জাতীয় কেউ হলে, তার কাছে তিক্ত স্বরে হিসেব দাখিল করে—"দেখছিস তো ? ওই দেখ ? 'মা রক্ষেকালী' বলি কি সাধে ? ভেবে

দেখ, ওইটি আমাদের গলায়! বিয়ে আর হয়েছে ওর! চিরকাল আমাদের হাড়মাংস পুড়িয়ে খাবে, এই আর কি।"

নিরপেক্ষ কেউ থাকলে দৈবাৎ হয়তো বলে—'কিন্তু খাটতে পারে খুব বোধ হয়? সব কাজকর্মই তো—'

কথা অবিশ্যি শেষ করতে পায় না সে—সুবর্ণলতার সতেজ প্রতিবাদে।

পরবর্তী বাকি সময়টুকু মুখর হয়ে ওঠে বিমলার প্রসঙ্গে। বিমলা যে কতো শয়তান, কতো বজ্জাত, কতো সাংঘাতিক, তার উদাহরণ দিতে দিতে সময়ের জ্ঞান থাকে না সুবর্ণলতার।

বিমলার কানে যে তার ছিটেফোঁটা না যায় তা নয়, খুব বেশী গলা খাটো করে না সুবর্ণলতা। কেনই বা করবে? বিমলার ভয়ে? কেন, বিমলা তাকে ফাঁসি দেবে?…ফাঁসি দেবার ক্ষমতা না থাক, তবে এসব অপমানের শোধ নিতেও ছাড়ে না বিমলা! শোধ নেয়—অহিংস প্রতিশোধ! হয়তা—হঠাৎ অফিসের বেলায় অসমাপ্ত রান্না ফেলে, কুটনোবাটনা ছড়িয়ে রেখে 'ভীষণ পেট ব্যথায়' অস্থির হয়ে একেবারে বিছানা নিতে হয় বিমলাকে।…হয়তো—সন্ধ্যার মুখে উনুনে আগুন ধরিয়ে দিয়েই নিজের মাথাতেও আগুন ধরার প্রমাণ দেখাতে ঘটি ঘটি জল মাথায় থাবড়ে মাদুর হাতে করে চলে যেতে হয় ওদিকের রোয়াকে বিশ্রামের প্রয়োজনে।…কাকীর ছেলেমেয়ে ছু'টো কাছেপিঠে থাকলে ত'াদের মেরে হাড় গুঁড়ো করবার ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হয়, এতো যন্ত্রণা!… হয়তো বা বাসন-মাজা ঠিকে ঝিটা কামাই করেছে দেখলেই কম্প দিয়ে জ্বর আসে বিমলার। বোশেখ-জষ্ঠির দিনে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাঁচ দিন সাত দিন ধরে চলে—এই অহিংস সংগ্রাম।…

আবার হয়তো কোনোদিন কেউ আসে, হয়তো—দোতলার ভাড়াটেদের নীরেন উপর-নিচ করবার সময় বিমলাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করে—হেমন্তবাবুর জ্বর হয়েছিলো—আছেন কেমন?—কি হেমন্তবাবু অফিস থেকে ফিরেছেন কিনা।…

চট করে বদলে যায় বিমলা, দ্রুত ভঙ্গীতে আনাগোনা করে রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘরে, তৎপর হয়ে ওঠে সংসারের কাজে। কাকীকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় শোবার ঘরে।…

সবটাই খামখেয়াল।…

মধ্যবিত্ত পরিবার।

সুবর্ণলতার শরীর খারাপ। কাজেই বিমলার পড়াশোনার কথা ওঠেই না। কবে নাকি সে কোন্ তামাদি যুগে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়েছিলো, 'মেয়েদেখাবার সময় সেই ঘটনাটার উল্লেখ করেন হেমন্তবাবু, বলেন—'বাড়ীর অসুখ-বিসুখে স্কুলটা ছাড়িয়ে নিতে হয়েছে, কিন্তু ভারী পড়ার ঝোঁক মেয়ের। এ বছর ম্যাট্রিক দেবে বলে প্রাইভেট পড়ছে।' বলতে গিয়ে কেন যে হাসি পায় না হেমন্তবাবুর! তবু এই সুযোগে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়, কেনো এক সময় বিমলা বইখাতা হাতে করে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতো।…ছুটোছুটি করতো স্কুলের মাঠে, গাছে বাঁধা দোলনায় চড়তো,…দড়িলাফ খেলতো…আর বাড়ীতে এসে পরম আনন্দে এক গোছা রুটি শুধু গুড় দিয়ে দিয়ে খেয়ে যেতো পাড়া বেড়াতে। অনিলাদের রোয়াকে ছিলো ঘুটিঙ্ খেলার আড্ডা, বাসন্তীদের বাড়ীর ছাতে 'কানামাছি' 'কুমীর কুমীর' খেলার।

অনিলাদের আড্ডায় যোগ দিলে—খুব বেশীক্ষণ খেলা হতো না। সন্ধ্যে না হতেই—অনিলা খেলা ছেড়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যেতো মাস্টারের কাছে পড়তে, আর বাইরে থেকে জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে বিমলা সেই পড়ার দৃশ্য দেখতো। জোর আলো জ্বলছে ঘরে, টেবিলের সামনে চেয়ার পেতে বসেছে অনিলা মুখ নিচু করে। কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখায় তার মুখ। মনে হয়, অন্য জগতের জীব। তবে যেদিন পড়ার ভুল হতো, বাঘা-মাস্টারমশাই হুঙ্কার দিয়ে ধমক দিতেন, চোখ ছলছল করে আসতো অনিলার, বিমলার সেদিন ভারী মজা লাগতো।

বাসন্তীদের বাড়ীর ছাতে গিয়ে জুটলে সন্ধ্যে হ'তেই টেনে নামাতেন বাসন্তীর মা নিজের মেয়েকে, পাড়ার মেয়েদের। সবাই হুড়মুড় করে নেমেই ছুট দিতো বাড়ীর দিকে। শুধু বিমলাই ওদের বাড়ী থেকে নড়তে চাইতো না। অথচ কথা নেই মুখে।

বাসন্তীর মা একরকম ঠেলেই তাড়াতেন। বলতেন—'যাও, খুকি, বাড়ী যাও। তোমার কাকা আবার খুঁজতে আসবেন! বকুনি খাবে বাড়ীতে।'

সেরকম ঘটনাও যে ঘটেনি তা নয়। 'বকুনি'টা ভদ্রভাবে বলা।

রাত্তির হয়ে গিয়েছে দেখে, কাকা পাড়া তল্লাস করে ভাইঝিকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন, গিয়ে পিঠের ছাল তুলেছেন তার। একধার থেকে মেরেছেন

আর মৃত ভ্রাতা আর ভ্রাতৃবধূকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেছেন—কী শত্রুতা ছিলো তাঁদের হেমন্তর সঙ্গে ?…

তা এসব এখন তামাদি কথা। এখন পাত্রপক্ষের কাছে কমিয়ে কমিয়েও বয়েসটাকে আর বাইশের নিচে নামানো যায় না বিমলার।

গলার কাঁটা উদ্ধার করতে বিয়ের চেষ্টা করেন বৈকি হেমন্তবাবু, প্রায়ই করেন, কিন্তু বিমলাহীন সংসারে স্বর্ণলতার চেহারাটা কল্পনা করে চেষ্টাটা কেমন স্তিমিত হয়ে আসে।

আর সত্যি, উৎসাহের তোড়জোড় হবেই বা কোথা থেকে ? যারা মেয়ে দেখে যায়, তারা খুব জোর বাড়ী গিয়ে খবর দেবার আশ্বাস দিয়ে যায় বা 'কোষ্ঠীটা' পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে যায়, এর বেশী তো নয় ?

কি করবেন হেমন্তবাবু ? হাত দিয়ে তো ঠেলে, এগোবার নয় ?

অনিলার বিয়ে হয়ে গেছে কোন্ যুগে, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে তার, বড়োটি তো স্কুলে যাচ্চে। বাসন্তীও এই দ্বিতীয়বার ছেলেপেলে হতে এসেছে মায়ের কাছে।

ওদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব করে বিমলার, ভালবেসে নয়—কৌতূহলের বশে।…ছেলেবেলায় যেমন জানলার বাইরে থেকে গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দেখতো, তেমনি দেখা—সত্যিকার অন্য জগতের জীব হয়ে গেছে যে সহপাঠিনীরা, তাদের জীবনের দিকে।

কিন্তু ইচ্ছে হলে কি হবে ? স্বর্ণলতার ধিক্কারে যাওয়া হয় না। যেতে চাইলেই, গলায় দড়ি দেবার পরামর্শ দেন তিনি বিমলাকে।

তা' খুব অসঙ্গত কথাও তিনি বলেন না। দোতলার ভাড়াটেদের যে মেয়েটাকে ছেলেবেলায় কোলেপিঠে করেছে বিমলা, সেই ফুলিরও এই সেদিন বিয়ে হয়ে গেল ! ঘটা করেই হতো, কিন্তু বিয়েতে আজকাল ঘটা হয় না, তাই।

অবিশ্যি ঘটা না হোক, ল্যাঠাটা তো ঠিকই আছে ? বিনি খরচের আচার-অনুষ্ঠানগুলো এখনো একরকম বজায় আছে।…তা' সেই সব অনুষ্ঠানে বিমলা কি বলে হাসিমুখে যোগ দেয় ? সাধে কি আর বিমলাকে গলায় দড়ি দেবার পরামর্শ দেয় স্বর্ণলতা ?

কিন্তু বিয়েতে ঘটা না হোক, জামাই-নেমন্তন্নের ঘটা আটকায় কে ? এখনো

তো ও রীতিটার ওপর আইন-জারি হয়নি? পর পর বার বার জামাইকে নেমন্তন্ন করে পারুলবালা যেন দেখিয়ে দেয়—কতো বড়ো রন্ধন-শিল্পী সে।

মধ্যবিত্ত সংসারে ভালো রান্নাবান্নার ব্যাপার আজকাল উঠেই গেছে একরকম। ফুলির মার জামাই-নেমন্তন্নর দিন হলেই পূর্বপরিচিত সব মসলার সুগন্ধ বাতাসে ভেসে এসে উতলা করে দিয়ে যায় হেমন্তবাবুকে। সেদিন তিনি অজস্র খুঁত খুঁজে পান বিমলার রান্নায়। ছি-ছিকার করেন বিমলাকে। এতো বড়ো বুড়ো ধিঙ্গী মেয়ে, ফুলির মার কাছে গিয়ে দু'-চারটে ভালোমন্দ রান্না এতোকালেও শিখে নিতে পারলো না, দেখে, যেন অবাক্ হয়ে যান।

বেশী কথা কয় না বিমলা।

শুধু বলে—শান্ত ভাবেই বলে—'কাল না হয় সেরটাক মাংস আর কিছু ঘি-মসলা, আদা-পেঁয়াজ কিনে রেখে যেও কাকা, দেখি যদি ওপরের বৌদিকে ডেকে—'

হেমন্তবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন—'আর কিছু নয়? একেবারে মাংস! সেই যে বলে না—কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ,—এ তাই। আমি দশ টাকা খরচ করে মাংস এনে দিই, আর তুমি আমার জন্যে পিণ্ডি সেদ্ধ করে রাখো। বলি ভাত সেদ্ধ করতে শিখেছিস? এ কি, হয়েছে কি? এ ভাতের পিণ্ডি তুলে রাখ বিমলি, আমি মরে গেলে ছেরাদ্দর কাজে লাগবে।'

বিমলা এতো বড়ো কটূক্তিতেও দমে না কিন্তু, নিতান্ত সহজভাবেই বলে —'এবারে রেশনে ওই রকম চালই যে দিয়েছে কাকা, হয়তো পিণ্ডি দেবার সময় মিহি দাদখানি ছাড়া জুটবেনা। যেমন সব উল্টো পাল্টা ব্যবস্থা।'

আর কথা বাড়াবার সময় নেই, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে হবে বিমলাকে। অন্যদিন হলে—হয়তো আরো কিছু কথার আমদানী হতো, কিন্তু আজ আর দাঁড়ায় না, আজ তাড়া আছে। বরের ঘরে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কেমন দেখতে লাগে ফুলিকে, তা দেখবার জন্যে বিকেল থেকে উচাটন হয়ে আছে সে।

ওদিকে ফুলির মা পারুলবালা মেয়েকে তাড়া লাগায়—'যা যা চট করে শুয়ে পড়গে দিকিন, এখুনি বিমলি এসে হাজির হবে। আর সেই সাত-

সতেরো কথা কইবে, শুনলে গায়ে বিষ ছড়ায়। কোন্ লজ্জায় যে আসে! ওইঃ! ওই—হলো তো?…আসছেন নাচতে নাচতে…'

মেয়েকে একরকম ঠেলেই ঘরে ঢুকিয়ে দেয় পারুল, প্রায় বিমলার সামনেই।

বিমলা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বসে পড়ে, বলে—'ওমা! শুয়ে পড়লো বুঝি? মেয়েকে কেমন সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে, একবার দেখতাম!'

পারুল নীরস স্বরে বলে—'এখনকার মেয়েদের আবার সাজিয়ে দেওয়া!'

কুৎকুতে চোখ দুটো হাসিতে কুঁচকে বিমলা বলে—'নিজেই সাজলো বুঝি?'

—'নতুন করে আবার সাজবার কি আছে?'—পারুল যেন উত্তরটা ছুঁড়ে মারেঃ 'সেজেই তো থাকে চব্বিশ ঘণ্টা! ঢাকাই শান্তিপুরী ছাড়া আর কিছু পরে? না—এসেন্স, সাবান, স্নো-পাউডারের কমতি আছে কোনদিন? ফুলিতো তাই বলে—'বিমলা পিসি যে কি কিম্ভূতকিমাকার হয়ে থাকে!' সত্যিই এখনকার মেয়েরা তো থাকে না এরকম!'

এখনকার মেয়েরা হয়তো থাকে না। কিন্তু বিমলা কি এখনকার?

কে জানে, কখনকার সে! নিজেরই কি কোনো বোধ আছে তার? আর থাকলেই বা কি? ঢাকাই শান্তিপুরী জোগাচ্ছে কে?

আজে বাজে এটা সেটা গল্প করতেই থাকে বিমলা, উঠতেই চায় না। পারুল এক সময় হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'যাই বাবা শুয়ে পড়িগে। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে—সারাদিন যা খাটুনি!'

—'তা সত্যি!'—বিমলা উৎসাহিত হয়ে ওঠেঃ 'জামাই এলে যা রান্নার ঘটা তোমার! কি কি রাঁধলে বৌদি?'

—'কাল শুনো ঠাকুরঝি।—' বলে চলে যাবার ভান করে ফুলির মা, কিন্তু যায় না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলেই ছোট দেওর নীরেনের ঘরের সামনে দিয়ে দেতে হবে বিমলাকে।

নীরেনের ঘরের দরজা এখনো খোলা, আলো জ্বলছে।

নীরেনকে বিমলার কাছ থেকে আগলে বেড়ানোটাও পারুলের একটা কাজ।

দেওরকে তো আগলে বেড়ায় পারুল, কিন্তু জামাইকে সামলাতে পারলো কই? অন্ততঃ সেই অভিযোগই তো করে বিমলা।

ভোরবেলা বাড়ীর কারুর যখন ঘুম ভাঙেনি, বিমলা একা একা উঠে গিয়েছিলো তিনতলার ছাতে একটু হাওয়া খাওয়ার আশায়, ঠিক সেই সময়ই নাকি তাক বুঝে জামাইবাবুরও হাওয়া খাওয়ার শখ হয়েছে!

বোঝো এখন!

বিমলা জিভ কেটে চুপি চুপি বলে—'লজ্জায় মরে গেলাম বৌদি, ভোরের গরমের জ্বালায় একটু এলোমেলো হয়েই গেছি, হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে দেখি—ফুলির বর! উঠি তো পড়ি করে নেবে এসেছি! কী ঘেন্না মাগো!'

পারুল গম্ভীরভাবে বলে—'ওসব কি রকম কথাবার্তা তোমার বিমলা? ওদের তো এখনো দরজাই খোলেনি?'

—'আবার খিল দিয়েছে!'—বিমলা মুচকি হাসে: 'আমায় ছুটে পালাতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে তো!'

আরো গম্ভীর হয়ে পারুল বলে,—'তা ছাতে যদি গিয়েই থাকে, তা জেনে তো যায়নি, তুমি আছো? আর তাও যদি যায়—এতো লজ্জা ঘেন্নারই বা কি আছে বিমলা? সময়ে বিয়ে হলে ফুলির মতো একটা মেয়ে তো তোমার নিজেরই হতে পারতো? শঙ্করের মতো জামাইও হতো!'

এটা অবশ্য একটু অত্যুক্তিই করে ফুলির মা। ফুলির চেয়ে বিমলা আট ন' বছরের বেশী বড়ো নয়। কিন্তু বিমলার মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে এর চেয়ে তীব্র ও তীক্ষ্ণ কটূক্তি আর কি হতে পারতো!

বিমলা অন্ধকার মুখে উত্তর দেয়—'কি হলে কি হতো, সে হিসেব তো হচ্ছেনা বৌদি। শঙ্করের চালচলনগুলো তেমন ভালো নয়, তাই বলছি।'

রাগে দিশেহারা হয়ে যায় পারুল, কিন্তু চেঁচাতে তো পারে না, সামনের ঘরে জামাই। তাই চাপা গলায় বলে—'শঙ্কর এলে—শুধু শঙ্কর এলেই বা কেন, এমনিও—দোতলা-তেতলায় তুমি আর উঠোনা বিমলা। অতো রূপের ডালি নিয়ে পাঁচজনের সামনে না বেরোনোই ভালো।...মুনিরই মন টলে যায়, তা সামান্য মানুষ!'

আর কি করবে ফুলির মা? চাবুক মারার চেয়ে বেশীই তো করেছে! না করবেই বা কেন?

বিমলার আস্পর্ধা যে আকাশ ছাড়িয়ে উঠেছে।

বিমলা নেমে গেলে রাগে ফুলে ডবল হয়ে, বিমলার এই অসম-সাহসিক ধৃষ্টতার কথা ব্যাখ্যান করে পারুল—বরের কাছে, দেওরের কাছে। বলে —ওর নিজের ননদ যদি হতো বিমলা, তো—জ্যান্ত পুঁততো তাকে। দেওরের কাছেই বেশী বলে। বড়ো গম্ভীর মানুষ ধীরেন, কথা কয়ে মোটে সুখ নেই।

কিন্তু অদ্ভুত একটা সর্বনেশে কথা নীরেন বলে। বলে—হ্যাঁ, ভোরের দিকে শঙ্করকে নাকি তিনতলার ছাতে উঠতে দেখেছে সে।

পারুল ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—'তার মানে ঠাকুরপো?'

—'মানে খুবই প্রাঞ্জল। ভদ্রসন্তানের হয়তো—ফ্যানের তলায় ঘুমোনো অভ্যাস, আমাদের পিঁজরেপোলে ঢুকে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছিল!'

—'তা হলে—ওই রাক্ষুসীই জেনে শুনে পরে গিয়েছিল!'

একেবারে নিশ্চিন্ত রায় দেয় পারুল।

—'তা হতে পারে'—নীরেন হাসেঃ "তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে 'রাক্ষুসী' তোমার বেয়াইয়ের ছেলেটিকে খেয়ে ফেলেনি।'

রাগে গমগম করে চলে যায় পারুল।

দেওরের ওপরও চটে গিয়েছে সে।

ঠাট্টা করে বটে নীরেন, কিন্তু অবাক্‌ও একটু হয় সে।

অনেকদিন ধরেই দুটি পরিবার একই বাড়ীতে বাস করছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে বিমলাকে, একটা হাস্যকর বস্তু ভিন্ন আর কোনো ধারণাই তো ছিলো না তার ওপর। হঠাৎ সে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো কোন্ ফাঁকে? স্বেচ্ছায় নিজেকে কেন্দ্র করে একটা বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি করবার অর্থ কি?

আচ্ছা, বিমলার ওপর নীরেনের এটা অবিচার নয়?

বিমলা আবার ভয়ঙ্কর হলো কোথায়? পৃথিবীটাই যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বিমলার কাছে।

বিমলার দোতলায় ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে বটে, ছাব্বিশ বছরের মেয়েকে ঠ্যাঙ্ খোঁড়া করবার ভয় দেখিয়ে রেখেছেন হেমন্তবাবু, কিন্তু নিচের তলাতেই কি বিপদের অভাব?

বাড়ীওলার ভাইটা যে সেদিন ভাড়ার রসিদ দিতে এসে আর একটু হলেই বিমলার হাতখানা ধরে ফেলেছিলো, তার কি ?…সামনের বাড়ীর নতুন ভাড়াটেদের ছেলেটা যে ঠিক বিমলার রান্নাঘরের জানলার সামনে দিয়েই সিনেমার গান গাইতে গাইতে যায়, কি বিহিত হচ্ছে তার ?

হেমন্তবাবুর অফিসের যে ছোকরা এ পাড়ায় থাকে, কালে-কস্মিনে হয়তো যাবার সময় হেমন্তবাবুর খোঁজ নিয়ে যেতো, আজকাল নিত্যিই তার আসার ধুম পড়েছে কেন ? হেমন্তবাবুর শরীর খারাপ তো তার কি মাথাব্যথা ? ওসব ছল ছাড়া আর কি ?…কড়া নাড়লেই তো দরজা খুলতে সেই বিমলা ? দরোয়ান তো নেই দোরে ? তবে ?

সাধে বলছি, পৃথিবীটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বিমলার পক্ষে !

অথচ বলতে গেলে খুড়ীর কাছ থেকে এক ফোঁটা সহানুভূতি জোটে না বিমলার, বরং ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গ করে স্নবর্ণ বলে—'ছোঁড়াগুলো যে তোর হাঁটুর বয়সী বিমলি, বলতে ঘেন্না হয় না ?'

নয়তো আরো কুৎসিত করে বলে—'রূপ দেখে জ্ঞান হারায়, তাই সামলাতে পারে না বোধ হয়। এবার থেকে বরং বোরখা পরে থাকিস বিমলি।'

একা বলে সুখ হয় না, পারুলকে ডেকে ডেকে বলে আর হাসাহাসি করে।

পারুলের আবার সব গল্প ঠাকুরপোর সঙ্গে করা চাই। বিয়ের কনে-বেলায় এসে নীরেনকে দেখেছিলো বারো বছরের নাবালক বালক। দেওরের সম্বন্ধে সেই নাবালক-বোধটা এখনো সমানেই প্রায় রয়ে গেছে পারুলের। ও যে এম. এ. পাস-টাস করে এখন দিব্যি মাতব্বর প্রফেসর হয়ে বসেছে, নিজস্ব গল্পগুলো করবার সময় সেটা মোটেই ভাবে না পারুল।

তাই আজকাল ওর গল্পের বেশ ভালো খোরাক জোগাচ্ছে বিমলা। নীরেনকে হাতের গোড়ায় পেলেই সেইসব সভ্যভব্য কথার আমদানী করে বসে। বলে—'শুনছো ঠাকুরপো, আমাদের 'পরীর' আজকের কাহিনী ? কে নাকি জানলা দিয়ে ওকে চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। রাজ্যিসুদ্ধ লোকের এমন মরণ-দশাও ধরেছে গো ? বাবাঃ ! বানিয়ে এতোও বলতে পারে !'

নীরেনও অবশ্য এক আধ সময় যে হাসে না, তা নয়। হেসে বলে—'চিঠিটা বোধ হয় নিজের হাতেই লিখে দেখিয়েছে ?'

—'ঘোড়ার ডিম! মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! চিঠি কোথায়?··· জেরা করতে বললো—রাগ কে নাকি উনুনে ফেলে দিয়েছে। বোঝো এখন? সত্যি, এসবে তো বুদ্ধি বেশ খোলে! মাথায় আসেও তো উত্তরগুলো!'

আবার হয়তো কোনোদিন—আরো কোনো—আরো কারুর—আরো বেশী বেশী বে-আইনী ব্যবহারের নালিশ ওঠে—বিমলার দিক থেকে। পারুল তার বিশদ ব্যাখা করতে বসে। হেসে কুটি কুটি হয়ে বিমলার রচনাশক্তির তারিফ করে। সব সময়ই যে উত্তরের প্রত্যাশা করে, তা নয়—বলেই আমোদ!

নীরেন এক একবার তাড়া দেয়, বলে—'হঠাৎ বিমলা তোমার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠলো কেন বলো তো? ওর কথা ছাড়া আর কথা নেই? এবারে 'ক্ষ্যামা' দাও! বিমলা সম্বন্ধে তুমি যতো ইন্টারেস্টেড্, আমি ঠিক তা নই। সত্যি, পরচর্চায় কি পরমসুখ তোমাদের?'

কদাচিৎ বা হাসে, বলে— 'এ তোমার অন্যায় বৌদি। গল্প-রচনা করছে, তাই বা ধরে নিচ্ছো কেন? ত্রিসংসারে কি মন্দ ব্যক্তি নেই? সবাই আমার মতো মহাপুরুষ?'

পারুল হেসে গড়ায়, বলে—'তোমার মতো মহাপুরুষ না হোক, ছিষ্টিসুদ্ধ লোক পাগলও তো নয় ঠাকুরপো? প্রেমপত্তর, গোলাপ ফুল, সিল্কের রুমাল—ছুঁড়ে দেবার উপযুক্ত পাত্রী আর কোনোখানে কারুর জুটছে না?'

—'আহা! অতো অবিচারই বা কেন তোমাদের? কালো কি কেউ হয় না? আমাদের 'সাগর পিসি'র মূর্তিটা কল্পনা করো, আমাদের সাগর পিসেমশাই তো—সেই গিন্নী নিয়েই—'

পারুল তর্ক শুরু করে, বলে—'তাদের আমলে ছেলেবেলায় বাপ-মায়ে বিয়ে দিতো। লোকে জানতো—এই রত্নটিই আমার একমাত্র। সে আর করবে কি? তাই বলে—সেই মূর্তি দেখলে কারুর প্রেমে পড়বার শখ হবে?'

'হবে না কেন? তোমরাই তো বলো,—এক্ষেত্রে হাড়িডোমও অচল নয়।'

পারুল দুই চোখ বড়ো বড়ো করে বলে—'ও ঠাকুরপো! তুমি ওর হয়ে যা ওকালতি করছো—দেখে ভয় লাগছে!'

'লাগছে নাকি?'

—'তা' কে জানে বাবা ? হাঁড়িডোমের উদাহরণ দেখাচ্ছো—'

বলে আর হেসে গড়িয়ে পড়ে পারুল।

কালো কুৎসিত বোকা শয়তান—যাই হোক, বিমলাকে নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামাতো না, শয়তানীর এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিমলাই অপরের মাথার টনক নড়িয়েছে।

পারুল আর স্বর্ণ বিমলার স্বজাতি বলেই বোধ হয় নিষ্করুণ চিত্তে শুধু সমালোচনা করেই মজা দেখে, পুরুষের স্বাভাবিক মমত্ববোধে নীরেন একটু অস্বস্তি পায়। মনে মনে চটে যায় হেমন্তবাবুর ওপর, কানা-খোঁড়া বাদ দিয়ে, যা হোক একটা সাপ-ব্যাঙ ধরে, মা-বাপ-মরা ভাইঝিটার সদ্গতি করে ফেললেই তো পারেন ভদ্রলোক।

কিন্তু আশ্চর্য ! এই অদ্ভুত কুৎসিত বটতলার উপন্যাস রচনা করবার শখ কেন বিমলার ? কী লাভ ? কারণটাই বা কী ? ওর এই প্রায়-যৌবনোত্তীর্ণ জীবনে কেউ কখনো ওতে নারীত্বের স্বীকৃতি দিলো না বলেই কি, সেই খবরটা সম্বন্ধে অপরকে সচেতন করে তোলবার এই বিকৃত সর্পিল পন্থা আবিষ্কার করছে বিমলা ?...পুরুষ জাতটা যে ওর সম্বন্ধেও মোহমুক্ত নয়, এই প্রমাণ দেখাবার জন্যেই কি তার চেষ্টার আর অন্ত নেই ?

কে জানে ! কুরূপা নারীর হৃদয়রহস্য বিশ্লেষণ করবার শখ আর সময় কার থাকে ? অতএব বিমলার চিন্তা বাতাসে উড়ে যায়।

হলে হবে কি, তখনকার মতো যায়, আবার বিমলা ফিরিয়ে আনে তাকে।... লোকে যতো উপহাস করে, ততোই আরো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটতে থাকে বিমলার জীবনে। সে বৃত্তান্ত বলে বেড়াবে না সে ?......এই যে—স্বর্ণর বোনপো বারো মাস আসে যায়,—হঠাৎ যে সে চা নিতে গিয়ে বিমলার হাতখানা চেপে ধরলো, সে ঘটনা হজম করে যাবে বিমলা ? কেন ? তার বুঝি মান-মর্যাদা নেই ? ফিসফিস করে পারুলের কাছে বলবে না ?

আর কেউ নয় স্বর্ণলতার বোনপো !

এরপরও স্বর্ণলতা হাসাহাসি করবে—এমন আশা করা যায় না। নিজে বিমলার গায়ের ওপর গেলাস ছুঁড়ে মেরে কালশিটে পড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, হেমন্তবাবুকে দিয়ে আগা-পাছতলা চাবুক মারাবে,—এ আশ্বাস দিয়ে রাখে বিমলাকে।

সশব্দেই ঘোষণা করে।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—এ মেয়েকে কেন তার মা আঁতুড়েই গলা টিপে মারেনি ?'

স্থবর্ণলতার বোনপো!

বিশ্ববিত্মালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, রূপের কান্তি ছেলে! বয়সে বিমলি লক্ষীছাড়ীর চেয়ে কোন্ না পাঁচ বছরের ছোটো! তার নামে এতো বড়ো অপবাদ! ও মেয়েকে কেটে কেটে নুন দিলেও রাগ সত্যিই যায় না।

দুঃসাহসেরও তো একটা সীমা আছে? বিমলা দুঃসাহসের সীমা ছাড়িয়েছে বলেই তার ওপর লাঞ্ছনাটাও সীমা ছাড়ায়! দোতলা-তেতলা—সব ছাপিয়ে বোধ করি আকাশে ওঠে বিমলার লাঞ্ছনার বার্তা।

তা' উঠলেই বা কি ?

স্বয়ং ভগবানের কানে পৌঁছলেই কি এই হাড়-হাবাতে হতচ্ছাড়া মেয়েটার ওপর তাঁর এক ফোঁটা সহানুভূতি জাগবে ?

দুর্ভাগার ওপর সহানুভূতি আসে,—দুর্বুদ্ধির ওপর আসবে কেন ?

এইবারে সত্যিই উঠে পড়ে লেগে বিমলার বিয়ের চেষ্টা করেন হেমন্তবাবু।

স্থবর্ণলতা শাসিয়েছে—'ও মেয়ে যদি একদিন ঘর ভেঙে পালায়, আমি কিন্তু তার দায়িক হবো না, বলে দিচ্ছি! ভালো চাও তো দূর করো—'

কয়েকদিন ধরে আবার অহিংস সংগ্রাম চলছে বিমলার। তাই এতো বেশী হিংস্র হয়ে উঠেছে স্থবর্ণলতা।

অথচ সত্যিই কি সব দোষ বিমলার ?

পুরুষের লুব্ধতার যে কাহিনী সে প্রকাশ করে বেড়ায়, সে সমস্তই কি মিথ্যা গল্প? তবে—নিজের চোখে তার স্বপক্ষে প্রমাণ পেলেন কি করে হেমন্তবাবু?… নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারেন না ?

প্রায় নিশুতি রাত্রে, রান্নাঘরের সবকিছু কাজ মিটিয়ে পরদিনের কুটনো-গুলো পর্যন্ত কুটে রেখে বিমলা যখন রান্নাঘরের শেকল লাগাচ্ছে,…নীরেন নিঃশব্দে দোতলা থেকে নেমে এসে পেছন থেকে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো কেন ?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বিমলা মুখ ফিরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলো। এ

পর্যন্ত সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পেলেন হেমন্তবাবু, কিন্তু ধৈর্য ধরে আর কিছু দেখতে পারলেন না। আজন্মের সংস্কারে বাধলো।…তাই হঠাৎ বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই নকল কাশির আওয়াজে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে বসলেন।

এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে সুবর্ণলতার কাছে যথেষ্ট মুখনাড়া খেলেন ভদ্রলোক। আর একটু অপেক্ষা করে, একেবারে হাতেনাতে ধরতে পারলেও তো একটা কাজ হতো! হয়তো নীরেনকে কায়দায় ফেলে বিয়ের একটা সুরাহা হতে পারতো।…

—'সাধু পুরুষ! চিরকুমার থাকবেন! এতোই যদি সাধুতা, তো—এসব কি?'

হেমন্তবাবু কিন্তু ভাবেন অন্য কথা।

মানুষ জিনিসটা সত্যিই এমন গোলমেলে? নীরেনকে তো অনেক দিনই দেখছেন তিনি, সত্যিই যাকে হীরের টুকরো ছেলে বলে, তা-ই। বয়সে ছোটো হলেও তাকে যথেষ্ট সমীহ—শ্রদ্ধা করেন হেমন্তবাবু। তার প্রকৃতির সঙ্গে এ ব্যবহারের সামঞ্জস্য কোথায়?

আবার দেখো—বিমলা। ওর প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি অভিযোগই যে মিথ্যে করে বানানো, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিলো না বরং তার নিজেরই রীতি-প্রকৃতি প্রশংসনীয় নয়। অথচ হেমন্তবাবুর গলার আওয়াজ পেতেই নীরেন যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো, বিমলা সিঁড়ির সবনিচের ধাপটায় বসে পড়ে অমন নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো কেন? খুব বেশী মর্মাহত না হলে কি মানুষ অমন নিঃশব্দে কাঁদে? নীরেনের ব্যবহারে যে সে আচমকা খুব আঘাত পেয়েছে, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন হেমন্তবাবু। ঠিক মাথার ওপরই লাইটটা জ্বলছিলো, দেখার ভুল হয়নি।

হিসেব মেলেনা।

বিচলিত চিত্তে তক্ষুনি গিয়ে সুবর্ণলতাকে না বলে ফেললে হয়তো পরে চুপেই যেতেন তিনি, কিন্তু আর তো চারা নেই। একবার সুবর্ণর কানে উঠলেই তো হয়ে গেলো!…

নেহাত নাকি ঘটনাকালটা রাত্তির, তাই কথাটা পারুলের কানে যেতে ঘণ্টা কতক দেরি হলো।

এবারে রাগের পালা পারুলের।

নীরেন তার বোনপো না হলেও কম 'আঁতের' জিনিস নয়। তা ছাড়া—দেওরকে সে সত্যিই মহাপুরুষের দরে দেখে। দেখছে তো ছোট থেকেই, চাঁদে কলঙ্ক আছে তো নীরেনে নেই।

তাই মুখ অন্ধকার করে বলে—'নিজের চোখে দেখলেও একথা বিশ্বাস করবো না ভাই, আমার দেওরকে আমি জানি না? একদিকে সোনা, আর এতদিকে ঠাকুরপোকে ওজন করো, তুল্যমূল্য হবে।'

সুবর্ণ দুই ভুরু টেনে বলে—'অতো সোনা তো আমাদের গরীবের ঘরে নেই পারুল, তুলনা করবার সুবিধে কোথায়? তবে কথায় বলে—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, তা' মানুষ তো কোন্ ছার!'

মতিভ্রম-সৃষ্টি করবার কারণটাও যে উপযুক্ত হওয়া চাই, সেই কথাটাই শুধু উল্লেখ করে পারুল। কিন্তু সুবর্ণ সে কথা গায়েও মাখে না। 'রূপে'র সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে গাঁথা পরবর্তী শব্দটার সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিয়ে বলে—'আমার কথা ওড়াতে পারো, এনার কথা তো পারবে না? ইনি নিজে দেখেছেন।'

কথায় কথায় তর্ক, অবশেষে বচসা!

সুবর্ণ মুখরা, পারুলও কথায় হারবার মেয়ে নয়। যথেচ্ছই বলে সে। এতোদিনের বন্ধুত্বডোরে আবদ্ধ দু'টি নারী, যেন কলহের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে। একথাও বলতে ছাড়ে না পারুল—বিয়ে তো ইচ্ছে করেই দিচ্ছে না সুবর্ণরা। বছরে দুখানা 'ট্যানা' আর দৈনিক এক থালা ভাত দিয়ে—তিনটে লোকের কাজ পাওয়া যাচ্ছে যখন!

কিন্তু আশ্চর্য, বিমলা যেন একেবারে পুতুল হয়ে গেছে। এতো কাণ্ড, এতো কথা, ও একেবারে চুপ!

পুরুষ জাতির দুর্বলতার এতো বড়ো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ হাতে পেয়েও সদ্ব্যবহার করে না তারা কেন? অন্ততঃ একথা তো বলতে পারতো,—'দেখো পুরুষচিত্তে মোহ-সঞ্চার করবার ক্ষমতা কোনো রূপসী তরুণীর চেয়ে বিমলার কিছু কম নয়'।

আর সে চিত্ত কি যেমন তেমন?

বিমলার কাছে—আকাশের চাঁদ!

কিন্তু না, এতো সুযোগ পেয়েও চুপ করে থাকে বিমলা। সাড়া পাওয়া দূরের কথা, দেখতেই পাওয়া যায় না তাকে।

পারুল ঝগড়া করে করে ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিলো নীরেনের বাড়ী ফেরার অপেক্ষায়। দাদার চেয়ে অনেক আগেই ফেরে সে। ফিরতেই পারুল বিদ্যুৎবেগে উঠে একেবারে 'ঝটিকা আক্রমণে'র ভঙ্গীতে বলে—'বলি ঠাকুরপো, তুমি নাকি কাল রাতদুপুরে অভিসারে গিয়েছিলে ?'

রাগলে পারুলের মুখের আগল থাকে না নীরেন জানে, তাই কিছুমাত্র না চমকে মৃদু হেসে উত্তর দেয়—'তা' ওটাই তো প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু সে খবরটি ইতিমধ্যেই কর্ণগোচর হয়েছে তোমার ?'

পারুল গালে হাত দিয়ে বলে—'অমন গায়ে হাওয়া দিয়ে কথা বলছো, মানে ? ব্যাপারটা কি শুনি ?'

নীরেন গায়ের জামাটা খুলে সামনের দড়িতে টাঙাতে টাঙাতে নির্বিকার ভঙ্গীতে বলে—'আমি আর কতোই বলতে পারবো ? আমি যা জানি, তার চেয়ে বেশীই শুনে ফেলেছো, আশা করছি।'

পারুল চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে—'ঠাকুরপো, রাগিও না বলছি—সোজা-সুজি জবাব দাও, কি হয়েছে কাল ?'

—'সে তো নিজেই তুমি বলেছো আগে !'

—'বলেছি বলে, তাই বিশ্বাস করবো আমি ? সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না ঠাকুরপো, মন-মেজাজ আজ মোটে ভালো নেই আমার। হেমন্ত-গিন্নী ডেকে নিয়ে গিয়ে না-হক কতকগুলো অপমান করলো।'

ভাজের উত্তেজিত ভঙ্গীতে ভারী যেন কৌতুক বোধ করে নীরেন, হেসে ফেলে বলে—'বাঃ, অপরাধ করলাম আমি, আর অপমান করলো তোমাকে ? কেন ?'

'অপরাধ করলে তুমি ? স্বীকার করছো নিজের মুখে ?'

পারুল হতবাক্ হয়েও এটুকু উচ্চারণ করে।

—'তা' অস্বীকার করে লাভ কি ?'—কেবলি হাসে নীরেন : 'অব্যাপারেষু ব্যাপারং তো ? লোক-জানাজানি হয়ে একাকার। কে জানে বাবা, বুড়ো তখনো জেগে বসে আছে ?'

এ আবার কোন্ ধরনের পরিহাস নীরেনের! পরিহাসেরও তো একটা সীমা-সভ্যতা থাকা উচিত!

ওর এই উৎকট পরিহাসের ভঙ্গীতে বাক্‌পটু পারুলও বোকা বনে যায় যেন, তাই বোকার মতোই বলে—'তবে যাও না—যাও, বিমলিকে বিয়ে করো গে?'

—'তা ছাড়া আর উপায় কী?'—অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করে নীরেন: 'বলে এলাম তাই হেমন্তবাবুকে!'

—'তা হলে—সত্যিই তুমি? ঠাকুরপো! তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?'

—'নাঃ ঠিক অতো দূর পৌঁছইনি বোধ হয়।'

—'আরও কি হবে ঠাকুরপো? আর কি হতে পারে? শেষ পর্যন্ত কি না বিমলিকে? ছি ছি ঠাকুরপো, গলায় দিতে দড়ি জুটলো না তোমার?'

ঠাকুরপো সশব্দে হেসে ওঠে—'গলায় দিতে দড়িই তো একগাছা জুটলো বৌদি, ফুলের মালা আর জুটলো কই?'

পৃথিবীতে যতো সব অঘটন ঘটে, তারই নমুনাস্বরূপ সত্যিই একদিন নীরেনের সঙ্গে বিমলার বিয়ে হয়ে গেলো!

এরপর সহজেই মনে করা যেতে পারে, বিয়ে-পাগলা বিমলা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছে। কিন্তু কই? সেই রাত থেকে—সেই যে মৌনব্রত নিয়েছে বিমলা, সে ব্রত-ভঙ্গই হলো না যে!

বারো বছর সময়কে যদি এক যুগ বলে ধরা হয় তো—একটা যুগব্যাপী আকাঙ্ক্ষার শেষ হলো তো তার?

সুদীর্ঘ কাল ধরে—কতো জনের দেখে, কতো জনের শুনে, মনে মনে কতো কল্পনাই যে করে রেখেছিলো বিমলা এই রাত্রিটির জন্যে! অনেক আশায় গড়া, অনেক কামনার রঙে রাঙানো ফুলশয্যার রাত্রি! সে কি শুধু, বরের পায়ের কাছে পড়ে পড়ে চোখের জল ফেলবার জন্যে? এই কি পরিকল্পনা ছিলো বিমলার?

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদতে দিয়ে নীরেন ওর মাথার ওপর একটা হাত রেখে মৃদু হেসে বলে—'এবার থামো! চোখের জলটা সমস্ত খরচ করে ফেললে, ভবিষ্যতের জন্যে রাখবে কী? বৌদির এক্তারে ঘর করতে হবে সেটা ভুলো না!'

তবু বিমলা মুখ তোলেনা, তেমনি মুখ ঢেকেই বলে—'তুমি কেন এমন করলে? কেন আমাকে চাবুক মারলে না? কেন আমাকে একেবারে মেরে ফেললে না?'

নীরেন হেসে উঠে বলে—'একেবারে মেরে ফেলবার ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে প্রাণে জাগতো সত্যিই, কিন্তু ফাঁসির ভয়টাও তো উড়িয়ে দেবার নয়? ভেবে চিন্তে—এই সমাধানটাই সহজ মনে হলো।'

—'এতো শাস্তি যে আমি সইতে পারছি না! আমি কি করবো?'

—'শাস্তি! কি আশ্চর্য! হায় বিধি, এই ছিলো ললাটে আমার!'—বেশ স্পষ্ট করেই হেসে ওঠে নীরেন: 'এমনিই দুর্ভাগা আমি যে, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা শাস্তি!'

—'হ্যাঁ শাস্তি! একশো বার শাস্তি! শাস্তি ছাড়া আর কি?'

শরাহত বন্যপশুর মতো নীরেনের পায়ের কাছে বিছানায় মুখ ঘষতে থাকে বিমলা। তার আবেগের অভিব্যক্তির ধরনটাই হয়তো এমনি অস্বাভাবিক।

পিঠের ওপর ভারী আর কোমল একখানি হাতের গভীর স্পর্শ পায় বিমলা, হয়তো এই স্পর্শের মধ্যেই ছিলো তার প্রশ্নের উত্তর, তবু মৃদুগম্ভীর একটি স্বর কানে আসে—'ওরকম করতে হয়না, ছি! এসো—উঠে এসো। নিজেকে অতো বেশী ছোটো ভাবতে নেই, বিমলা!'

একটি ফুটো পয়সার জের

জগতের কোনো দেশে কখনো ফুটো পয়সার জন্ম হয়নি। আজও হয় না।

শুধু একদা যখন হতভাগা ভারতবাসীর জীবন-রসপাত্র সহস্র সমস্যা আর সহস্র অভাবের ছিদ্রে ঝাঁজরা হয়ে উঠেছিলো, তখনকার শনি-আশ্রিত শাসক-শক্তির রন্ধ্রগত শনি, সোজাসুজি লক্ষ্মীর বক্ষ লক্ষ্য করেই তুরপুন চালিয়েছিলো।

লক্ষ্মীতো বটেই! জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য আর সম্পদের প্রতীক নামই তো 'পয়সা'। লক্ষ্মী যার কাছে যে মূর্তিতেই অবস্থান করুন, আমরা তাকে বলি 'পয়সা-ওলা লোক'।

সেই পয়সার বক্ষ বিদারণ করে অভাব মোচনের দুর্বুদ্ধি যাদের জেগে-ছিলো, তারা ফুটো পয়সার সৃষ্টি করার অব্যবহিত পরেই বিদায় নিতে বাধ্য হ'লো বটে, কিন্তু খুব সম্ভব যাবার সময় রন্ধ্রগত ঠাকুরটিকে ঝেড়ে ফেলে ভারতের মাটিতেই রেখে গেলো!

নইলে—তারপর থেকে দেশে কতো কাণ্ড কতো কারখানা, কতো ভাঙা কতো গড়া, কিন্তু ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক-চিহ্ন হিসেবে আজো বিরাজ করছে ফুটো পয়সা!

সেই ফুটো পয়সার একটি নিয়েই আমাদের গল্প।

বাড়াবাড়ি রকমের কোনো একটা ঘটনা নয়।

'বাড়াবাড়ি' ছেড়ে কিছুই নয়।

আঁচলের গিঁঠে আনা কতক পয়সা বাঁধা ছিলো মুকুলের, গিঁঠটা কেমন একটু আলগা হয়ে, খুলে ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মেঝেয়।

রবিবারের দুপুর।

মুকুল ঝাড়নহাতে ঘর ঝাড়া-মোছা করছিলো, প্রভাত খাটে শুয়ে বই পড়ছিলো। পয়সা পড়ার শব্দে চমকে বললে—কি হলো?

—হলো আর কি, কাজ বাড়লো! বলে মুকুল হেঁট হয়ে কুড়োতে লাগলো।

প্রভাত হাতের বইখানা মুড়েছিলো, বললে—পড়লো কি করে?

মুকুল কুড়োনো পয়সাগুলো গুনতে গুনতে মুচকে হেসে বললো—আঁচলের গিঁঠ আলগা বলে বোধ হয়!...ও মা, আর একটা কোথায় গেলো, পাঁচ আনা তিন পয়সা ছিলো যে!

পরবর্তী কথাটা প্রায় স্বগতোক্তি।

উক্তিটার পরে মুকুল একবার নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখলে, এদিক্ ওদিক্ উঁকি মারলে, তারপর পয়সাগুলো আবার আঁচলে বেঁধে ফেলে বললে—আলমারীর তলায় ঢুকে বসে আছে নিশ্চয়। মরুক গে!

কে জানে, বইখানায় প্রভাতের মন বসছিলোনা না কি! কে জানে, কিছু না ভেবেই বললো কিনা, তবে উঠে বসে বললো—'মরুক গে' মানে? খুঁজতে হবেনা?

মুকুল বললে—পারিনা বাপু, ওই আলমারির তলায় হাত ঢোকে নাকি?

—হাত না ঢোকে, একটা লাঠিটাঠি কিছু চালিয়ে দেখো?

মুকুল হেসে উঠে বললে—মশা মারতে কামান! একটা ফুটো পয়সার জন্যে লাঠি আনি, সড়কি আনি, ঢাল তলওয়ার আনি! খেয়ে-দেয়ে তো কাজ নেই আমার!

প্রভাত বইটা ভালো করে বন্ধ করে একপাশে ঠেলে রেখে গম্ভীর ভাবে বললো—একটা ফুটো পয়সা বলে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে কেন? ফুটো পয়সা, পয়সা নয়?

মুকুলের মনটা সকাল থেকে অকারণেই কেমন যেন খুশি খুশি ছিলো। হয়তো ভাবছিলো—মাসের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যায় একটু 'খরচের' প্রোগ্রাম করবার প্রস্তাব করলে হয়। সকাল বেলাই কাগজ খুলে সিনেমার পাতাটা দেখে রেখেছে।

সেই খুশির আমেজে প্রভাতের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলোনা, ঝাড়নটা আবার হাতে তুলে নিলো। ঝাড়া-মোছা এক বাতিক মুকুলের, দিনে দশবার ঘর ঝাড়ে।

কাজ করতে শুরু করে বললো—যাই বলো, আমার কিন্তু ওই ফুটো পয়সাকে কোনো দিন 'পয়সা' বলে মনেই হয়না।

প্রভাত বাঁকা হাসি হেসে বললে—শুধু ফুটো পয়সা কেন? কোনো পয়সাকেই তো 'পয়সা' বলে মনে হয়না তোমার!

এরপর অবশ্য আর অকারণ খুশির আমেজ থাকা সম্ভব নয়।

মুকুল ভুরু কুঁচকে বললে—এ কথার অর্থ?

—অর্থ খুবই প্রাঞ্জল—বলে প্রভাত আবার শুয়ে পড়ে মুখের সামনে বইখানা খুলে ধরে।

কিন্তু প্রভাত যদি হাতের ঢিলটি ছুঁড়ে দিয়েই মনে করে—অতঃপর ঘটনার শেষ হলো, সেটা তার নিছক বুদ্ধিহীনতা।

পাট্‌কেল ফিরে আসবেই।

'প্রাণাধিক'ই হও আর 'প্রিয়তমা'ই হও, ঢিলের বদলে পাটকেল তোমাকে খেতেই হবে। কথা গায়ে মেখে কেউ থাকে না।

মুকুলই বা থাকবে কেন?

ও বইখানা প্রভাতের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে বললে—এই তা'হলে তোমার মনের ভাব? তোমার পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করি না আমি? অন্যায় খরচ করি?

—আমার পয়সা তোমার পয়সার কথা তো হচ্ছেনা, তোমার স্বভাবের কথা হচ্ছে। খরচ করবার আগে একটু ভেবে চিন্তে করতে তো দেখলাম না কোনদিন। তোমার নিজের পয়সাই কি বাজে খরচ করোনা? এই যে সেদিনকে বিনা প্রয়োজনে কতকগুলো দামী কাচের গেলাস কিনে আনলে—সে তো নিজের থেকেই—

মুকুল বাধা দিলো। তীক্ষ্ণহাসি হেসে বললে—থাক্‌, ওটুকু 'মৌখিক ভদ্রতা' না করলেই পারতে। প্রয়োজন বোধ সকলের সমান নয়, কিন্তু সে যাক্‌, কোনো পয়সাই যে 'আমার' নয়, সে তুমিও ভালো জানো, আমিও জানিনা তা' নয়। দয়া করে হাতে তুলে দাও 'খরচ করো' বলে, ভাবি সেটা হয়তো নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়ে থাকো। ভুলটা ভাঙলো! তবে—কথাটা কি জানো, জগতের সবাই তো এক ধাতু দিয়ে গড়া নয়? এক পয়সায় মরতে বাঁচতে হলে, আলাদা ধাতুর দরকার!

কিন্তু প্রভাতকে কেউ যদি 'কৃপণ' অপবাদ দেয় তো সে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হবে। একটা ফুটো পয়সায় মরে বাঁচে এমন লোক সে মোটেই নয়। তবে কথা হচ্ছিলো ন্যায্য অন্যায্যর।

একটা পয়সাই বা 'মরুক গে' হবে কেন ?

বাজারে ছ'আনা জোড়ার কাচের গেলাস যখন পাওয়া যায়, তখন আঠারো আনা জোড়ারটাই বা কিনতে যাবে কেন ?

এ প্রশ্নের বিপক্ষে অবশ্য আরও অনেক 'কেন' থেকে যায়।

কিনতেই যদি না যাবে, তো জিনিসগুলো আছে কি করতে ?

তাহলে—আবার কথা ওঠে—জগতে যা 'আছে' তার কি সীমাসংখ্যা আছে ? ওকথা বাদ দাও।

উত্তর আর প্রত্যুত্তর !···ঘরের হাওয়া গরম হয়ে ওঠে তা'তে।

প্রভাত বলে—দিলদরিয়া মেজাজটা ভালো, তবে আমি তো আর পয়সা-ওলা লোক নই যে, সবসময় তোমার মেজাজের তালে তালে চলা সম্ভব হবে ?

মুকুল একটুখানি তেতো হাসি হেসে বলে—তুমি যে পয়সা-ওলা নও, সেটা তোমার অক্ষমতা, আমার অপরাধ নয়।

আর ভাষার ভব্যতা রাখা চলে না।

অন্ততঃ প্রভাতের পক্ষে সাধ্য হয় না। ও প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বলে বসে—কথা তো খুব লম্বা লম্বা শিখেছো ! কথা শিখতে তো বিগ্যের দরকার হয় না ! বলতেও ট্যাক্স লাগেনা !···বলি—কী পাচ্ছো না ? কী হচ্ছে না ?

মুকুল স্থির স্বরে বললে—উল্টো দিক থেকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া একটু অসুবিধে। 'আইটেম'গুলো মনে রাখা শক্ত। বরং কি কি পাচ্ছি, তা'র হিসেবটা সহজ। ধরোনা কেন, ভাত পাচ্ছি, কাপড় পাচ্ছি, তেমন তেমন রোগ হলে ওষুধও অবিশ্যিই পাচ্ছি। গায়ে সাবান, মাথায় তেল, মাঝে মাঝে এক আধদিন সিনেমা থিয়েটার, এগুলো পাচ্ছি বৈকি ! মালিক বিবেচক হলে, শ্রমিকরা যে সমস্ত সুখ সুবিধে পায়, প্রায় সবই পাওয়া যাচ্ছে।

চেঁচিয়ে প্রতিবাদ বরং সহ্য হয়। এমন ঠাণ্ডা সুরে বক্রোক্তি পুরুষ মানুষের স্নায়ুতে আগুন ধরিয়ে দেয়।···তাই প্রভাতের মুখ থেকে সহসা যে আগুনজ্বালা কথাটা উচ্চারিত হয় তা এই—মেয়েমানুষ জাতটাই এরকম নেমকহারাম বটে ! যার জন্যে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি—

আশ্চর্য ! এতো বড়ো অপমানকর কথাতেও মুকুল কেঁদে ভাসিয়ে দেয়না,

আছড়ে শুয়ে পড়েনা। শান্ত সভ্য ভাবে বলে—দুঃখের কথা বটে। কি করবো বলো, জাতের স্বধর্ম যাবে কোথায়? তবে কিনা যে বেচারার দুটো চারটে ফুটো পয়সাই 'সর্বস্ব', তার পক্ষে সর্বস্বান্ত হওয়ায় খুব বেশী বাহাদুরী আর কি?

—হুঁ! সাধে কি আর বলছিলাম কথা কইতে ট্যাক্স লাগেনা? ঘেন্না দিতে তো খুব পারো, চেয়ে ভিক্ষে করে ছাড়া, একটা ফুটো পয়সাই কি আনতে পারো?

—এতোদিন তো চেষ্টা করে দেখিনি। এবার থেকে দেখবো।

—হুঁ দেখা যাবে!...'ফুটো পয়সা' 'ফুটো পয়সা'! তা'র জন্যেই যেন মরে যাচ্ছি আমি। মানুষের একটা নিয়ম থাকবে না?

বলা বাহুল্য এ সুরটা আপোষের।

হয়তো হাতের ঢিলটা কোথায় গিয়ে পড়েছে বুঝতে না পেরে একটু আশঙ্কিত হয়েছে প্রভাত। তাই সামলে নিতে চাইছে অবস্থাটাকে।

স্ত্রীরা স্বামীজাতির প্রতি যে পরিমাণ বাক্যবাণ বর্ষণ করতে দ্বিধা করে না, স্বামীজাতি তার শতাংশের একাংশও পারে কি না সন্দেহ।

পারে না হয়তো এই জন্যেই, জানে ওদের তূণে যে বাণ সেটা সত্যিকার ইস্পাতের। বিঁধলে মোক্ষম বিঁধবে।

মেয়েরা যেটা ছোঁড়ে, সেটা যাত্রাদলের পাঁকাটির বাণ, ছুঁড়ছে দেখলে—মনে হয় 'ইস্!' কিন্তু ওই পর্যন্তই।

পুরুষের কাছে বোধ হয় শিশু আর স্ত্রীলোক এক পর্যায়ভুক্ত। তাই স্ত্রীর গঞ্জনায় তার অপমান নেই, আছে আশঙ্কা—এই রে, কোথায় গিয়ে ঠেকবে এর জের কে জানে! হয়তো দিনটাই হবে মাটি।...কাজ কি তবে গোলমালে! মান খুইয়ে একটু আপোষ করলেই যদি মিটে যায়।...আর মানটাতো সত্যিই 'খোয়া' যাচ্ছে না।

প্রভাতের এই সুপরিচিত আপোষের ভঙ্গীটা আজ আর কাজে লাগলো না। কে জানে কেন লাগলো না। এর আগে কি কখনো কোনোদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি প্রভাতের? কোনো কটূক্তি করে ফেলেনি?

হয়তো করেছে।

কিন্তু সব কিছুরই তো শ্রেণীভেদ আছে।

মনের যন্ত্রে আছে সাতটা তার। কে জানে কখন কোন্ অসতর্ক হাতের ধাক্কায় কোন্ তারটা ঝনঝনিয়ে ওঠে। তাই মুকুল বিনাবাক্যে ঘরের মেঝে থেকে ধুলোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিলো—কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না করে।

প্রভাত শেষ মান খুইয়ে শুকনো হাসি হেসে বললে—বাঃ চলে যাচ্ছো যে? ঝগড়ার একটা মীমাংসা করে যাও?

—মীমাংসা হয়ে গেছে—বলে সরাসর তিনতলার ছাতে উঠে গেলো মুকুল।

দুপুর বটে। তবে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর নয়। রোদের নিচে মেঘের চাঁদোয়া লাগানো ঠাণ্ডা দুপুর! ছাতে বেড়ানো যায় অনায়াসে। ঝিরঝিরে উড়ু উড়ু হাওয়া ভালোই লাগে।

একটু যেন অবাক্ লাগলো মুকুলের!

অবাক্ লাগলো, মেঘ মেঘ দুপুরে কোনোদিন ছাতে আসেনি মনে করে। সত্যি, দিনের পর দিন সারা দুপুর সে দোতলার ওই ঘরখানায় কাটায়? বাড়ীতে যে ছাত আছে, পৃথিবীতে যে আলো আছে, কোনোদিন খেয়ালও করে না?…ঘরটাকে মনের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে, আর বারবার পরিষ্কার করে আত্মতৃপ্তির শেষ নেই।

আত্মীয়-স্বজনরা মুকুলকে বলে 'ঘরকুনো'।

মিথ্যে বলে না। সত্যিই একটু ঘরকুনো মুকুল। নিজের ঘর ছাড়া আর কোথাও মন বসেনা ওর। একদিন ভাইয়ের বাড়ী বেড়াতে গেলে রাত্তিরে পালিয়ে আসে, থাকতে পারে না।

আলসের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মুকুল।

নাঃ অভিমানের দুরন্ত বেগে আলসে ডিঙিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবার মতো খেলোমি তার নেই। রাস্তাতেই যদি নামতে হয়, ধীরে সুস্থে চৌকাঠ ডিঙিয়ে নামাই ভালো।

উঁচু ছাত থেকে রাস্তার ছবিটা কি সুন্দর দেখতে! পিচ ঢালা চকচকে,

কালো রঙের চওড়া ফিতের মতো রেখায়িত মসৃণ।···ওখানে যে ধুলো আছে বোঝবার উপায় নেই।

তবু ধুলো আছে বৈকি! কে না জানে।

কিন্তু ধুলোর ভয়ে মাটিতে না নামলে পায়ের নিচে মাটির স্পর্শটা পাবে কেমন করে? মাটিটা পেতে হলে ধুলো না খেয়ে উপায় নেই।

মুকুলের ছাতে উঠে যাবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত আর একবার ওর আবির্ভাবের প্রত্যাশা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো প্রভাত। উঠে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখলে নিত্যকার মতোই কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে মুকুল।

ভাবলে······যাক্ ফাঁড়া কেটেছে! ভাগ্যিস তখন বেশী কথা বাড়াইনি! এখন তাল বুঝে একবার সিনেমার প্রস্তাবটা তুললেই ব্যস্! আজকের ঝড়ের চিহ্ন ধুয়ে মুছে যাবে। সকালবেলা মুকুল খবরের কাগজ খুলে দেখছিলো যেন সিনেমার পাতাটা।

চা খাবার সময় পেশ করলো প্রস্তাবটা।

ভেবেছিলো মুকুল প্রথমে আপত্তির ভান করে তারপর সানন্দ-সম্মতি দেবে। আপত্তিখণ্ডনের ভাষাটা শানাচ্ছিলো মনে মনে, কিন্তু মুকুল একেবারে উল্টোদিকে গেলো, ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলে—তোমার ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে মানে কি? তোমার নয়?

—আমার কথা থাক্। তোমার ইচ্ছে হয়, যাবো!

বলা বাহুল্য এ রকম নিরুত্তাপ উত্তরে কথা এগোয় না। কাজেই প্রস্তাব পাস হলো না।

অথচ মুশকিল এই, ঝড় কাটলো কি না বোঝা গেলো না।

কাটতে থাকে নিরুত্তাপ ক'টা দিন।

ঠিকমতো কাজ করে যায় মুকুল, ছেলেদের যথারীতি তদারকী করে। প্রভাতও যা কিছু প্রয়োজন হাতে হাতে যোগান পায়। হয়তো বা আগের চাইতে একটু বেশীই পায়।···কিন্তু ঠিক যেন নাগাল পায় না মুকুলের।

আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে কি যে করে সে, সেই জানে!

কেবলি যেন কোথায় চিঠিপত্র লেখে, রিক্শ করে দু'দিন ঘুরেও এলো কোথায় বড়ো খোকাটার সঙ্গে!

জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

অবশেষে একদিন প্রকাশ পেলো কথাটা।

আর স্থির থাকা সম্ভব হয় না প্রভাতের। বাইরে বেরোবার সাজে সজ্জিত স্ত্রীর হাতটা চেপে ধরে আটকায়, বলে—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

মুকুল অল্প হেসে বলে—পাগল? নাঃ, সে বয়েস আর আছে কই?

—পাগল না হলে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছো?

মুকুল আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নরম গলায় বললে—আর তো 'বেড়াচ্ছি' না! পেয়ে গেলাম যখন যা হোক একটা।

—'পেয়ে গেলাম' বললেই পেয়ে গেলাম? ওই হতচ্ছাড়া চাকরিটা সত্যিই করবে ভেবেছো না কি?

—তা হতচ্ছাড়া ছাড়া যখন আর কিছু পাচ্ছি না—

—চাকরির মতলবটা মাথায় ঢোকালে কে? ওসব ভাবনা রেখে দাও।

মুকুল হাসলে, বললে—ভাবার স্টেজটা পেরিয়ে গেছে।

প্রভাত ক্ষিপ্তভাবে বলে ওঠে—কি এমন মারাত্মক কথা বলা হয়েছিলো তোমায়, যে একেবারে উঠে পড়ে লেগে চাকরি খুঁজতে বসলে? চাকরি! ভারী চাকরি! 'সাহচর্যদান' মানে কি জানো? জানো সে চাকরিকে কি বলে?

—চাকরানীগিরিই বলে বোধ হয়! মুকুল হেসে ওঠে—তা' বিদ্যেসাধ্যির বহর যেমন, তেমনি চাকরিই হবে তো? হঠাৎ বিজ্ঞাপনটা দেখে মনে লেগে গেলো। ভাবলাম—অফিস আদালতের ব্যাপার তো জানিনে কিছু, যে কাজে অনেক বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে সে কাজটাই বরং ভালো ম্যানেজ করতে পারবো। তাই নিয়ে নিলাম।...তা' তোমার অতো ভাবনার কি আছে? 'বিধবা ভদ্রমহিলার সাহচর্য' বৈ তো নয়? বিপত্নীক ভদ্রলোক হলেও বা কথা ছিলো।

—আমাদের কেবল ওই একটি মাত্র ভাবনাই আছে কেমন? এই তোমাদের ধারণা?

—ধারণার কথা কেউ কাউকে বলে বুঝি? বাঃ!

—ওসব বাজে কথা রাখো। চাকরি নেওয়া তোমার হবেনা, ব্যস্! প্রেস্টিজ বলে কিছু নেই না কি?

—প্রেস্টিজ? মুকুল হাসলো—ও শব্দটা বড়ো গোলমেলে, ও কার যে কিসে থাকে, আর কিসে যায়! কিন্তু চাকরিটা নেওয়া না নেওয়া আর বিবেচনার মধ্যে নেই তো! পাকা কথা দিয়েই এসেছি!

—'পাকা কথা'! ভারী পাকা কথা! সে কথার খেলাপ করলে, তিনি এসে তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবেন!

মুকুলের স্বভাবের এতো পরিবর্তন হলো কি করে কে জানে!

কিছুতেই আর উত্তেজিত হচ্ছে না কেন? হেসে হেসে বলে—ফাঁসি কি আর সে দেবে? দেবে বিবেক! সকলের কাছে তো আর 'কথা' একটা অর্থহীন শব্দ নয়!...নতুন বিধবা হয়েছেন ভদ্রমহিলা, ছেলেমেয়ে তিনটে স্কুলে গেলে একা বাড়ীতে টিকতে পারেন না। অবিশ্যি পয়সা আছে বলেই পারা না পারার প্রশ্ন ওঠে। সে যাক্, দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনচার সময় ওঁর মন টেকাবার দায়িত্ব নেবো, কথা দিয়ে এসেছি। ওঁর ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরলেই আমার ছুটি।

প্রভাত রুদ্ধ আক্রোশে প্রায় গর্জন করে বলে—আর তোমার ছেলে দুটোর কি গতি হবে?

—আহা তারাও তো তক্ষুনি স্কুল থেকে ফিরবে। এসে তাড়াতাড়ি সামলে নেবো। টনিকের জোরে গায়ের জোর বাড়বে।

আর একটু শান্তহাসি হাসলো মুকুল।

এই হাসি বড়ো ভীতিকর!

এ হাসি যেন সমস্ত অন্তরঙ্গতার মুখের ওপর বন্ধ করে দেওয়া লোহার কপাট! কংক্রীটে গেঁথে তোলা নীরেট পাঁচিল! ওর মধ্যে প্রবেশের আশা করা বাতুলতা।

আশ্চর্য! এ হাসি কোথা থেকে আমদানী করলো মুকুল? হাসিতে ফেটে পড়াই তো ওর স্বভাব ছিলো। সব সময় যেন একটু 'ডগমগ' ভাব, আর চটে উঠলে বেদম চটা, এই তো প্রকৃতি ওর। তবু প্রভাত বলে ওঠে—ওঃ টনিক! কী এতো ন'শো পঞ্চাশ দেবে শুনি?

—কি মুশকিল! বিগ্নে নেই সাধ্যি নেই। ন'শো পঞ্চাশ দেবেই বা কেন? দৈনিক চারটাকার হিসেব! ঘণ্টাপিছু এক টাকা আর কি! ওইতেই কি আর সত্যি সবটা কুলিয়ে যাবে আমার? তোমারও লাগবে কিছু কিছু।... তা তোমার সংসারেও তো অনেক খাটি, সে সময়টা ঠিকই বজায় রইলো।

আবার হাসলে মুকুল।

প্রভাত আর একবার ওর হাতটা চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বললে—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা?

মুকুল আগের মতো আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—কি জানি, শেষ কথা না গোড়ার কথা!

কে জানে, এইটেই গোড়ার কথা হলে, 'শেষকথা'র চেহারা কেমন হয়ে আসবে! কে জানে, বরাবর 'বিধবা ভদ্রমহিলা' না জুটলে 'বিপত্নীক ভদ্রলোকে'ও আপত্তি ঘুচে যাবে কি না মুকুলের! বাঘিনী একবার রক্তের স্বাদ পেলে, আর তা'কে ঠেকানো যায় কি না সন্দেহ।

সেকালে—বুদ্ধিমান পুরুষ জাতি সে তথ্য জেনে ফেলেছিলো বলেই না এ যাবৎকাল 'ঘর ঘর বাঘিনী পুষে' আসতে পেরেছে। চিড়িয়াখানার বাঘিনীর মতো বুঝে সুঝে মাপা খাদ্য খাইয়ে রেখে এসেছে, রক্তের স্বাদ পেতে দেয়নি কিছুতেই।

আজ যদি সে চিড়িয়াখানার বহুকালের খাঁচাটার মরচেপড়া শিকগুলো ধাক্কায় ধাক্কায় ভেঙে ফেলে বাঘিনীর দল পথে বেরিয়ে আসে, তা'হলে আর তা'দের ঠেকানো যাবে কোন্ মন্ত্রের জোরে?

এ তো শুধু একজনের গল্প।

কেউ যদি ভেবে বসে থাকে, এই ঘটনা থেকে মুকুল আর প্রভাতের জীবনে চিরবিচ্ছেদ ঘটে রইলো, তা'হলে বড্ড ছেলেমানুষী ভাবা হবে।

যদি কেউ ভাবে, হয়তো এর পর থেকে যন্ত্রের মতো শুধু সংসারই করে যাবে ওরা, জন্মের শোধ হাসি গল্প কথা বন্ধ হয়ে যাবে, তা'হলেও বড্ড বেশীই ভাবা হয়ে যায়।

বন্ধ হবে না কিছুই।

বরং হয়তো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে খাওয়া-পরা ভালই হবে আগের চাইতে। শুকনো রুটির ওপর পড়বে মাখনের প্রলেপ, মিলের শাড়ীর জায়গা নেবে ধনেখালি, ফরাসডাঙা!

কিছুদিন বাদে—হয়তো দৈবাৎ মাসের শেষে নিজের হাতের টাকা ফুরোলে, প্রভাত অনায়াসেই মুকুলকে প্রশ্ন করতে পারবে—'তোমার এ মাসের মাইনেটা পেয়েছো না কি?'

অবসর সময়ে মনিব-গিন্নীর বিচিত্র চরিত্রের ব্যাখ্যানা করতে বসে অনায়াসেই বরের সঙ্গে হাসাহাসি করবে মুকুল।

সবই বজায় থাকবে!

শুধু হয়তো—শৌখিন বাতিকগ্রস্ত মুকুলের পরিপাটি ঘরদোরের ওপর জমবে পুরু ধুলোর স্তর, হয়তো একটু বেশী তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে প্রভাত।

হয়তো—ওদের অখণ্ড দাম্পত্যজীবনের ঠিক মাঝখানটিতে রয়ে যাবে একটুকরো গভীর শূন্যতা!

ফুটো পয়সার মতো সে জীবনটা দিয়ে কাজ চলে যাবে ঠিকই, থাকবে না শুধু তার সম্বন্ধে মূল্যবোধ। আর কিছু নয়।